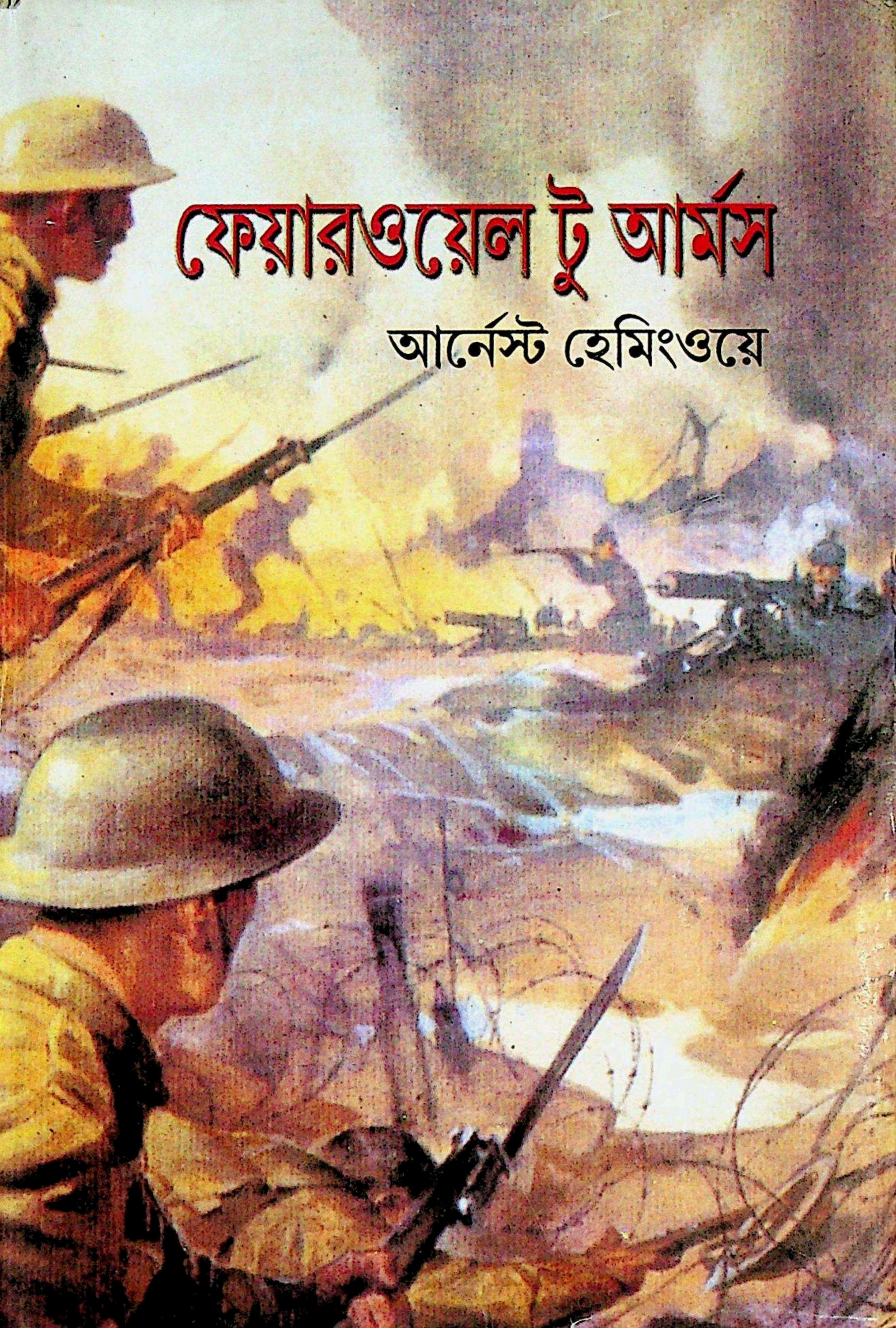
ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে



ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

ভাষান্তর

অজয় চট্টোপাধ্যায়

দীপায়ন ❑ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

A FAREWELL TO ARMS

by

Ernest Hemingway

Translated by Ajoy Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ ❑ চৈত্র ১৪১৬, এপ্রিল ২০১০

ISBN : 978-93-84674-11-3

প্রকাশক ❑ দীপায়ন ❑ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯
মুদ্রাকর ❑ তনুশ্রী প্রিন্টার্স ❑ ২১বি, রাধানাথ বোস লেন ❑ কলকাতা- ৭০০০০৬
প্রচ্ছদপট ❑ সমরেশ সাহা

একশত নব্বই টাকা

এন্টালির অলিতে-গলিতে
পার্কে-ইস্কুলে
ফেলে-রেখে-আসা সমস্ত বন্ধুদের কথা মনে রেখে—
যারা আজও আমার কাছে
সুন্দরতম স্বপ্নের চেয়েও সুন্দর

প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

কৃষণ চন্দর
দাঙ্গা ও সম্প্রীতির গল্প ॥ আমার প্রিয় গল্প
দাদরপুলের বাচ্চারা ॥ যব খেত জাগে
গাধার জবানবন্দী

মুল্‌করাজ আনন্দ
নির্বাচিত রচনা-সংগ্রহ

লুইজি বার্তোলিনি
বাইসাইকেল থিভ্‌স

আরভিং স্টোন
লাস্ট ফর লাইফ (শিল্পী ভ্যান গখের জীবনী-উপন্যাস)
অ্যাগনি অ্যান্ড একস্ট্যাসি
(শিল্পী মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর জীবনী-উপন্যাস)

পিয়ের লা মুর
মুল্যাঁ রুজ (শিল্পী তুলুস-লোত্রেকের জীবনী-উপন্যাস)

সমারসেট মম্‌
দ্য মুন অ্যান্ড সিক্‌স পেন্স
(শিল্পী পল গগ্যাঁর জীবনী-উপন্যাস)

এডগার অ্যালান পো
রহস্য গল্প ও উপন্যাস

আনা ফ্রাঙ্ক
আনা ফ্রাঙ্ক রচনা সমগ্র (ডায়েরি ও গল্প-উপন্যাস-স্মৃতিকথা)

এরস্কিন কল্ডওয়েল
কালো মানুষ সাদা মানুষ
(আমেরিকার জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী)

রমাঁ রলাঁ
মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো (জীবনী ও কাজ)

মিখাইল শলোকভ
অদৃষ্ট ও অন্যান্য গল্প
(রাশিয়ার প্রতিরোধ আন্দোলনের উপন্যাস ও গল্প)

সুলতান আহমেদ ও ভৈরব হালদার সম্পাদিত
প্রতিরোধের গল্প ভিয়েতনাম

গোলাম কুদ্দুস
এক হিন্দুস্থানী ॥ যুগ সন্ধিক্ষণ (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পুরস্কার প্রাপ্ত)
লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে (বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত)
হে বিদ্যুৎলতা ॥ সম্বোধন ॥ উজানিয়া ॥ একসঙ্গে
সুরের আগুন ॥ ইরাকে ঈগল ॥ ইলা মিত্র

রমেশচন্দ্র সেন
নির্বাচিত রচনা সংকলন (১ম ও ২য় খণ্ড)

কমলেশ সেন সম্পাদিত
গ্রাম বাংলার গল্প
ইরানের প্রতিবাদী গল্প

সুলতান আহমেদ ও
ধরিত্রী রায় সম্পাদিত
প্যালেস্তাইনের গল্প কবিতা প্রবন্ধ

সাদাত হোসেন মান্টো
জীবন পিয়াসা (ঘৃণা ও সম্প্রীতির গল্প)

ব্রুনো আপিৎস
নেকেড অ্যামঙ দ্য উলভ্‌স
(বুখেনভাল্ড কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কাহিনী)

জ্যাক লন্ডন
শেষযুদ্ধের ঘোড়া
(বক্‌সিং-কেন্দ্রিক যাবতীয় উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংকলন)
কল অফ দ্য ওয়াইল্ড
(কল অফ দ্য ওয়াইল্ড ও অন্যান্য গল্পের সংকলন)
সন অফ দ্য উল্‌ফ
হোয়াইট ফ্যাং

ভেরকরস
সাইলেন্স অফ দ্য সী
(নাৎসি-অধিকৃত ফ্রান্সের নীরব প্রতিরোধের কাহিনী)

ম্যাকসিম গর্কি
মা

হাওয়ার্ড ফাস্ট
(আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী) স্বপ্ন যুদ্ধ স্বাধীনতা

এরিখ মারিয়া রেমার্ক
রোড ব্যাক
আলোয় অন্ধকারে

রাহুল সাংকৃত্যায়ন
মানুষের কাহিনী

প্রেমচন্দ
বনজঙ্গলের গল্প

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
নির্বাচিত উপন্যাস

লেখক পরিচিতি

আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২১ জুলাই, আমেরিকার চিকাগো শহরের উপকণ্ঠে ইলিনয়েসের অন্তর্গত ওক পার্ক অঞ্চলে। তাঁর বাবা ক্ল্যারেন্স হেমিংওয়ে ছিলেন একজন গ্রাম্য চিকিৎসক।

ওক পার্ক এবং রিভার ফরেস্ট হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন হেমিংওয়ে। পড়াশোনার পাশাপাশি বক্সিং, ওয়াটারপোলো, ফুটবল প্রভৃতি খেলাধুলোর প্রতিও গভীর আকর্ষণ ছিল তাঁর।

হাই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর 'দ্য কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন তিনি। ১৯১৭ সালের মধ্যে অক্টোবর থেকে ১৯১৮-র এপ্রিল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকায় কাজ করেন।

সে এক ঝোড়ো প্রহর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ১৯১৪ সালে যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা তখনও চলমান।

সাংবাদিকের কাজ ছেড়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন হেমিংওয়ে। রেড ক্রসের অ্যাম্বুল্যান্স-ড্রাইভার হিসেবে ১৯১৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে পৌঁছলেন তিনি। জুন মাসে তাঁকে পাঠানো হল ইতালিয়ান ফ্রন্টে।

এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা একটু জেনে রাখা দরকার। ইউরোপে তখন দু'টি শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। একদিকে জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছিল, জমে উঠছিল যুদ্ধের বারুদপুঞ্জ। সেই বারুদে আগুন লাগে ১৯১৪ সালের জুন মাসে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী ফ্রান্‌জ্ ফার্ডিনান্ড এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন সার্বিয়ার সেরাজেভো শহরে। সার্বিয়ার কাছে এক অকল্পনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করে অস্ট্রিয়া। সেই দাবি মেটানোর সাধ্য সার্বিয়ার ছিল না। এই সূত্র ধরেই ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি। জার্মানি যোগ দেয় অস্ট্রিয়ার পক্ষে, সার্বিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

চার বছর চার মাসের এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বড় রাষ্ট্রই। তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে দাঁড়িয়েছিল।

বিরুদ্ধ পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল রাশিয়া। এদিকে রাশিয়ায় তখন লেনিনের নেতৃত্বে চলছে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লব সফল হল, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া পা রাখল সমাজতন্ত্রের পথে। যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াল রাশিয়া।

ওই ১৯১৭ সালেই আমেরিকান যাত্রীবাহী জাহাজ 'লুসিট্যানিয়া' ডুবে গেল জার্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণে। এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিল আমেরিকা।

১৯১৮ সালেই নিশ্চিত হয়ে উঠল—যুদ্ধে জয় হতে চলেছে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-আমেরিকারই। তুরস্ক ও বুলগেরিয়া পরাজিত হল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যে আর জার্মানির অভ্যন্তরে দেখা দিল বিদ্রোহ। অবশেষে ১৯১৮ সালের নভেম্বরে আত্মসমর্পণ করল জার্মানি। শেষ হল দুনিয়া-কাঁপানো বিশ্বযুদ্ধ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১৮ সালে, অর্থাৎ যুদ্ধের শেষদিকে। জুন মাসে রেড ক্রসের অ্যাম্বুল্যান্স-ড্রাইভার হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয় ইতালিয়ান ফ্রন্টে। ৮ জুলাই মর্টারের গোলায় গুরুতর আহত হন তিনি। গোলার আঘাতে দু'টো পা-ই জখম হয়েছিল। পাঁচদিন যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে থাকার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মিলানের রেড ক্রস হাসপাতালে।

এই হাসপাতালে ছ'মাস থাকার সময় রেডক্রসের নার্স অ্যাগনেস ফন কুরোউস্কি-র সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। পরিচয় থেকে প্রণয়। বয়সে সাত বছরের বড় অ্যাগনেসকে বিয়ে করতেও চেয়েছিলেন হেমিংওয়ে। কিন্তু ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে একজন ইতালীয় অফিসারের বাগ্‌দত্তা হন অ্যাগনেস। ভেঙে যায় সম্পর্ক। অ্যাগনেসের এই প্রত্যাখ্যান গভীর ছাপ ফেলেছিল হেমিংওয়ের জীবনে।

'আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' উপন্যাসে যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন হেমিংওয়ে। এ কাহিনিতে অ্যাগনেস-ও আছেন, তবে অন্য নামে—ক্যাথারিন বার্কলে। তবে বাস্তবের অ্যাগনেসের মতো কাহিনির ক্যাথারিন চলে যাননি কাহিনির নায়ককে ছেড়ে। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিণতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এই উপন্যাস।

যুদ্ধক্ষেত্রে মর্টারের গোলায় গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও একজন ইতালীয় সৈন্যকে নিরাপদে আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হেমিংওয়ে। প্রতিদানে ইতালির পক্ষ থেকে সাহসিকতার জন্য রূপোর মেডেল দেওয়া হয়েছিল তাকে।

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে বাড়িতে ফেরেন হেমিংওয়ে। কিছুদিন পর টরন্টোতে গিয়ে একটি পত্রিকায় লেখালেখি করতে শুরু করেন। ১৯২০ সালে চলে আসেন চিকাগোতে। পত্রপত্রিকায় লেখার কাজ তখনও চলছে।

চিকগোতেই হ্যাডলি রিচার্ডসনের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। ১৯২১ সালে তিনি বিয়ে করেন বয়সে আট বছরের বড় হ্যাডলিকে। ওই বছরই নভেম্বর মাসে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি চলে যান প্যারিসে।

প্যারিসে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। এঁদের মধ্যে এজরা পাউন্ড আর জেমস জয়েসের সঙ্গে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব। এজরা পাউন্ডের সঙ্গে ইতালিতেও ঘুরে আসেন।

এই সময় গ্রিস আর তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। 'টরন্টো স্টার' পত্রিকায় এই যুদ্ধের প্রতিবেদন লেখেন হেমিংওয়ে।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য সান অলসো রাইজেস'। আর ঠিক এই সময়েই প্রথমা স্ত্রী হ্যাডলির সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁর। সাংবাদিক পলিন ফাইফার-কে বিয়ে করেন হেমিংওয়ে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আত্মহত্যা করেন তাঁর পিতা ক্ল্যারেন্স হেমিংওয়ে। নিজের পিতার (অর্থাৎ আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পিতামহের) একটি পুরনো পিস্তল দিয়ে নিজেকে গুলি করেন তিনি। বলা হয়—ভগ্নস্বাস্থ্য, মানসিক অবসাদ এবং আর্থিক সঙ্কটই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল আত্মহত্যার পথে।

এখানে বলে রাখা যায়—হেমিংওয়ে-পরিবারে আত্মহত্যার একটা প্রবণতা ছিলই। পিতা ক্ল্যারেন্স ছাড়াও আত্মহত্যা করেছিলেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বোন উরসুলা, ভাই লিসেস্টার এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ের নাতনি মার্গো হেমিংওয়ে। আরও-একটি আত্মহত্যার ঘটনারও সাক্ষী হতে হয়েছিল এই পরিবারটিকে, তবে সে-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হল হেমিংওয়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'।

১৯৩৩ সালে পলিন আর হেমিংওয়ে আফ্রিকায় বেড়াতে যান। কেনিয়া আর টাঙ্গানাইকার নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ান তাঁরা। আফ্রিকা ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হেমিংওয়ে লিখেছিলেন 'গ্রিন হিলস অফ আফ্রিকা' আর 'দ্য স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো'।

১৯৩৭ সালে 'নর্থ আমেরিকান নিউজপেপার অ্যালায়েন্স'-এর পক্ষ থেকে হেমিংওয়েকে স্পেনে পাঠানো হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিবেদন লেখার জন্য। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন সুবিখ্যাত ডাচ চলচ্চিত্র-নির্মাতা ইয়োরিস ইভেন্স। অনেক অসামান্য তথ্যচিত্রের নির্মাতা এই ইয়োরিস ইভেন্স। স্পেনে গিয়ে তিনি নির্মাণ করেছিলেন 'দ্য স্প্যানিশ আর্থ' তথ্যচিত্রটি।

হেমিংওয়ে রিপোর্ট লিখতেন স্পেনের গৃহযুদ্ধের ওপর। ১৯৩৭ সালে মাদ্রিদে যখন বোমাবর্ষণ করা হয় তখন তিনি লিখেছিলেন তাঁর একমাত্র নাটকটি—'দ্য ফিফ্‌থ কলাম'। স্পেনের রিপাবলিকানদের সঙ্গে এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাঁর। অনেকে বলেন, হেমিংওয়ে নাকি স্পেনীয় তরুণদের রাইফেল চালানোও শেখাতেন। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স্‌' উপন্যাসে তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন খুঁজে পাই আমরা।

১৯৪০ সালেই দ্বিতীয়া স্ত্রী পলিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায় হেমিংওয়ের এবং সাংবাদিক মার্থা গেলহর্ন-কে বিয়ে করেন তিনি।

বিয়ের আগেই, ১৯৩৯ সালে, মার্থার সঙ্গে কিউবায় গিয়েছিলেন হেমিংওয়ে। কিউবাতেই তিনি তাঁর শীতকলীন বাসগৃহ নির্মাণ করেন।

১৯৪১ সালে একটি পত্রিকার জন্য লেখার কাজে চীনে যেতে হয় মার্থাকে। হেমিংওয়ে-ও তাঁর সঙ্গে চীনে গিয়েছিলেন।

চীন থেকে কিউবাতেই ফিরে আসেন তিনি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে তিনি চলে যান ইউরোপে। ফ্যাসিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য যোগ দেন কর্নেল চার্লস লানাহাম-এর নেতৃত্বাধীন রেজিমেন্টে। রেজিমেন্টটি তখন প্যারিসের দিকে যাচ্ছিল। প্যারিসের বাইরে একটি গ্রামে ছোট একটি গ্রাম্য মিলিশিয়া বা প্রতিরোধ-বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। ১৯৪৪ সালের ২৫ আগস্ট মুক্ত হয়

প্যারিস। সেই সময় সেখানেই উপস্থিত ছিলেন তিনি। ১৯৪৪ সালের শেষদিকে হুর্টগেনভাল্ড-এর তীব্র লড়াইয়ের সময়েও সেখানে হাজির ছিলেন হেমিংওয়ে। এর পাশাপাশি নিজের সাংবাদিক কর্তব্যও পালন করে চলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ব্রোঞ্জ তারকা দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছিল তাঁকে।

এর পর আবারও বিবাহবিচ্ছেদ। মার্থার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৪৬ সালে মেরি ওয়েল্শ্-কে বিয়ে করেন হেমিংওয়ে। এই সময় নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাঁর : মাথার যন্ত্রণা, উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক অবসাদ এবং ডায়াবেটিস।

১৯৪৮ সালে মেরির সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান হেমিংওয়ে। চলার পথে ইতালিতেও যান তাঁরা এবং সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন যেখানে তিরিশ বছর আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, আহত হয়েছিলেন তিনি।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় হেমিংওয়ের 'অ্যাক্রস দ্য রিভার অ্যান্ড ইনটু দ্য উড্স'। ১৯৫১ সালে তাঁর কলম থেকে জন্ম নেয় 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' উপন্যাসটি। ১৯৫৪ সালে এই উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁকে। পুরস্কারের কথা যখন ঘোষণা করা হয়, হেমিংওয়ে তখন কিউবায়। পুরস্কার নেওয়ার জন্য সুইডেনে যাননি তিনি, তার বদলে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালের শেষদিক থেকে ১৯৫৭ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই সময়েই কিউবা থেকে জন্মভূমি আমেরিকায় চলে আসার কথা মনে হতে থাকে তাঁর। ১৯৫৯ সালে আমেরিকার ইডাহো-য় একটা বাড়ি কেনেন তিনি। ১৯৬০ সালে কিউবা ছেড়ে চলে আসেন স্বদেশে। বলে রাখা যাক, ১৯৫৯ সালেই ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। একনায়কতন্ত্রী বাতিস্তার পরাজয়ে ও কাস্ত্রোদের জয়লাভে খুশি হয়েছিলেন হেমিংওয়ে, নতুন সরকারের সঙ্গে যথেষ্ট সুসম্পর্কও ছিল তাঁর।

এদিকে তাঁর মানসিক অবসাদ বেড়েই চলেছিল। সেইসঙ্গে ছিল উচ্চ রক্তচাপ, লিভারের সমস্যা, দুর্বল শরীর, আর দৃষ্টিশক্তিও ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল।

মেয়ো ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় তাঁকে। তিন মাস চিকিৎসার পর ছাড়া পান তিনি এবং তার কিছুদিন পরই, ১৯৬১-র বসন্তকালে, আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শক ট্রিটমেন্ট দিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে হেমিংওয়ে বাড়িতে ফেরেন ১৯৬১ সালের ৩০ জুন। তার দু'দিন পরে, ২ জুলাই ১৯৬১, শটগান থেকে নিজের ওপর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে।

আন্দুল-মৌড়ি
হাওড়া

অজয় চট্টোপাধ্যায়

ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

প্রথম অধ্যায়

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

সে বছর গ্রীষ্মের শেষে এক গ্রামে আস্তানা করলাম। বাড়ির একেবারে সামনেই নদী, তারপর মাঠ, সে মাঠ গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের গায়ে। নদীতে সূর্যের আলোয় প্রচুর নুড়ি আর পাথরের ঝলক। নদীর গভীর জলে আকাশের নীল ছায়া।

বাড়ির সামনে দিয়ে ধুলোর ঝড় তুলে ফৌজের চলাচল। সে ধুলোয় গাছের গুঁড়ি থেকে সবুজ পাতা পর্যন্ত একেবারে সাদা হয়ে যায়। সে বছর গাছের পাতাগুলো অসময়েই ঝরে গেছে। ঝরা পাতার বুক চিরে ধুলো ছুটিয়ে সেনাদল ছুটে যায়, পেছনে পড়ে থাকে জনহীন পথ আর ঝরা পাতার দল।

মাঠে ফসল, এখানে-সেখানে ফলের বাগান, তার পেছনে মাঠ পেরিয়ে ধূসর পাহাড়ের ঢেউ। পাহাড়ে তখন যুদ্ধ চলছিল, রাতে কামানের গোলার আগুন চোখে পড়ে। অন্ধকারে সেই আগুন দেখে মনে হয় যেন কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ ঝল্সাচ্ছে, অথচ ঝড়ের লক্ষণ নেই।

রাতের অন্ধকারে আমাদের জানলার নীচে মাঝেমধ্যে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের শব্দ আর মোটর ট্রাক্টার দিয়ে কামান টেনে নিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। রাতের অন্ধকারেই ওদের চলাচল বেশি। খচ্চরের পিঠে চাপানো গোলা-বারুদের বাক্স, লরি ভর্তি মালপত্র আর খাকি রঙের ট্রাকে মানুষ। কখনও কখনও দিনের বেলাও বড় বড় কামান টেনে নিয়ে যায়, তবে তখন কামানের নলগুলো ঢাকা থাকে সবুজ ডালপালা আর লতাপাতায়।

উত্তরে উপত্যকার ওপারে আখরোট বন পেরিয়ে নদীর ধারে আর-একটা পাহাড়সারি দেখা যায়। সে-পাহাড়টার জন্যও যুদ্ধ হয়েছিল, তবে সে যুদ্ধে আমাদের জয় হয়নি।

সে-বারের বর্ষায় আখরোট গাছের ডালগুলো ফাঁকা করে পাতাগুলো সব ঝরে গেল। গাছের গোড়া কালো হয়ে গেল, পাতাহীন হয়ে গেল আঙুরবন। হেমন্তে সারা দেশ জুড়ে একটা সিক্ত মৃত্যুর থমথমে ভাব নেমে এল যেন।

নদীর ওপর দিয়ে ঘন কুয়াশা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ে জমে-থাকা মেঘের সঙ্গে, তারই মধ্যে দিয়ে কাদা ছিটিয়ে ছুটে চলেছে যুদ্ধের ট্রাকগুলো, মার্চ করে চলেছে সৈন্যদল। সৈন্যদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় ভরা, রাইফেলগুলো জলে-ভেজা, বর্ষাতির নীচে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। দেখলে মনে হয় যেন ছ'মাসের গর্ভবতী মহিলা সব।

মাঝেমধ্যে খাকি রঙের ছোট মোটর যাচ্ছে দ্রুতবেগে, সেগুলো বড় অফিসারদের

গাড়ি। ড্রাইভারের পাশে একজন অফিসার, পেছনে আরও কয়েকজন অফিসার। তাদের গাড়ির চাকায় বেশি কাদা ছিটোয়, আর সবচেয়ে বেশি কাদা ছিটিয়ে, বিশালদেহী দু'জন অফিসারের মাঝখানে ছোটখাটো লোকটিকে নিয়ে সবচেয়ে জোরে যে-গাড়িটা যায়, সেটা রাজার গাড়ি। ছোটখাটো রাজা ইউডিনেই থাকতেন এবং প্রায় রোজই যুদ্ধের অবস্থা দেখতে বেরোতেন। অবস্থা অবশ্য সুবিধের নয়, বরং দিন দিন আরও খারাপই হয়ে চলেছে।

শীতের শেষে শুরু হল অঝোরে বৃষ্টি আর তারই সঙ্গে কলেরা। শেষ পর্যন্ত কলেরা ঠেকানো গেল সাত হাজার সৈন্যের প্রাণের মূল্যে।

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

পরের বছর বেশ কয়েকটা যুদ্ধে জেতা গেল। উপত্যকার ওপারের পাহাড় আর আখরোট বনের পেছনের পাহাড়ি এলাকা দখল করা গেল। দক্ষিণের দিকেও অনেক যুদ্ধে জয় হল। আগস্ট মাসে নদী পার হয়ে গোরিজিয়ার একটা বাড়িতে ছাউনি ফেললাম আমরা। বাড়িটার চারিদিকে দেয়ালঘেরা বাগান, মাঝখানে একটা ফোয়ারা আর বেশ কিছু ঝাঁকড়া গাছ, একপাশে আঙুরবন।

এবারের যুদ্ধটা হয়েছিল এক মাইল দূরের একটা পাহাড়ে। শহরটা খুব সুন্দর, আমাদের বাড়িটা ছিল আরও সুন্দর। শহরের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী। ওদিকের পাহাড়টা দখল করতে না পারলেও এই শহরটা আমাদের দখলে এসেছিল। ভাবতে ভাল লাগছিল যে অস্ট্রিয়ানরা ভবিষ্যতে আবার এখানে ফিরে আসার আশা করেছিল, কারণ ওরা বোমা ছুঁড়েছিল যেন স্রেফ নিয়মরক্ষার জন্য, কিছু ধ্বংস করার জন্য নয়। এখানে অসামরিক আর সামরিক লোকেরা পাশাপাশিই থাকছে। একদিকে, হাসপাতাল, কফিখানা, ফৌজি ছাউনি, গলির মধ্যে কামান আর দুটো গণিকালয় (একটা সৈন্যদের, অন্যটা অফিসারদের), অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের বাড়ি, বোমার আঘাতে কোনও বাড়ির দেওয়াল ভেঙেছে, কোনও বাড়ির সামনের দিকের ভগ্নস্তূপ জমে আছে বাগানে আর রাস্তায়। একদিকে শহরের ওপারে যুদ্ধরত পাহাড়সারি, বোমার ঘায়ে ভাঙাচোরা রেলওয়ে সেতু আর চূর্ণবিচূর্ণ টানেল, অন্যদিকে গ্রীষ্মান্তের শীতল রাত, চৌমাথার চারপাশে আর তার সামনের দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে সারি সারি নিবিড় বৃক্ষরাজি। কখনও-সখনও এখান দিয়ে রাজা যান, তাঁর সরু গলা আর ছাগলদাড়িওলা মুখ চোখে পড়ে। শহরে অনেক মেয়েরও আমদানি হয়েছে। এককথায় সবই বেশ চলছে। গত বছর যখন এখানে ছিলাম তখনকার সঙ্গে এখনকার অবস্থার অনেক ফারাক। যুদ্ধের গতিও পাল্টে গেছে।

এখানে যখন আমরা প্রথম আসি, তখন শহরের ওধারে পাহাড়ের ঘন ওক বনে

গ্রীষ্মের গহন সবুজ ছেয়ে ছিল, এখন যুদ্ধের নির্মম ছোঁয়ায় সেই অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, চারপাশে পড়ে আছে শুধু গাছের গুঁড়ি আর অসংখ্য ডালপালা। তারপর বর্ষার শেষে একদিন সেই ছিন্নমূল অরণ্যের বুক চিরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এল মেঘের দল—সূর্যের আভাকে ম্লান করে দিয়ে, আকাশ-বাতাস ধূসর রঙে ভরিয়ে। তারপরই শুরু হল তুষারপাত। চারপাশে সাদা তুষার, মাঠ-ঘাট-পথ ঢেকে গেল তুষারে, শুধু জেগে রইল ওক গাছের নিষ্পত্র গুঁড়িগুলো, আর সর্বাঙ্গে তুষার লাগা কামানের সারি।

অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট গণিকালয়ের জানলায় বসে সেদিন বাইরের তুষারপাত দেখছিলাম, সঙ্গে ছিল এক বন্ধু, সামনে দুটো পানপাত্র আর এক বোতল অস্তি। বাইরে তুষার পড়েই চলেছে। তার মানে আমাদের এবছরের কাজকর্ম এখানেই শেষ। নদীর ওপারের পাহাড়গুলো এখনও দখল করা যায়নি, এপাশের পাহাড় একটাও হাতে আসেনি—সবই পরের বছরের জন্য রয়ে গেছে।

এই সময়ে আমাদের পাদ্রি সাথীটি আমাদের মেসবাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার কাদা ভেঙে সাবধানে এগোচ্ছিল। আমার বন্ধুটি তাকে জানলা থেকে ডাকতে লাগল। পাদ্রি একবার আমাদের দিকে দেখে মুচকি হেসে চলে গেল, বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া দিল না।

সেদিন রাতে মেসবাড়িতে ডিনারে আমরা স্প্যাগেত্তি খাওয়া সেরে যখন লাল সুরার পাত্র তুলে নিলাম, ক্যাপ্টেন তখন পাদ্রিকে নিয়ে পড়লেন।

অল্পবয়সী পাদ্রিটি একটুতেই লজ্জা পেত, আর তার খাকি উর্দির বাঁ দিকের বুক-পকেটের ওপর গাঢ় লাল ভেলভেটের একটা ক্রুশ থাকত। ক্যাপ্টেন তাকে খোঁচাতে শুরু করলেন। আমাকে বোঝানোর জন্য ভাঙা-ভাঙা ইতালীয় ভাষায় বলতে লাগলেন,

"আমাদের পাদ্রিমশাই মেয়েমানুষ নিয়ে ঘুরছিল।" আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন। পাদ্রি লজ্জায় রাঙিয়ে উঠল। মুচকি হেসে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল কথাটা। ক্যাপ্টেন এইভাবে হামেশাই পাদ্রির পেছনে লাগেন। কথার খেই ধরে তিনি বললেন,

"আমি আজ মেয়েমানুষের সঙ্গে পাদ্রিকে দেখেছি।"

"মোটেই না।" পাদ্রি বলল।

অন্য অফিসাররা পাদ্রির অসহায় অবস্থাটা বেশ উপভোগই করছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "পাদ্রি মেয়েমানুষদের পাত্তাই দেয় না। একেবারেই না।"

আমার খালি গ্লাসটা ভরে দিয়ে আমার আর পাদ্রির দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন আবার বললেন,

"রোজ রাতে একা পাঁচ-পাঁচজনের মোকাবিলা করে আমাদের পাদ্রিমশাই, বুঝলে।"

হেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন, অন্যরাও হেসে উঠল। পাদ্রিও এটাকে পরিহাস বলেই মেনে নিল।

মেজর বললেন, "পোপ কিন্তু যুদ্ধে অস্ট্রিয়ানদেরই জয় চাইছে। ফ্রান্‌ৎজ জোসেফের ওপর পোপের খুব টান—টাকাটা ওখান থেকেই আসছে কিনা। আমি বাপু নাস্তিক, সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না।"

একজন লেফটেন্যান্ট আমাকে বলল, "তুমি 'ব্ল্যাক পিগ' পড়েছ? আমি এক কপি জোগাড় করে দেব তোমাকে। ওই বইটা পড়েই আমার সব বিশ্বাস একেবারে টলে গেছে।"

"ওটা একটা অশ্লীল বই," চেঁচিয়ে উঠল পাদ্রি, "ওরকম বই কারুর ভাল লাগতে পারে না।"

"খুব কাজের বই।" লেফটেন্যান্ট বলল, "বইটাতে পাদ্রিদের কেচ্ছাকাহিনি আছে, তোমার দিব্যি লাগবে।"

আমি পাদ্রির দিকে তাকিয়ে হাসলাম, মোমবাতির ওদিক থেকে পাদ্রিও একটু হেসে বলল,

"তুমি পোড়ো না।"

লেফটেন্যান্ট আমাকে বলল, "আমি এক কপি এনে দেব তোমায়।"

মেজর বললেন, "চিন্তাশীল লোকমাত্রেই নাস্তিক। অবশ্য 'ফ্রি ম্যাসন'দেরও আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।"

লেফটেন্যান্ট বলল, "আমি কিন্তু 'ফ্রি ম্যাসন'দের বিশ্বাস করি, ওদের সংস্থাটা খুব উন্নত মানের।"

এই সময়ে কেউ একজন ভেতরে আসায় দরজাটা খুলতেই বাইরে তুষারপাত দেখা গেল। আমি বললাম, "এই বরফ পড়া শুরু হল, আর আমরা আক্রমণ করতে পারব না।"

"তা তো পারবই না।" মেজর বললেন, "এই মওকায় তুমি বরং একটু ঘুরেফিরে এসো—রোম, নেপ্‌ল্‌স্‌, সিসিলি—"

"আরে তুমি অ্যামাল্‌ফিতে যাও না," লেফটেন্যান্ট বলল, "ওখানে আমার পরিবারের লোকেরা থাকে। আমি তোমার হাতে একটা চিঠি লেখে দেব, ওরা তোমায় বাড়ির ছেলের মতন যত্ন করবে।"

একজন বলল, "তার চেয়ে বরং পালেরমো যাক না।"

অন্য একজন বলল, "কাপ্রি যাও।"

পাদ্রি বলল, "আমার ইচ্ছে তুমি আব্রুৎসিতে যাও, আর কাপ্রাকাত্তোতে আমার বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা করো এসো।

"ব্যাস, এবার আব্রুৎসির গল্প শুরু হল।" একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আরে ওখানে

তো তুষার এখানকার চেয়েও বেশি পড়ছে। তা ছাড়া ওকে ওইসব চাষাভুষো দেখানোর দরকার নেই, বরং কোনও ভদ্র জায়গায় পাঠাও, যেখানে সংস্কৃতি আছে, সভ্যতা আছে।”

“ওর একেবারে খাসা মেয়ে চাই। ঠিক আছে, আমি তোমাকে নেপ্‌ল্‌সের অনেক জায়গার ঠিকানা দিয়ে দেব, সেখানে সব সুন্দরী মেয়ে, তাদের সঙ্গে তাদের মায়েরাও থাকে।” হাসিতে ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন। তারপর আবার একটু পিছনে লাগলেন পাদ্রির। বললেন,

“পাদ্রিমশাই রোজ রাতে পাঁচজনের মোকাবিলা করে।”

আবার হাসির হর্‌রা উঠল।

মেজর বললেন, “এক্ষুনি ছুটি নিয়ে নাও।”

লেফটেন্যান্ট বলল, “আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব দেখাই।”

তারপর শুরু হল একের পর এক ফরমাশ—

‘আসার সময় একটা গ্রামোফোন নিয়ে এসো।”

“ভাল ভাল রেকর্ড এনো।”

“ক্যারুসো এনো, বুঝলে!”

“না, না, ক্যারুসো এনো না—বড্ড চ্যাঁচায়।”

“ওর মতন চ্যাঁচাতে পারবে তুমি?”

“ও চ্যাঁচায়। গাঁকগাঁক করে চ্যাঁচায়।”

ওরা হট্টগোল করছে, তার মধ্যে পাদ্রি আস্তে আস্তে আমায় বলল,

“আমি সত্যিই চাই তুমি আব্রুৎসি যাও। দারুণ শিকার পাওয়া যায় ওখানে। ঠান্ডা হলেও জায়গাটা খুব শুকনো আর পরিচ্ছন্ন। তাছাড়া আমার দেশের মানুষদেরও ভাল লাগবে তোমার। আমাদের বাড়িতেই থাকতে পারবে, কোনও সমস্যা হবে না। আমার বাবা খুব বিখ্যাত শিকারি।”

“ওঠো ওঠো”, ক্যাপ্টেন হঠাৎই বলে উঠলেন, “ওদিকে মেয়েমানুষদের বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে এল।”

উঠে পড়লাম সবাই। পাদ্রিকে বললাম, “শুভরাত্রি।”

পাদ্রি উত্তর দিল, “শুভরাত্রি।”

ছুটির পরে যুদ্ধ-সীমান্তে ফিরে এসে সেই শহরেই ছাউনি ফেললাম আমরা। শহরের চারপাশে বসানো হয়েছে বেশ কয়েকটা কামান, তার সঙ্গেই এসেছে বসন্ত। বিশাল

প্রান্তর সবুজে ভরে গেছে, আঙুরলতায় নতুন শাখার জাগরণ, দু'পাশের সার-সার গাছে অসংখ্য নতুন পাতা, আর নীল সাগর থেকে বয়ে-আসা মোহময় বাতাস।

দূর থেকে পুরো শহরটা দেখা গেল, পেছনে ছোট পাহাড়ের খাঁজে পুরনো দুর্গ, তারও পেছনে আবার পাহাড়সারি, তাদের বুকে ঘন সবুজের আস্তরণ।

শহরের মধ্যে বসেছে আরও কয়েকটা কামান, বানানো হয়েছে নতুন কয়েকটা হাসপাতাল। রাস্তায় ঘুরছে ইংরেজ পুরুষরা, কয়েকজন ইংরেজ নারীও। গোলার ঘায়ে ভেঙে পড়েছে আরও কয়েকটা বাড়ি।

ছায়াঢাকা পথ দিয়ে বসন্তের উষ্ণ ছোঁয়া মাখতে মাখতে হাঁটছি। সেই আগের বাড়িতেই আস্তানা আমাদের, যেমনটা দেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনই আছে। দরজা খোলা, বাইরের বেঞ্চে বসে রোদ পোহাচ্ছে একজন সৈনিক। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। ভেতরে ঢুকতেই কেমন যেন হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ নাকে এল। সবই আগের মতো আছে, তফাত বলতে এখন বসন্তকাল। দরজা দিয়ে বড় ঘরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল মেজর ডেস্কে বসে আছেন। খোলা জানলা দিয়ে রোদ ঢুকে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। মেজর আমাকে দেখতে পাননি। আমি ভাবলাম—আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করব, নাকি ওপরে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসব। ভেবেচিন্তে ওপরেই চলে গেলাম।

যে-ঘরটায় আমি আর লেফটেন্যান্ট রিনাল্‌দি থাকতাম তার নীচেই উঠোন। ঘরের জানলাটা খোলাই রয়েছে, আমার বিছানাটা কম্বলে বাঁধা, জিনিসপত্র সব দেওয়ালে ঝোলানো, গ্যাস-মুখোশটা একটা লম্বা টিনের কৌটোয় ভরা, লোহার টুপিটাও একই পেরেক থেকে ঝুলছে। খাটের পায়ের দিকে রয়েছে আমার বড় ট্রাঙ্কটা, তার ওপর তেল-পালিশ করা চকচকে বুটজোড়া, দুটো বিছানার মাঝে দেয়ালের গায়ে ঝুলছে আমার অস্ট্রিয়ান স্নাইপার রাইফেল, তার আটকোণা নলের নীল রং যেন ঝকঝক করছে, কালো আখরোট কাঠের বাঁটটাও ঝকঝকে। সঙ্গের টেলিস্কোপটা বোধহয় ট্রাঙ্কে রেখে গিয়েছিলাম।

লেফটেন্যান্ট রিনাল্‌দি বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে জেগে উঠল। বলল,

"কী হে, কেমন কাটালে?"

"দারুণ।" উত্তর দিলাম আমি।

ওর সঙ্গে করমর্দন করলাম, হাত ছেড়ে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেল রিনালদি।

আমি বললাম, "ওহ্!"

ও বলল, "কী নোংরা রে বাবা! হাতমুখ ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও!"

তারপর আবার বলল,

"বলি, কোথায় কোথায় গেলে, কী কী করলে—এক্ষুনি বলো।"

উত্তর দিলাম, "সব জায়গায় গেছি। মিলান, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স, ভিয়া সান জিয়োভান্নি, মেসিনা, তাওরমিনা—"

"এ কী রে, এ যে দেখি টাইম টেবিল আওড়াচ্ছে। ফুর্তি-ফার্তা কেমন হল সেটা বলো না বাপু।

"তা, হল।"

"কোথায়?"

"মিলানো, ফিরেন্‌জে, রোমা, নাপোলি—"

"হয়েছে, হয়েছে। কোন্‌টা সেরা সেটা বলো।"

"মিলানোরটা।"

"সবচেয়ে প্রথমটা সবচেয়ে মিষ্টি তো হবেই। তা, কোথায় পেলে তাকে? কোভাতে? কোথায় কোথায় গেলে? কেমন মনে হল? বলো, বলো! রাত কাটিয়েছিলে?"

"কাটিয়েছিলাম।"

"ও কিছু না। এখানে যা-সব দুর্দান্ত মেয়ে এসেছে, সে আর কী বলব! সব নতুন মাল, এর আগে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি।"

"অহো, অহো!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ, বিকেলে দেখিয়ে দেব। আর শহরে—চাকুমচুকুম সুন্দরী ইংরেজ মেয়ের দল। আমি এখন মিস বার্কলের সঙ্গে প্রেম করছি। তোমাকে নিয়ে যাব ওর ওখানে। ওকে বিয়েই করব ভাবছি।"

"রও, রও। হাতমুখ ধুতে হবে, হাজিরা দিতে হবে। আজকাল কেউ কাজকর্ম করে না নাকি?"

"তুমি যাওয়ার পর থেকে আমাদের স্রেফ বিশ্রী-বিশ্রী রোগ ছাড়া আর কিছু নেই। কারুর জন্ডিস, কারুর গনোরিয়া, কারুর নিউমোনিয়া, কারুর সিফিলিস। কারুর আবার ঠান্ডায় ফোস্কা পড়েছে। কেউ কেউ আবার নিজেই একটু চোট লাগিয়ে নিয়েছে। প্রতি সপ্তায় কেউ-না-কেউ পাথরের টুকরোয় চোট পাচ্ছেই—অবশ্য দু'-একজনের সত্যিকারের চোটও লেগেছে। সামনের সপ্তায় তো ফের যুদ্ধ শুরু হবে। আবার বোধ হয় বাধল। সবাই তা-ই বলছে। আচ্ছা, মিস বার্কলেকে বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে? অবশ্য যুদ্ধের পর।"

"একশোবার ঠিক হবে।" বেসিনটাতে জল ঢেলে ভর্তি করলাম আমি।

"রাত্তিরে সব বলবে আমায়।" রিনালদি বলল, "এখন একটু ঘুমিয়ে তরতাজা হয়ে নেব। মিস বার্কলের কাছে সুন্দর হয়ে যেতে হবে তো!"

জামাটামা খুলে বেসিনের জলে হাতমুখ ধুলাম। তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ঘরের চারপাশটা আর জানলার বাইরেটা দেখলাম। চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে রিনাল্‌দি। স্বাস্থ্য ভাল, আমারই বয়সী, বাড়ি অ্যামাল্‌ফিতে। শল্যচিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছে আছে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। ওর দিকেই চেয়ে আছি। হঠাৎই চোখ খুলে ও বলল,

"সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু আছে?"

"আছে।"

"তাহলে পঞ্চাশ লিরে ধার দাও।"

হাত মুছে দেয়ালে ঝোলানো জামা থেকে মানিব্যাগটা বের করলাম। নোটটা ভাঁজ করে, বিছানা থেকে না উঠেই ব্রিচেসের পকেটে ঢুকিয়ে দিল রিনাল্‌দি। একটু হেসে বলল,

"আসলে মিস বার্কলেকে বোঝাতে হবে আমি বেশ মালদার আদমি। তুমি হচ্ছো আমার টাকা জোগানোর প্রাণের বন্ধু!"

বললুম, "চুলোর দোরে যাও।"

রাত্তিরে মেসে পাদ্রির পাশে বসলাম। আব্রুৎসিতে যাইনি শুনে হতাশ হল ও। মনে হল যেন হঠাৎ খুব আঘাত পেল। আমার যাওয়ার কথা ওর বাবাকে লিখে জানিয়েছিল। তারাও সব বন্দোবস্ত করে আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন। শুনে খুব খারাপ লাগছিল, ওখানে কেন যে যাইনি তা-ও ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম—কীভাবে নানান ঘটনার আবর্তে পড়ে আব্রুৎসিতে যেতে চেয়েও যেতে পারিনি। অবশেষে পাদ্রি বুঝতে পারল, সত্যিই আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, অভিমানের মেঘটা কেটে গেল। সেদিনে প্রচুর পান করলাম, কফি আর স্ট্রেগা খেয়ে নেশার ঝোঁকে ওকে বোঝাতে শুরু করলাম কেন এমন হয়—ইচ্ছে থাকলেও মাঝেমধ্যে তা করা হয়ে ওঠে না।

অন্যরা যখন তর্কাতর্কি করছে, আমরা দু'জনে তখন কথা বলছি। আমি আব্রুৎসিতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এমন কোথাও আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি যেখানে রাস্তাঘাটে বরফ পড়ে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে, যেখানে তীব্র ঠান্ডা অথচ একেবারে পরিষ্কার, আর গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার, যেখানে তুষারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে নিয়েছে খরগোশের দল; যেখানে রাস্তায় দেখা হলে চাষিরা টুপি খুলে অভিবাদন জানায়, লর্ড বলে সম্বোধন করে, আর যেখানে আছে ভাল ভাল শিকার। এরকম কোনও জায়গায় আমার যাওয়া হয়নি। গেছি শুধু সেখানে, যেখানে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাফেগুলো অন্ধকার, পুরো ঘরটা যেন ঘুরছে, তা থামানোর জন্য চেয়ে থাকতে হয় দেয়ালের দিকে। মদের নেশায় বুঁদ হয়ে সারারাত বিছানায় পড়ে-থাকা—মনে হয় এই যেন পরম পাওয়া।

আঁধারি অবাস্তব জগৎ, সারারাত পাশে যে ছিল তাকে চিনিও না, তারপর মোহময় উত্তেজনা নিয়ে ঘুম ভাঙা, আর সেই নেশাতেই আবার রাতের সূচনা। দুনিয়ার আর কোথাও যেন কিছু নেই। কিছুই চাওয়ার নেই, যা দেখছি এই-ই সব। আবার হঠাৎ সব চাওয়া, ঘুমের মধ্যে তাকে আঁকড়ে ধরা। কখনও ঘুম ভাঙতে সকাল হয়ে যায়—রাতের মায়া হারিয়ে যায় দিনের আলোয় উজ্জ্বলতায়, সবই যেন কঠিন, একান্ত বাস্তব, আর মাঝেমধ্যে দরদামের ঝগড়া। কখনও অনুরণন থেকে যায় আগের রাতের, প্রীতি আর সুখের সঙ্গে আসে প্রাতরাশ। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। কখনও বা সব মাধুর্য হারিয়ে যায়, রাস্তায় বেরিয়ে স্বস্তি পাই। কিন্তু সর্বদাই দিনের পর রাত আর রাতের পর দিন। ওই রাতগুলোর কথাই বলতে চাইছি আমি, দিনের সঙ্গে রাতের তফাতটা বোঝাতে চাইছি। দিনটা খুব ঠান্ডা। আর আকাশ নির্মল হলে দিনের চেয়ে রাতগুলোকেই বেশি ভাল লাগত। এইসব আমি বলতে চাইছি, কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। তবে কেউ যদি এমন রাত কাটিয়ে থাকে, কেউ যদি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে আমার কথা। পাদ্রির সে অভিজ্ঞতা ছিল না, তবু সে বুঝল আব্রুৎসিতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারিনি আমি। তাতেও আমাদের বন্ধুত্ব আগের মতোই রইল—যেমন আমাদের রুচির নানান মিল সত্ত্বেও মতের অনেক ফারাকও রয়ে গেছে। পাদ্রি যে-জীবনকে জানত আমি তাকে জানতাম না। কখনও জেনে থাকলেও তৎক্ষণাৎ ভুলে গেছি। কিন্তু তখনও সে-জীবনকে চিনিনি আমি, তবে অনেক পরে চিনেছি তাকে।

এদিকে সবাই ততক্ষণে মেসে এসে পড়েছে, খাওয়াও শেষ হয়েছে, তর্ক জমে উঠেছে। আমরা কথা বলা বন্ধ করলাম। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন, "পাদ্রির মনে বড় কষ্ট, মেয়েমানুষ ছাড়া পাদ্রি সুখ পায় না।"

"আমি খুব সুখে আছি।" পাদ্রি বলল।

"না, পাদ্রি মোটেই সুখে নেই। ও চায় অস্ট্রিয়ানরা জিতুক।" ক্যাপ্টেন বলছেন আর সবাই শুনছে।

পাদ্রি মাথা নাড়ল,

"কক্ষনো না।"

"পাদ্রি চায় না আমরা আক্রমণ করি। আমরা আক্রমণ করি, সেটা কি তুমি চাও না পাদ্রি?"

"যুদ্ধ বাধলে আক্রমণ তো আমাদের করতেই হবে।" পাদ্রি বলল।

"তা তো করতেই হবে, আর আমরা করবই।"

পাদ্রি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ওকে রেহাই দাও, ও ঠিকই আছে।" মেজর বললেন।

"ঠিক না থাকলেও কিছু করার নেই।" ক্যাপ্টেন বললেন। টেবিল ছেড়ে আমরা সবাই উঠে পড়লাম।

''

পাশের বাগানে গোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙল পরের দিন। চোখ মেলে দেখলাম, জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। উঠে পড়লাম। জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম—সবুজ ঘাসের দল আর তার মাঝখানে সাদা নুড়ি বসানো রাস্তাটা ভিজে গেছে শিশিরে। দু'বার কামানের আওয়াজ হল—দু'বারই গোলার ধাক্কায় উদ্দাম হাওয়া এসে জানলা ঝাঁকিয়ে আমার পাজামায় দোলা দিয়ে গেল। কামান চোখে পড়ছে না, কিন্তু ওরা যে সরাসরি আমাদের ওপর গোলা ছুঁড়ছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বিশ্রী অবস্থা, তবে গোলার আকারগুলো তেমন বড় নয়। বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় রাস্তায় একটা মোটর ট্রাকের আওয়াজ পেলাম। পোশাক-টোশাক পরে নীচে নেমে রান্নাঘরে গিয়ে কফি খেয়ে নিয়ে গ্যারাজের দিকে পা বাড়ালাম।

টানা চালার নীচে পাশাপাশি দশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ-চ্যাপ্টা অ্যাম্বুলেন্স—দেখতে মালটানা গাড়ির মতো, বাইরে খাকি রং। কারিগররা একটা গাড়ি নিয়ে বাইরে উঠোনে কাজ করছে, বাকি তিনটে গাড়ি আছে পাহাড়ের ওপরে চিকিৎসা-কেন্দ্রে।

"আমাদের কামানের ওপর কি ওদের গোলা এসে পড়ে।" একজন কারিগরকে জিজ্ঞেস করলাম।

"না সিনর তেনেন্তে, ওটা ছোট পাহাড়টার আড়ালে রাখা আছে।"

"এদিকের খবর-টবর কেমন?"

"খারাপ নয়। এই মোটরটা বিগড়ে গেছে বটে, তবে বাকিগুলো চলছে ঠিকই।" বলল কারিগরটি। তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করল,

"ছুটিতে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

জাম্পারে হাত মুছে হেসে বলল, "কেমন কাটল?"

অন্য কারিগররাও একগাল হাসল।

বললাম, "খুব ভাল। এ-মেশিনটার কী গড়বড় হয়েছে?"

"ওটার কিছু-না-কিছু লেগেই আছে। সারাক্ষণই গড়বড়।"

"এখন কী হয়েছে?"

"নতুন রং লাগবে।"

ওরা কাজ করতে লাগল, আমি চলে এলাম। গাড়িটাকে দেখতে বিশ্রী লাগছিল—ইঞ্জিনটা খোলা, টুকরোগুলো বেঞ্চের ওপর জড়ো করা, গাড়ির শূন্য খোলটা ধু-ধু

ফাঁকা। ওখান থেকে সরে চালাটার নীচে এসে অন্য গাড়িগুলো দেখতে লাগলাম। এগুলো মোটামুটি পরিষ্কারই আছে—কয়েকটা সবে ধোয়া হয়েছে, কয়েকটা তখনও ধুলোয় ভরা। টায়ারগুলো বেশ ভাল করে দেখলাম—কোথাও কেটে গেছে কিনা, কিংবা কোথাও পাথরে ঘষে গেছে কিনা। না, সবক'টাই বেশ ভাল আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—আমি হাজির থেকে দেখাশোনা করা না করায় কিছু যায়-আসে না। আমি ভাবতাম গাড়িগুলোর অবস্থা, অসুস্থদের ঠিকভাবে চিকিৎসা-কেন্দ্র থেকে সরিয়ে বন্দোবস্ত-কেন্দ্রে নিয়ে আসা, সেখান থেকে নথিপত্র অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে তাদের ঠিকমতো ভাগ করে রেখে আসা—এগুলো অনেকটা নির্ভর করে আমার ওপর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার থাকা-না-থাকায় তেমন কিছু যায়-আসে না, কাজ ঠিকই চলবে।

সার্জেন্ট মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলাম,

"কলকব্জা পেতে সমস্যা হচ্ছে না তো?"

"না, সিনর তেনেন্তে।"

"পেট্রোল এখন কোথায় রাখা হয়?"

"আগেকার জায়গাতেই।"

"আচ্ছা।"

মেসে ফিরে আর এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসলাম—জমানো দুধ দিয়ে মিষ্টি-করা ধূসর রঙের কফি। জানলার বাইরে বাসন্তী সকাল। বড় সুন্দর লাগছে। হাওয়ায় শুকনো ভাব—দিনটা যে পরে গরম হয়ে উঠবে তারই ইঙ্গিত।

সারাদিন পাহাড়ের ওপরের ঘাঁটিগুলো দেখে বেড়ালাম, শহরে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল।

সবকিছু দেখে মনে হল, আমি না থাকার সময় এদিকের বন্দোবস্ত দিব্যি চলছিল। শুনলাম আবার আক্রমণ শুরু হবে। আমাদের ডিভিশনকে আক্রমণ করতে হবে নদী ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে। মেজর বললেন আমাকে ওদিককার ঘাঁটিগুলো দেখাশোনা করতে হবে। সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ছাড়িয়ে নদী পেরিয়ে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়বে আক্রমণকারী সৈন্যরা। গাড়ির ঘাঁটিগুলো থাকবে যথাসম্ভব নদীর ধারে আর আড়ালে। জায়গাগুলো অবশ্য বাছাই করবে সৈন্যবাহিনী, তবু আমাদেরই সেগুলো খুঁজে বার করতে হবে। এইসব দায়িত্ব পেয়েই একটা ফাঁপা বীরত্বের ভাব এসে যায় মনে—মনে হয় আমিও যেন যুদ্ধ করছি!

সারা শরীরে ধুলো-বালি মেখে ফিরে এলাম। হাত-মুখ ধুতে ঘরে গেলাম। রিনাল্দি তখন বিছানায় হিউগোর ইংরেজি ব্যাকরণ খুলেছে। সেজেগুজে বসেছে, পায়ে কালো বুট, পরিপাটি করে আঁচড়ানো মাথাটা চকচক করছে।

আমাকে দেখে বলল,

"খুব ভাল হল। আমার সঙ্গে মিস বার্কলের কাছে চলো।"

বললাম, "আমি যাব না।"

"চলো, চলো। আমার সম্বন্ধে ওর যাতে ভাল ধারণা হয়, তার ব্যবস্থাটা করে দাও।"

"দাঁড়াও, একটু সাফসুতরো হয়ে নিই।"

"হাতমুখ ধুয়ে নিলেই হবে। আর সাজগোজ করতে হবে না।"

হাতমুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, চললাম ওর সঙ্গে।

রিনাল্‌দি বলল,

"দাঁড়াও, একটু কিছু পান করে নেওয়া যাক।" ট্রাঙ্ক খুলে একটা বোতল বার করল।

"স্ট্রেগা চলবে না ভাই।" আমি বললাম।

"আরে না না, এটা গ্রাপ্পা।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

দু'গ্লাস পানীয় ঢালা হল। দুজনে গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে গলায় ঢাললাম। বেশ কড়া জিনিস।

রিনাল্‌দি বলল, "আর এক গ্লাস হবে?"

বললাম, "দাও।"

দ্বিতীয় গ্লাসটা শেষ করে বোতল রেখে নীচে নামলাম আমরা। শহরের রাস্তায় হাঁটতে বেশ গরম লাগছে, কিন্তু সূর্য তখন ডুবন্ত, তাই খারাপ লাগছে না। যুদ্ধের আগে জার্মানদের বানানো একটা বিরাট বাড়িতে ইংরেজদের হাসপাতালটা চালু হয়েছিল। মিস বার্কলে বাগানেই ছিল, সঙ্গে আরও একজন নার্স। গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের সাদা পোশাক চোখে পড়তে আমরা কাছে গেলাম। রিনাল্‌দি অভিবাদন জানাল, আমিও একটু অভিবাদনের ভঙ্গি করলাম। মিস বার্কলেও অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করল,

"আপনি তো ইতালিয়ান নন?"

"না, আমি ইতালিয়ান নই।" উত্তর দিলাম আমি।

রিনাল্‌দি তখন অন্য নার্সটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

বার্কলে বলল,

"অথচ আপনি রয়েছেন ইতালিয়ান ফৌজে? অদ্ভুত ব্যাপার!"

"ফৌজে ঠিক নয়, আমি অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনীতে আছি।"

"তাহলেও খুব অদ্ভুত! এটা কেন করলেন?"

"কেন করলুম নিজেই জানি না, আপনাকে আর কী জবাব দেব! সব কাজেরই কি উত্তর থাকে?"

"থাকে না বুঝি? আমি কিন্তু উল্টোটাই শিখেছি।"

"সেটা অবশ্য ভাল শিক্ষা।"

"আচ্ছা, আমরা কি এভাবেই কথা বলব?"

"না, না।"

"যাক, বাঁচা গেল।"

"ওই ছড়িটা কীসের?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দীর্ঘাঙ্গিনী মিস বার্কলের পরনে সম্ভবত নার্সের পোশাক। গায়ের ফর্সা রঙে তামাটে আভা, সোনালি চুল, পিঙ্গল চোখ। দেখতে যথেষ্টই সুন্দরী। হাতে একটা ছোট্ট সরু বেতের ছড়ি, অনেকটা খেলনার ঘোড়ার চাবুকের মতো দেখতে, চামড়া দিয়ে মোড়া।

"এটা একজনের ছিল, গত বছর যুদ্ধে সে মারা গেছে।"

"ওহ্!"

"চমৎকার মানুষ ছিল। আমাদের বিয়ের সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু তার আগেই সোমের রণাঙ্গণে মারা গেল ও।"

"ওখানে তো খুব নৃশংস কাণ্ড ঘটে গেছে।"

"আপনিও ওখানে ছিলেন নাকি?"

"না।"

মিস বার্কলে বলল, "আমি শুনেছি এখানে নাকি তেমন যুদ্ধ হয়ইনি। ওর মা ছড়িটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওর জিনিসপত্র যখন ফেরত আসে, তখন তার মধ্যে এটা ছিল।"

আমি বললাম, "আপনারা কি অনেকদিন বাগ্‌দত্ত ছিলেন?"

"আট বছর। একসঙ্গেই বড় হয়েছি আমরা।"

"তাহলে এতদিন বিয়েটা করেননি কেন?"

"কী জানি! কী বোকামিই না করেছি! অথচ ওকে আমি সবই দিতে পারতাম, শুধু মনে হয়েছিল তাতে হয়তো ওর ক্ষতি হবে।"

"ও!"

"আপনি কখনও কাউকে ভালবেসেছেন?"

"না।"

একটা বেঞ্চে বসলাম দু'জনে। আমি ওকে দেখছিলাম। বললাম, "আপনার চুলগুলো খুব সুন্দর!"

মিস বার্কলে বলল, "আপনার ভাল লাগছে?"

"ভীষণ ভাল লাগছে।"

"ও মারা যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম সব চুল কেটে ফেলব।"

"না, না।"

"আসলে আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওর জন্যে কিছু করার। এসব ব্যাপারে আমি কোনও কিছুর পরোয়া করি না। সবই দিতে পারতাম, ওর যে-কোনও প্রয়োজন একবার জানতে পারলেই মেটাতে পারতাম। বিয়ে হোক আর না-ই হোক, ওকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না। আজ আমি সবই বুঝি, কিন্তু তখন আমি এসব বুঝতাম না! তারপর আমার অজান্তেই যুদ্ধে চলে গেল।"

আমি চুপ করে আছি, মিস বার্কলে বলে চলেছে,

"তখন আমি এসব ঠিক বুঝতাম না। মনে হত এসব ওর সহ্য হবে না, হয়তো ওর ক্ষতি হবে! শেষ পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ে সব সমাধান করে দিল।"

"তাই হবে হয়তো।" আমি বললাম।

আমার কথায় কান না দিয়েই ও বলে চলল,

"হ্যাঁ, এভাবেই সব শেষ হয়ে গেল।"

রিনাল্‌দি অন্য নার্সটির সঙ্গে কথা বলছিল, আমরা সেদিকে তাকালাম। প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করলাম,

"ওই মেয়েটির কী নাম?"

"ফার্গুসন, হেলেন ফার্গুসন। আপনার বন্ধুটি তো ডাক্তার, না?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে।"

"সেটা সত্যিই খুব আনন্দের কথা। এই যুদ্ধ-সীমান্তে ভাল কাউকে তো পাওয়াই যায় না। আচ্ছা, এখান থেকে যুদ্ধক্ষেত্র খুব কাছে, না?"

"হ্যাঁ, খুবই কাছে।"

"এ একটা অদ্ভুত যুদ্ধ-সীমান্ত! তবে জায়গাটা খুব সুন্দর। আক্রমণ কি শুরু হবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে অন্তত কিছু কাজ পাওয়া যাবে। এখন তো আমরা একেবারে বেকার।"

আমি বললাম,

"এই নার্সের কাজ কি অনেকদিন করছেন?"

"১৯১৫ সালের শেষ দিক থেকে। ও যখন যুদ্ধে যায়, তখনই আমিও যোগ দিই। এখন মনে পড়ে বোকার মতো ভেবেছিলাম যে যখন আমি হাসপাতালে থাকব, তখন হয়তো সেখানে ও আসবে আহত হয়ে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কাঁধের মধ্যে দিয়ে হয়তো গুলি চলে গেছে। মানে, একটা স্বপ্নের ছবির মতো আর কি।"

"এই সীমান্তটাও কিন্তু ছবির মতোই।" প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা করি। বার্কলে বলল,

"হ্যাঁ, তা ঠিক।" তারপর আবার বলে চলল,

"কিন্তু লোকে ঠিক বোঝে না, ফ্রান্স কী অপূর্ব সুন্দর জায়গা! বুঝলে সেখানে এই ধ্বংসলীলা চলতে পারত না। কোনও আঘাত নিয়ে আমার কাছে আসেনি ও, ওকে ওরা ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছিল।"

আমি চুপ করে রইলাম। ও আবার বলল,

"আপনার কি মনে হয়, এভাবেই চিরকাল চলবে?"

"না।" আমি উত্তর দিলাম।

"কীভাবে থামবে বলতে পারেন?"

"কোথাও-না-কোথাও পরাজয় হবেই, তখন আপনিই যুদ্ধ বন্ধ হবে।"

"হারলে আমরাই হারব, আর সেটা ওই ফ্রান্সেই হারব। সোমের যুদ্ধক্ষেত্রে যা ঘটছে তা ঘটতেই থাকবে, অথচ আমাদের হার হবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না।"

"এখানে কিন্তু আমরা হারব না।" আমি বললাম।

"আপনার তাই মনে হয় বুঝি?"

"ঠিক তা নয়, তবে গত গ্রীষ্মে এরা দারুণ লড়াই করেছে।"

"তা সত্ত্বেও ওরা হারতে পারে, এই লড়াইয়ে যে-কেউ হারতে পারে।"

"সে তো জার্মানরাও হেরে যেতে পারে!"

"না, আমার তা মনে হয় না।"

আমরা রিনাল্‌দি আর ফার্গুসনের কাছে গেলাম। রিনাল্‌দি তখন ফার্গুসনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছে,

"ইতালি তোমার ভাল লাগছে?"

"তা লাগছে!" ইংরেজিতে উত্তর দিল ফার্গুসন।

মাথা নেড়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে রিনাল্‌দি বলল, "বুঝলাম না।"

কথাটা ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলাম ওকে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গিটা ওর তেমন পছন্দ হল না। ভাল লাগার পরিমাণটা বোঝার জন্য ও আবার জিজ্ঞেস করল,

"ইংল্যান্ড তোমার ভাল লাগে?"

ফার্গুসন বলল, "খুব-একটা লাগে না, আসলে আমি স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা তো।"

কিছুই বুঝতে না পেরে রিনাল্‌দি আমার দিকে তাকাল। আমি ইতালীয় ভাষায় বললাম, "উনি আসলে স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা, তাই ইংল্যান্ডের চেয়ে স্কটল্যান্ডকেই উনি বেশি ভালবাসেন।"

রিনাল্‌দি বলল, "কিন্তু স্কটল্যান্ড তো ইংল্যান্ডই—"

এবার আমি কথাটা অনুবাদ করে মিস ফার্গুসনকে বুঝিয়ে দিলাম। ফার্গুসন বলল,

"মোটেই না।"

"তাই নাকি?" রিনাল্‌দি বলল।

"কোনও দিনও না। ইংরেজদের আমরা পছন্দ করি না।"

"ইংরেজদের পছন্দ করো না? তাহলে বার্কলেকেও পছন্দ করো না?"

"ওর কথা আলাদা। বার্কলে নিজেও কিছুটা স্কটিশ। তাছাড়া সব কথার আক্ষরিক অর্থ করলে কি চলে?"

খানিকক্ষণ পরে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম আমরা। ফেরার সময় রিনাল্‌দি বলল,

"মিস বার্কলে আমার চেয়ে তোমাকেই বেশি পছন্দ করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ওই ছোট্ট স্কটল্যান্ডবাসিনীটিও খুব সুন্দর।"

আমি তাকে তেমনভাবে লক্ষই করিনি, তবুও বললাম,

"সত্যিই খুব সুন্দর। তোমার পছন্দ হয়েছে?"

রিনাল্‌দি উত্তর দিল, "না!"

পরদিন বিকেলে আবার মিস বার্কলের কাছে গেলাম। বাগানে তাকে না দেখে অ্যাম্বুল্যান্স চালিয়ে বাড়ির পাশের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম। ভেতরে ছিলেন ওদের প্রধানা নার্সটি। তিনি বললেন,

"মিস বার্কলে তো ডিউটিতে আছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে জানেন তো?"

বললাম, "হ্যাঁ, জানি।"

"আপনি তো ইতালিয়ান বাহিনীর সেই আমেরিকানটি, তাই না?"

"ঠিক বলেছেন।"

"আচ্ছা, এটা কেন করেছিলেন? আমাদের সঙ্গে যোগ দেননি কেন?"

"কী জানি।" আমি বললাম, "এখন আপনাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় না?"

"মনে তো হয় না। ইতালিয়ানদের সঙ্গে যোগ দিলেন কেন?"

আমি বললাম, "আমি ইতালিতেই ছিলাম। ইতালিয়ান ভাষায় কথাও বলতে পারতাম।"

তিনি বললেন, "আমিও ইতালিয়ান ভাষা শিখছি। খুব সুন্দর ভাষা।"

"অনেকে বলে দু' সপ্তাহেই ভাষাটা শেখা যায়।"

"আমার অবশ্য দু' সপ্তাহে হবে না। কয়েক মাস হয়ে তো গেল।" নার্সটি বললেন। তারপর কথা শেষ করার জন্যই যেন বললেন, "সাতটার পর এলে মিস বার্কলের

সঙ্গে দেখা হবে, তখন ওর ছুটি হয়ে যাবে। তবে একগাদা ইতালিয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন না কিন্তু!"

"ওদের সুন্দর ভাষাটার কথা ভেবেও আনা যাবে না?"

"না, এমনকী ওদের দারুণ পোশাকের জন্যেও না।"

"আচ্ছা, শুভসন্ধ্যা।"

"আ রিভেদেরচি, তেনেন্তে।"

"আ রিভেদেরলা।" অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিদেশিকে ইতালীয় কায়দায় অভিবাদন জানানো খুব অস্বস্তিকর। এটা ওদের দেশের বাইরে ঠিক চলে না।

বেশ গরম রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে প্লাভায় সেতুর মুখ পর্যন্ত গেলাম। এখান থেকেই আক্রমণ শুরু হওয়ার কথা। গত বছর এখান থেকে বেশিদূর এগোনো যায়নি, কারণ তখন গিরিপথ দিয়ে এই ভাসমান সেতু পর্যন্ত একটাই মাত্র রাস্তা ছিল, তারও মাইল খানেক বিপক্ষের মেশিনগান আর কামানের গোলার আওতায় থাকত। আক্রমণ করার উপযোগী জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পক্ষে রাস্তাটা এতই সরু যে আমাদের ওখানে পেলে অস্ট্রিয়ানরা একেবারে দফারফা করে দিত।

এবছর কিন্তু ইতালিয়ানরা নদী পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে, এমনকী নদীর ওপার থেকে অস্ট্রিয়ানদের প্রায় মাইল দেড়েক হঠিয়ে দিয়েছে। জায়গাটা খুব অসুবিধাজনক, ওটা হাতছাড়া করা অস্ট্রিয়ানদের উচিত হয়নি। পরস্পরের মধ্যে বোধহয় একটা সহিষ্ণুতা ছিল, কেননা নদীর আরও কিছুটা দূরে একটা সেতুর মুখ তখনও দখল করে রেখেছিল অস্ট্রিয়ানরা। ওদের ট্রেঞ্চগুলো ওপর দিকে, পাহাড়ের গায়ে—ইতালিয়ানদের সীমানা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। ছোট্ট একটা শহরও ছিল সেখানে, এখন সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে, রয়ে গেছে শুধু রেলস্টেশনটা আর ভাঙাচোরা একটা সেতু—সেটা ব্যবহার করা যায় না আবার সরিয়ে নেওয়াও যায় না, কারণ সবদিক থেকেই সেতুটা স্পষ্ট দেখা যায়।

সরু রাস্তা দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গেলাম, তারপর পাহাড়ের নীচে শুশ্রূষা-কেন্দ্রে গাড়ি রেখে পাহাড়ের আড়াল দেওয়া ভাসমান সেতুটা পার হয়ে ট্রেঞ্চগুলোর মধ্যে দিয়ে সেই বিধ্বস্ত শহর আর পাহাড়ের পাশে পৌঁছলাম। সবাই ট্রেঞ্চের ভেতরেই ছিল। একরাশ রকেট রয়েছে সেখানে। কামানের সাহায্য প্রয়োজন হলে কিংবা টেলিফোন লাইন নষ্ট হলে রকেট ছুঁড়েই সঙ্কেত দেওয়া হবে। কাঁটাতারের মধ্যে দিয়ে অস্ট্রিয়ানদের সীমানার দিকে তাকালাম—কেউ কোথাও নেই। পূর্বপরিচিত একজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে একটু মদ্যপান করে আবার সেতু পেরিয়ে ফিরে এলাম।

নতুন একটা চওড়া রাস্তা বানানো হচ্ছে। রাস্তাটা পাহাড়ের ধার পর্যন্ত সোজা চলে যাবে, সেখান থেকে এঁকেবেঁকে নেমে যাবে সেতু পর্যন্ত। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বড়

বাঁক নিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। রাস্তাটা বানানো শেষ হলেই আক্রমণ শুরু হবে। ভাবা হয়েছিল—যাবার সময় সমস্ত যানবাহন যাবে নতুন রাস্তাটা দিয়ে, ফিরে আসবে পুরনো রাস্তা দিয়ে। খালি ট্রাক, গাড়ি আর অ্যাম্বুল্যান্সের জন্যও পুরনো সরু পথটাই থাকবে। আমাদের শুশ্রূষা-কেন্দ্রটা ছিল নদীর ওপারে, অস্ট্রিয়ানদের সীমানার দিকে পাহাড়ের কিনারে, এবং স্ট্রেচার-বাহকরা আহতদের নিয়ে আসত ভাসমান সেতুটা দিয়ে নদী পার হয়ে। আক্রমণ শুরু হলেও এই নিয়মেই কাজ চলবে। আমার ধারণা নতুন রাস্তার শেষ মাইল খানেক এলাকা, যেখানটা প্রায় সমভূমিতে এসে গেছে, সেখানে অনবরত গোলা ছুঁড়তে পারবে অস্ট্রিয়ানরা। সেক্ষেত্রে বেশ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়িগুলো লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা পেয়ে গেলাম। এখানে গাড়িগুলো বিপজ্জনক রাস্তার শেষটুকু পেরিয়ে আহতদের ভাসমান সেতু পেরিয়ে আসার জন্য অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারবে। নতুন রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সটা চালিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু তখনও রাস্তাটা তৈরি শেষ হয়নি। খুব ভাল সরঞ্জাম দিয়ে রাস্তাটা বানানো হচ্ছে—সুন্দর চওড়া রাস্তা, পাহাড়ের দিকের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে তার বাঁকগুলো, সেগুলোও খুব সুন্দর। ভাল ব্রেক থাকার ফলে এ-রাস্তায় গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে না, আর নামার সময় তো ওগুলো খালিই থাকবে। সরু খাড়াই পথটা ধরেই ফিরে এলাম।

দু'জন বন্দুকধারী আমার গাড়িটা পথের মাঝে আটক করল। আমাদের কামানের গোলা এসে পড়েছে সেখানে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আরও তিনটে গোলা এসে পড়ল রাস্তাটার ওপর। সশব্দে ফেটে পড়ছে গোলাগুলো। ৭৭ নম্বরের গোলা—ঝল্কে উঠছে আগুন, তারপর সমস্ত রাস্তাটা ভরে যাচ্ছে ধূসর ধোঁয়ায়। গোলাবর্ষণ থামলে রাইফেলধারীরা আমাদের যেতে ইশারা করল। যেখানে গোলাগুলো পড়েছিল রাস্তার সেই ভাঙা অংশগুলোর পাশ কাটিয়ে চলে এলাম, গন্ধ পেলাম বিস্ফোরকের, পোড়া মাটির আর ছড়িয়ে পড়া গোলার লোহার অংশগুলোর।

গাড়ি চালিয়ে গোরিজিয়াতে ফিরে এলাম। ডিনার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্রিটিশ হাসপাতালের দিকে—মিস বাক্লের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাড়িটা সত্যিই বিরাট আর খুব চমৎকার, বাগানের গাছগুলোও সুন্দর। মিস বার্কলে বাগানে একটা বেঞ্চে বসে ছিল, সঙ্গে মিস ফার্গুসন। আমাকে দেখে দু'জনেই খুশি। খানিক পরেই একটা ছুতো করে মিস ফার্গুসন উঠে পড়ল।

"তোমরা দু'জনে থাকো, আমি চলি। আমি না থাকলেই তোমাদের সময়টা ভাল কাটবে।"

মিস বার্কলে বাধা দিল,

"যেয়ো না, হেলেন।"

"না গো, যেতেই হবে। কতকগুলো চিঠি আজ না লিখলেই নয়।"

"শুভরাত্রি!" আমি বললাম।

"শুভরাত্রি, মিস্টার হেনরি।" মিস ফার্গুসন বলল।

"সেন্সরে কাঁচি চালাতে পারে—এমন কিছু লিখবেন না যেন।" বললাম আমি।

"ভয় নেই, আমি শুধু জায়গাটার সৌন্দর্যের কথা আর ইতালিয়ানদের বীরত্বের কথা লিখব।"

"তা হলে ওরা আপনাকে মেডেল দেবে।"

"ভালই হবে। শুভরাত্রি, ক্যাথারিন।"

মিস বার্কলে বলল, "আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ফার্গুসন।

"বেশ মেয়েটি।" তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে বললাম।

মিস বার্কলে বলল,

"সত্যিই খুব ভাল। ও নার্স।"

আমি বললাম, "কেন, তুমি কি নার্স নও?"

"না না, আমাদের বলে ভি এ ডি। আমাদের খাটতে হয় বেশি কিন্তু কারও ভরসা নেই আমাদের ওপর।"

"কেন, ভরসা নেই কেন?"

"কাজ যখন থাকে না, তখনই অবশ্য ভরসাটা থাকে না। কাজের চাপে পড়লে ভরসা করতেই হয়।"

"তফাতটা কী?"

"নার্স হচ্ছে কতকটা ডাক্তারের মতো। নার্স হতে সময় লাগে। ভি এ ডি তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।"

"বোঝা গেল।"

মিস বার্কলে বলল, "ইতালিয়ানরা যুদ্ধক্ষেত্রের এত কাছে মেয়েদের থাকা পছন্দ করে না, তাই খুব সাবধানে থাকতে হয় আমাদের। বাইরে কোথাও যাই না আমরা।"

"কিন্তু আমি তো আসতে পারি।"

"একশোবার। আমরা তো আর মঠের সন্ন্যাসিনী নই।"

আমি বললাম, "এবার যুদ্ধের কথা ছাড়ান্ দাও।"

"ছেড়ে কোথায় ফেলব বলো তো!"

"যেখানে হোক। মোদ্দা কথা, যুদ্ধের কথা বন্ধ করা যাক।"

"বেশ, তাই যাক।"

ও চুপ করল। অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। অপরূপ

লাগছে ওকে। ওর হাতটা তুলে নিলাম, বাধা দিল না। অন্য হাতে কাঁধের তলা দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

ও বলল, "না।"

হাত না সরিয়েই আমি বললাম, "না কেন?"

"না।"

"হ্যাঁ, সোনা।" ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। পরক্ষণেই বিদ্যুৎঝলকের মতো একটা আঘাত। সজোরে চড় মেরেছে ও। চড়টা পড়েছে আমার নাক আর চোখের ওপর। চোখে জল এসে গেল আমার।

"অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করো।" বাক্‌লে বলল। মনে হল আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বললাম,

'না না, তুমি ঠিকই করেছ, আমি কিছু মনে করিনি।"

"না না, আমি সত্যিই দুঃখিত, বিশ্বাস করো।" ওর গলায় মিনতির সুর। আবার বলল, "হঠাৎ নিজেকে যেন খুব ছোট মনে হল, অন্য সব নার্সরা ছুটির সন্ধে যেমনভাবে কাটায় আমারও নিজেকে সেরকম মনে হল। তোমাকে আমি আঘাত দিতে চাইনি। খুব ব্যথা দিয়েছি তোমাকে?" অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। রাগ আমার আছে, তবে মনে হচ্ছে যেন দাবার ছকের মতো জয়ের রাস্তাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বললাম,

"তুমি ঠিকই করেছ। আমি কিছু মনে করিনি।"

"বেচারি!" বার্কলে বলল।

"আমার খামখেয়ালি জীবন। আমি কখনও ইংরেজি পর্যন্ত বলি না। তা ছাড়া তুমি এত আশ্চর্য সুন্দরী!" স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে।

"আর অনর্থক বোকো না, আমি তো মাপ চাইছিই। এবার মিটিয়ে নাও।"

"বেশ," জবাব দিলাম, "এবার তা হলে আমরা যুদ্ধ ত্যাগ করলাম, কী বলো?"

হেসে ফেলল বার্কলে। এই প্রথম হাসতে দেখলাম ওকে। ওর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকি।

"তুমি খুব মিষ্টি।" ও বলল।

"আদৌ না।"

"হ্যাঁ, খুব মিষ্টি তুমি। খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে তোমাকে, কিছু মনে কোরো না।"

ওর চোখে চোখ রেখে আবার আগের মতো জড়িয়ে ধরলাম, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ঠোঁট দুটো খোলার চেষ্টা করলাম। শক্ত করে চেপে ধরে রাখলাম, তবু সাড়া পেলাম না ওর বন্ধ ঠোঁটের কাছ থেকে। রাগ আমার তখনও যায়নি—তীব্র আবেগে আরও

জোরে চেপে ধরলাম ওকে—ও কেঁপে উঠল, শিথিল হয়ে গেল দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর, ওর বুকের স্পন্দনে উষ্ণ রক্তস্রোত, আমার বুকে তারই প্রতিধ্বনি। দেহের প্রতিরোধ দূর হয়ে মাথাটা হেলে পড়ল আমার হাতের ওপর। হঠাৎ দেখলাম, ও কাঁদছে। বলল, "সত্যি বলো, এমনি করে আমায় ভালবাসবে তুমি?"

এ আবার কী ঝামেলা। আস্তে আস্তে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। ও তখনও কাঁদছে।

"আমায় ফাঁকি দেবে না তো? আমরা যে এক বিচিত্র জীবন শুরু করতে চলেছি।"

খানিকক্ষণ পরে ওকে হাসপাতালের সামনে পৌঁছে দিয়ে মেসে ফিরলাম আমি। ঘরে রিনাল্‌দি বিছানায় শুয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল,

"মিস বার্কলের সঙ্গে বেশ চালাচ্ছ মনে হচ্ছে।"

"স্রেফ বন্ধুত্ব," আমি উত্তর দিলাম।

"তোমাকে ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো খোশমেজাজি মনে হচ্ছে।"

কথাটার মানে বুঝলাম না, তাই মানেটা বুঝিয়ে দিতে বললাম। ও বুঝিয়ে দিল।

"আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এমন একটা কুকুর যে—"

বাধা দিল রিনাল্‌দি,

"থামো, থামো, দোহাই তোমার। এরপর দু'জনেই দু'জনকে গালমন্দ শুরু করব।" হেসে ফেলল ও।

"শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি, পাপি।" রিনাল্‌দি বলল।

ওর মোমবাতির ওপর বালিশটা ছুঁড়ে দিলাম, ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। বিছানায় ঢুকে পড়লাম। মোমবাতিটা জ্বেলে আবার পড়তে শুরু করল রিনাল্‌দি।

টানা দু'দিন ঘাঁটিতে থাকতে হল। যখন ফিরলাম, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ফলে মিস বাক্‌লের সঙ্গে দেখা করার জন্য পরদিন বিকেল পর্যন্ত সবুর করতেই হল।

বিকেলে গিয়ে বাগানে ওকে পেলাম না, ফলে ওদের অফিসঘরে বসতে হল। চুপচাপ বসে ঘরটার চারদিক দেখছি। অফিসঘরের দেওয়ালের পাশে রং-করা কাঠের থামের ওপরে অনেক পাথরের মূর্তি সাজানো—সামনের হলটাতেও তাই। সব মূর্তিই একেবারে একরকম দেখতে। পাথরের মূর্তি ভীষণ ক্লান্তিকর লাগে আমার, ব্রোঞ্জেরগুলো তবু মন্দের ভাল। পাথরের মূর্তি দেখলেই কবরখানার কথা মনে পড়ে আমার। পিসাতেই একমাত্র উৎকৃষ্ট কবরখানা আছে—জেনোয়ার পাথরের মূর্তিগুলো একেবারে বাজে। এ বাড়িটা একজন ধনী জার্মানের, কাজেই এই মূর্তিগুলোও নিশ্চয়ই খুব দামি।

ওইগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে—কে এগুলো তৈরি করেছে আর কতই বা দাম পেয়েছিল! মূর্তিগুলো এ-পরিবারের লোকেদের কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম বহুক্ষণ ধরে, কিন্তু এমন একই আদলে সব বানানো যে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে আছি, কাপড়ের টুপিটা হাতে। গোরিজিয়াতে আমাদের অবশ্য লোহার টুপিই পরার কথা। কিন্তু ওগুলো পরলে বড় অস্বস্তি হয়। তা ছাড়া এই শহরের মধ্যে, যেখানে এখনও সাধারণ মানুষরা বসবাস করছে, সেখানে ওই টুপি মাথায় দিয়ে ঘুরলে নিজেকে যেন থিয়েটারের ভাঁড় বলে মনে হয়। শুধু ঘাঁটিতে যাওয়ার সময় লোহার টুপি মাথায় দিই। তখন গ্যাস-মুখোশও সঙ্গে নিই। এমনকী পিস্তলও নিয়ে ঘুরতে হয় সব সময়। আবার বাইরে থেকে বুঝতে পারা চাই, নইলেই ধরবে। ডাক্তারই হোক বা স্বাস্থ্য বিভাগের যে-ই হোক, সঙ্গে পিস্তল রাখতেই হবে। রিনাল্‌দি পিস্তলের খাপের মধ্যে কাগজ পুরে ঘুরে বেড়ায়। আমারটা কিন্তু আসল, সেটা চেয়ারের পিঠে লেগে এখনও গায়ে ফুটছে। প্রথম প্রথম ওটা নিয়ে ঘোরার সময় নিজেকে খুব বড় বন্দুকবাজ বলে মনে হত, যতদিন না ওটা চালাতে অভ্যাস করলাম। গুলি চালাতে গেলেই পিস্তলটা এমন লাফায় যে নিশানায় গুলি লাগানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষে নিশানার বেশ খানিকটা নীচে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই বিচিত্র পিস্তলের লাফানিকে প্রায় কব্জায় এনে ফেললাম। এখন নিশানা থাকে বিশ পা দূরে, গুলি গিয়ে তার এক গজ দূরে পড়ে। তার পরেও পিস্তল নিয়ে ঘোরাটা সত্যিই হাস্যকর, আমার পিছন দিকে যে একটা পিস্তল ঝুলছে সেটা মনেই থাকে না। শুধু ইংরেজিভাষী কারও সঙ্গে দেখা হলে একটু লজ্জা করে—এটুকুই।

বহুক্ষণ বসে আছি। আর্দালির মতো দেখতে একটা লোক বিরক্তির সঙ্গে দেখছে আমাকে, আর আমি দেখছি পাথরের মূর্তি, কাঠের থাম, দেওয়ালে আঁকা ছবি। দেখছি আর মিস বার্কলের জন্য অপেক্ষা করছি। দেওয়ালচিত্রগুলো বেশ সুন্দর। সবরকম দেওয়ালচিত্রই আমার ভাল লাগে, বিশেষত সেগুলো যখন খসে পড়তে শুরু করে।

এতক্ষণে দেখলাম হলঘরের ওপাশ দিয়ে ক্যাথারিন আসছে। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। এখন আর ওকে দীর্ঘাঙ্গিনী মনে হচ্ছে না, তবে দেখতে ভাল লাগছে।

"শুভসন্ধ্যা, মিস্টার হেনরি," ক্যাথারিন বলল।

"কেমন আছ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম সাদামাটা সুরে। ডেস্কের পিছনে বসে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে আর্দালিটি।

"এখানেই বসব, নাকি বাগানে যাবেন?"

"বাগানেই ভাল, ঠান্ডা আছে।"

ওর পিছনে পিছনে বাগানে গেলাম, আমাদের পিছনে অনুসরণ করল আর্দালিটির দৃষ্টি। লোকটার নজরের বাইরে নুড়িফেলা রাস্তায় এসে ক্যাথারিন বলল,

"কোথায় ছিলে?"

"ঘাঁটিতে।"

"একটা খবরও তো পাঠাতে পারতে?"

"খবর পাঠানোর সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া আমি ভেবেছিলাম, শিগগিরই তো ফিরে আসব।"

"আমাকে জানানো তোমার উচিত ছিল।"

রাস্তা ছেড়ে গাছের নীচে দিয়ে হাঁটছি। ওর হাতদুটো ধরে দাঁড়ালাম একবার, চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে।

আমি বললাম, "কোথাও যাওয়া যায় না?"

ও বলল, "না, এখানেই হাঁটতে হবে। তুমি অনেকদিন ছিলে না।"

"আজ নিয়ে তিনদিন। কিন্তু ফিরে তো এসেছি!"

আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বলল,

"আমাকে তুমি ভালবাসো?"

"বাসি।"

"বলেছিলে না, তুমি আমাকে ভালবাসো? বলোনি?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম। আমি তোমাকে ভালবাসি!"

ডাহা মিথ্যে কথা বললাম। এর আগে কখনও কথাটা বলিনি।

"আমাকে নাম ধরে ডাকবে না?"

"ক্যাথারিন," মৃদুস্বরে ডাকলাম আমি। আবার একটা গাছতলায় দাঁড়ালাম দু'জনে।

"দেখো ক্যাথারিন, আজ রাতে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" ওকে খুশি করার জন্য কথাগুলো আবার বললাম।

"প্রিয় আমার, তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ, ফিরে এসেছ!" আশ্চর্য উচ্ছ্বাস ওর গলায়।

"এসেছি।" বললাম আমি।

"এত ভাললাগে তোমায়—এতগুলো দিন কী কষ্টেই কেটেছে! আর যাবে না তো?"

"না। গেলেও আবার ফিরে আসব।"

"আমাকে আদর করো, তোমার কাছে টেনে নাও, হাত সরিয়ে নিয়ো না।" ক্যাথারিন বলল।

"তুমি তো আমার কাছেই আছো।" ওর মুখটা দেখার জন্য আমার দিকে ঘুরিয়ে নিলাম। ঠোঁটে চুমু খেলাম। চোখ দুটো বুজে গেছে ওর—দুই চোখে চুম্বন দিলাম। মনে হল বোধহয় একটু গোলমাল আছে ওর মাথায়। তবে থাকলেও আমার আপত্তি নেই।

কোথায় চলেছি তা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই আমার। এ অনেক ভাল—অনেক। রোজ সন্ধ্যায় দল বেঁধে গণিকালয়ে যাওয়া, আর সঙ্গীদের একে একে ওপরে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গণিকাদের সেই ছেনালির উৎপাত—সেই জঘন্য পরিস্থিতির চেয়ে এ অনেক ভাল।

আমি ভাল করেই জানতাম মিস বার্কলেকে আদৌ ভালবাসিনি। ভালবাসার কোনও ভাবনাও নেই মনে। এ যেন একটা খেলা চলছে—তাসের ব্রিজ খেলা, শুধু তাসের বদলে কথার কৌশল। ব্রিজের মতোই বাজি ধরে হাত-জিতের নেশা। যদিও বাজিটা যে কীসের তার কোনও উল্লেখ করে না কেউ। হোক খেলা, আমার তাতে কিছু যায়-আসে না।

বললাম, "কোথাও যেতে পারলে ভাল হত।" দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে প্রেম করতে অন্য যে-কোনও পুরুষের মতোই অসুবিধে হচ্ছিল আমার।

"এখানে আর কোনও জায়গা নেই।" ও বলল। এতক্ষণে ও ফিরে এসেছে কল্পনার রাজ্য থেকে।

"ওখানটায় অন্তত একটু বসা যেতে পারে।"

পাথরের চ্যাপ্টা বেঞ্চিটার ওপর বসলাম—ওর হাতটা আমার হাতের মধ্যে। পিঠের ওপর দিয়ে হাত রাখতে দিল না আর।

"তোমার কি খুব ক্লান্ত লাগছে?" ক্যাথারিন বলল।

বললাম, "না তো।"

চোখ নামিয়ে ঘাসের দিকে তাকিয়ে ও বলল,

"একটা বিশ্রী খেলা খেলছি আমরা, তাই না?"

"কী খেলা?"

"বোকা সেজো না।"

"ইচ্ছে করে তো বোকা সাজছি না। কী বলছ বলো?"

"খুব ভাল ছেলে তুমি!" ক্যাথারিন বলল, "পাকা খেলোয়াড়ের মতোই ভাল খেলো, আর জানোও সেটা, কিন্তু তবু বড় বিশ্রী খেলাটা!"

"অন্যের মনের কথা কি তুমি সবসময়ই জানতে পারো?"

"সব সময় না, কিন্তু তোমার বেলায় বুঝতে পারি। ভালবাসার অভিনয় আর করতে হবে না তোমাকে, আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছু বলবে?"

"আমি কিন্তু সত্যি তোমায় ভালবাসি।"

"শুধু শুধু কতকগুলো মিথ্যে বলার কী দরকার। সারা সন্ধেয় বেশ খানিকটা নাটক করা গেল! যাক, এখন ঠিক হয়ে গেছি। আর পাগলামি করছি না! আমি একটু পাগলই আছি, মাঝে মাঝে একটু গোলমাল হয়ে যায়।"

ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললাম,

"আমার ক্যাথারিন!"

"তোমার মুখে ক্যাথারিন নামটা খুব মজার শোনাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঠিক ভাবে যেন বলতেও পারছ না। তবে খুব ভাল ছেলে তুমি, চমৎকার মানুষ।"

"আমাদের পাদ্রিও তাই বলে।"

"ঠিকই বলে, তুমি সত্যিই খুব ভাল। আমাকে দেখতে আবার আসবে তো?"

"অবশ্যই আসব।"

"আর প্রেমের কথা বলতে হবে না, ওটা শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতা।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলল—

"শুভরাত্রি।"

ওর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনলাম। বাধা দিল ও, "খুব ক্লান্ত লাগছে।"

"তা হোক—আমাকে চুমু দাও।"

"আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।"

"চুমু দাও।"

"সত্যি চাও?"

"সত্যিই চাই।"

দু'হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলাম ওকে, ওর ঠোঁটে আমার ঠোঁট। হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল,

"না, না।" ও বলল, "আমি যাই। শুভরাত্রি।"

ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। হলঘর দিয়ে ভেতরে চলে গেল ও। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি ওর চলে যাওয়া—ভারী সুন্দর লাগছে দেখতে। ও চলে যেতে আমিও ফেরার রাস্তা ধরলাম।

রাতটা বেশ গরম। পাহাড়ের ওপর যুদ্ধ চলছে। সান গাব্রিয়েলির ওপরে আগুনের ঝলক দেখতে দেখতে হাঁটছি। ভিয়া রোজার সামনে একবার দাঁড়ালাম। খড়খড়ি বন্ধ, ভিতরে তখনও হইহল্লা চলছে, কেউ একজন গান গাইছে।

ঘরে ফিরে জামাকাপড় বদলাচ্ছি, এমন সময় রিনাল্দি ফিরল।

"এ কী, এ কী, খোকাবাবুর আজ তেমন সুবিধে হয়নি মনে হচ্ছে! কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেছে!"

ওর কথায় কান না দিয়ে বললাম,

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"ভিয়া রোজাতে। আজ দারুণ আমোদ হয়েছে, দুর্দান্ত গান গেয়েছি সবাই! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"ইংল্যান্ডবাসিনীর সঙ্গে দেখা করতে।"

"ভগবান রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস আমি ব্রিটিশের জালে বাঁধা পড়িনি!"

পরদিন বিকেলে পাহাড়ি ঘাঁটি থেকে ফেরার সময় 'স্মিস্তিমেন্তো'র সামনে গাড়ি থামালাম। এখানে জখম ও অসুস্থদের এনে কাগজপত্র অনুযায়ী তাদের বাছাই করা হয়, ভাগ ভাগ করে নানান হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমিই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। গাড়িতেই বসে রইলাম, ড্রাইভার গেল কাগজপত্র আনতে। বেশ গরম, আকাশ গাঢ় নীল, রাস্তাটা ধুলোয় সাদা হয়ে আছে। বিরাট গাড়িটার উঁচু সিটে বসে আছি চুপচাপ। একদল সৈন্য পাশ দিয়ে চলে গেল—তাদের লক্ষ করলাম। গরমে ঘেমে উঠেছে লোকগুলো, কয়েকজনের মাথায় লোহার টুপি, অন্যরা টুপিটা পিঠের বোঝার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে। যে-ক'জন মাথায় টুপি পরেছে, তাদের বেশির ভাগের টুপিই মাপে বড়, কান অবধি নেমে এসেছে। অফিসারদের সবার মাথাতেও লোহার টুপি, তবে তাদের টুপিগুলো মাপে ঠিক আছে। দলটা 'ব্রিগাতা বাসিলিসাতা'র অর্ধেক—ওদের লাল-সাদা ডোরা-কাটা জামার কলার দেখে চিনলাম। দলের কয়েকজন পিছিয়ে পড়েছে—ঘামে, ধুলোয়, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে, দু'-একজনের চেহারা খুবই খারাপ। সবার শেষে একজন সৈনিক এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। রাস্তার পাশে বসে পড়ল লোকটি। গাড়ি থেকে নেমে তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,

"কী হয়েছে তোমার?"

আমার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটি।

বলল, "যাচ্ছি।"

"কী হয়েছে তোমার?"

"যুদ্ধ, যুদ্ধ।"

"পায়ে কী হয়েছে?"

"পায়ে কিছু হয়নি, হার্নিয়া হয়েছে।"

"তাহলে গাড়িতে যাচ্ছ না কেন? হাসপাতালেই বা যাওনি কেন?"

"ওরা যেতে দেয় না যাতে। লেফটেন্যান্ট বলেছে হার্নিয়া-বাঁধা বেল্টটা নাকি আমি ইচ্ছে করেই হারিয়ে ফেলেছি।"

"দেখাও তো একটু।"

"একদম বেরিয়ে পড়েছে।"

"কোন্ দিকে?"

"এই তো।"

হাত দিয়ে অনুভব করে দেখতে দেখতে বললাম,

"একটু কাশো তো।"

"তা হলে আরও বেড়ে যাবে। সকালের থেকে এখন এমনিতেই ডবল হয়ে গেছে।"

"তা হলে এখানেই বসে থাকো, আমি জখমদের সরাবার কাগজপত্র নিয়ে ফেরার পথে তোমাদের ডাক্তারদের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাব তোমাকে।"

"ডাক্তার বলবে ইচ্ছে করে করেছি।" লোকটি বলল।

আমি বললাম,

"বলুক গে। এ তো আর জখম নয়, হার্নিয়া তো তোমার আগে থেকেই ছিল, নাকি?"

"কিন্তু হার্নিয়ার বেল্টটা যে হারিয়ে গেছে।"

"ওরা তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।"

"আমি এখানেই থাকতে পারি না, তেনেন্তে?"

"না। আমার কাছে তো তোমার নামে কোনও কাগজপত্র নেই।"

ইতিমধ্যে গাড়ির আহত লোকেদের জন্য কাগজপত্র নিয়ে ড্রাইভার ফিরে এল। বলল, "চারজন ১০৫ নম্বরে আর দু'জন ১৩২ নম্বরে যাবে।" দুটো হাসপাতালই নদীর ওপারে।

আমি বললাম, "তুমি গাড়িটা চালাও।" তারপর হার্নিয়ার রুগীটিকে ধরে গাড়িতে তুলে নিলাম। গাড়িতে বসে লোকটি বলল,

"আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?"

"পারি।"

"এই হতচ্ছাড়া যুদ্ধটা আপনার কেমন লাগছে?"

"একেবারে কুৎসিত।" আমি বললাম।

"কুৎসিত তো বটেই, একেবারে জঘন্য।"

"তুমি আমেরিকায় গেছ কখনও?"

"গেছি। পিটার্সবুর্গে ছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, আপনি আমেরিকান।"

"কেন, আমি ইতালীয় ভাষা ভাল বলতে পারি না?"

"তা বললেও আমি বুঝেছি আপনি আমেরিকান।"

ওর দিকে তাকিয়ে আমার ড্রাইভারটি ইতালীয় ভাষায় বলল,

"আরও একজন আমেরিকান!"

"আচ্ছা লেফটেন্যান্ট," লোকটি বলল, "আমাকে কি দলের কাছে নিয়ে যেতেই হবে?"

"তা তো হবেই।"

ও বলল,

"আমার হার্নিয়ার খবরটা আমাদের ক্যাপ্টেন ডাক্তার জানেন। ওই হতচ্ছাড়া বেল্টটা আমি ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছি, যাতে হার্নিয়া বেড়ে গেলে আর আমাকে লাইনে যেতে না হয়। আপনি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না?"

আমি বললাম,

"এ-জায়গাটা যুদ্ধ-সীমান্তের আরও কাছে হলে, তোমাকে কোনও শুশ্রূষা-ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু এখান থেকে নিতে হলে তোমার কাগজপত্র তো দরকার।"

"এখন ওখানে গেলেই অপারেশন করিয়ে ফের আমাকে লাইনে পাঠাবে ওরা, আর চিরদিন ওই লাইনেই থাকতে হবে আমাকে।"

কী করা যায় তাই ভাবছি। ও আবার বলল,

"আপনাকে যদি চিরদিন লাইনে থাকতে হয়—আপনি রাজ়ি হবেন?"

"না।"

"এ কী হতচ্ছাড়া যুদ্ধ বলুন তো! হায় ভগবান!"

ইতিমধ্যে আমি একটা বুদ্ধি বার করেছি। ওকে বললাম মাথায় একটা আঘাত তৈরি করে রাস্তায় পড়ে থাকতে, যাতে যাওয়ার পথে আহত হিসেবে ওকে তুলে নিয়ে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে পারি আমি। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে নামিয়ে দিলাম ওকে। আস্তে আস্তে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে ও বলল,

"আমি ঠিক এইখানেই থাকব, লেফটেন্যান্ট।"

ওকে বিদায় জানিয়ে এগোতে শুরু করলাম—মাইলখানেক গিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলাম ওদের বাহিনীকে। তারপর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। বরফ-গলা জলে নদীর ঘোলাটে স্রোত ছুটে চলেছে সেতুর থামগুলোর ফাঁক দিয়ে। ওপারে সমভূমি পেরিয়ে হাসপাতাল দুটোয় আহতদের নামিয়ে দিয়ে খালি গাড়িটা দ্রুত চালিয়ে ফিরে এলাম পিটার্সবুর্গের লোকটির জন্য। আসার সময় আবার ওদের দলটার সঙ্গে দেখা হল। ক্লান্তি যেন আরও বেড়ে গেছে ওদের। চলার গতি অনেক মন্থর। তারপর চোখে পড়ল পিছিয়ে-পড়া কয়েকজনকে। একেবারে শেষে ঘোড়ায়-টানা একটা অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে, দু'জন লোক ধরাধরি করে তুলেছে হার্নিয়ার রুগীটিকে। ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এসেছে ওরা। আমায় দেখে মাথা নাড়ল লোকটি। লোহার টুপিটা খুলে পড়ে গেছে, চুলের নীচে কপাল বেয়ে রক্ত ঝরছে, নাকের ওপরদিকটা ঘষে চামড়া উঠে গেছে, মুখ কপাল আর চুল ধুলোয় ধূসর।

"লেফটেন্যান্ট, চোটটা কেমন বানিয়েছিলাম দেখুন, কিন্তু লাভ হল না। ওরা আমায় নেওয়ার জন্যে এসেছে।" চিৎকার করে আমায় বলল সে।

মেসে ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল। যেখানে গাড়ি ধোয়া হয় সেখানকার শাওয়ারে চান করে, ফতুয়া আর প্যান্ট পরে, রিপোর্ট লেখার জন্য খোলা জানলার ধারে বসলাম। দিন দুয়েকের মধ্যেই আক্রমণ শুরু হবে। তখন গাড়িগুলোর সঙ্গে প্লাভায় চলে যেতে হবে আমাকে।

অনেকদিন দেশে চিঠি লিখিনি। জানি চিঠি লেখা একান্তই উচিত। কিন্তু এত দেরি হয়ে গেছে যে এখন আর লেখা সম্ভব নয়। লেখার তো কিছু নেইও। কয়েকটা ‘যুদ্ধক্ষেত্র’-মার্কা পোস্টকার্ড আগে পাঠিয়েছি, সেগুলোতে ‘আমি ভাল আছি’ এইটুকু রেখে, বাকি সব কেটে দিয়েছিলাম। আমেরিকায় এগুলো বিপুল সম্মান পাবে—যুদ্ধক্ষেত্রের অজানা রহস্যে ভরা আশ্চর্য চিঠি।

যুদ্ধের এই অঞ্চলটাও কেমন যেন এক অজানা রহস্যে ভরা। তবু এখানকার পরিচালন-ব্যবস্থা বেশ ভালভাবেই চলছে, অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় এর তীব্রতাও বেশি। যে-কোনও অস্ট্রিয়ান বাহিনী যেন নেপোলিয়নকে জয়গৌরব দান করার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে—যে-কোনও নেপোলিয়নকে। আমাদেরও একজন নেপোলিয়ন থাকলে ভাল হত।

কিন্তু আমাদের আছেন করিতকর্মা ও বিশালদেহী জেনারেল কাদোরনা এবং ছোটখাটো, রোগা ও দীর্ঘদাড়িবিশিষ্ট ছাগ-শ্মশ্রু ভিত্তোরিও ইমানুয়েল। সর্বোপরি আছেন আওস্তা-র ডিউক। জবরদস্ত সেনাপতি হওয়ার পক্ষে তিনি হয়তো একটু বেশিই সুন্দর, তবু তাঁর চেহারাটা পুরুষোচিত। অনেকের ইচ্ছেও ছিল যে তিনিই রাজা হোন। রাজার মতোই চেহারা তাঁর। তিনি হচ্ছেন রাজার কাকা এবং তৃতীয় বাহিনীর পরিচালক। আমরা আছি দ্বিতীয় বাহিনীতে। তৃতীয় বাহিনীতে কয়েকটা ব্রিটিশ কামান আছে। ওদের দু'জন গোলন্দাজের সঙ্গে মিলানে আমার আলাপ হয়েছিল। দু'জনেই খুব চমৎকার লোক, সন্ধেটাও চমৎকার কেটেছিল ওদের সঙ্গে। বিরাট চেহারা, নম্র স্বভাব, পৃথিবীর সব বিষয়েই আনন্দ খুঁজে পায়—ওদের কাছে সবই প্রশংসার বস্তু।

মনে হল ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দিলেই ভাল হত, ঝামেলা কম থাকত। তবে হয়তো মারা পড়তাম। অবশ্য অ্যাম্বুল্যান্সের কাজে মরতাম না! তাই বা বলা যায় কী করে! অ্যাম্বুল্যান্সে কাজ করেও মানুষ মরতে পারে। ব্রিটিশ অ্যাম্বুল্যান্স-ড্রাইভাররাও তো মরেছে। আমি যে মরব না, সেটা আমি জানতাম। অন্তত এই যুদ্ধে তো কিছুতেই নয়। আমার কেমন একটা বিশ্বাস হয়েছে, এই যুদ্ধ আমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না—মনে হয় যেন চলচ্চিত্রে যুদ্ধ দেখছি। তবু বারবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি—এ-যুদ্ধের অবসান হোক। হয়তো গ্রীষ্মের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হবে। হয়তো অস্ট্রিয়ানরাই পরাজিত হবে, কারণ সব যুদ্ধে ওরাই বরাবর হারে। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারটা কী? সবাই বলছে ফরাসিরা নাকি শেষ হয়ে গেছে! রিনাল্‌দি বলছিল ফরাসি

সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল, পারি শহর আক্রমণ করেছিল। তারপর কী হয়েছিল জানতে চেয়ে উত্তর পেয়েছি, "ওদের আটকে দিয়েছিল।" আমি অস্ট্রিয়ায় যেতে চেয়েছিলাম, অবশ্য যুদ্ধের সময়ে নয়। কৃষ্ণ-অরণ্য দেখতে খুব ইচ্ছে করত আমার, ইচ্ছে করত হারৎসের শৈলমালায় যেতে। কে জানে কোথায় সেই হারৎসের শৈলমালা! কার্পাথিয়ানে যুদ্ধ হচ্ছিল, সেখানে কিন্তু আমি যেতে চাইনি—তা সে যতই ভাল জায়গা হোক না কেন। যুদ্ধ না থাকলে স্পেনে যেতাম।

সূর্য ক্রমশ হেলে পড়ছে দিগন্তরেখায়। ঠান্ডা হয়ে আসছে চারপাশ। খাওয়ার পর ক্যাথারিনের কাছে যাব। ও যদি এখন কাছে থাকত! ওকে নিয়ে যদি মিলানে যেতে পারতাম!... দিবাস্বপ্নের জাল বুনছি—কোভাতে খাওয়া সেরে মিলানের পথ বেয়ে যেন হাঁটছি, হেঁটে চলেছি ভিয়া মানত সোনি দিয়ে। তারপর খাল পার হয়ে আবার তারই ধার দিয়ে হাঁটছি। গ্রীষ্মের আসন্ন সন্ধ্যা—পাশে ক্যাথারিন বাক্‌লে। সে-ও হয়তো আমাকে তার মৃত প্রেমিকের আসনে বসিয়েছে। আমি আর ক্যাথারিন...হোটেলের সামনে এসে গেছি। ক্যাথারিন দাঁড়িয়েছে হোটেলের লিফ্‌টের সামনে। দারোয়ানের কাছ থেকে ঘরের চাবি এনে লিফ্‌টে চড়ে ওপরে উঠি দু'জনে। প্রত্যেক তলায় লিফ্‌ট দাঁড়ায়। শেষে যে-তলায় দাঁড়ায় সেখানে নামব। ছেলেটি সেলাম করে দরজা খুলে দিচ্ছে। আগে ক্যাথারিন, তারপর আমি লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে চলি। হল পেরিয়ে ঘরের সামনে এসে দরজার চাবি ঘোরাই। ঘরে ঢুকে হোটেল-মালিককে ফোন করি—এক বোতল কাপ্রি চাই। হোটেল-পরিচারকের পায়ের শব্দ শোনা যায়। তার সঙ্গে মৃদু ছন্দে ঝঙ্কার তোলে রুপোর পাত্রে বরফের টুকরোগুলো, মাঝখানে কাপ্রির বোতল। পরিচারকের ঘরে ঢোকার হুকুম নেই, হুকুম নেই আমাদের দরজা খোলার। আমার নির্দেশে দরজার বাইরে রেখে গেল সুরার সরঞ্জাম।

...খোলা জানলার ওধারে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যায় সোয়ালো পাখিরা। জানলার ওপর দিয়ে সারা বাড়িটাকে পাক দিচ্ছে একঝাঁক ছোট্ট বাদুড়। গ্রীষ্মের উষ্ণ সন্ধ্যা উপভোগ করছি আমি—আমি আর ক্যাথারিন, পাশে রয়েছে কাপ্রির পাত্র। সারা রাত আমরা দু'জন পাশাপাশি—আমি আর ক্যাথারিন। আর কেউ নয়, কিচ্ছু নয়, মাঝে কোনও ব্যবধান নেই। পাতলা চাদরের নীচে শুধু আমরা দু'জন, বাইরে মিলানের উষ্ণ রাত...। এমন যদি হত—এমনটাই হওয়া উচিত! ঠিক করলাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ক্যাথারিনের কাছে যাব।

রাত্তিরে খাওয়ার সময় জোর আলোচনা চলল, সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে মদ্যপানও একটু বেশিই হয়ে গেল। পাদ্রি আয়ারল্যান্ডের আর্কবিশপের কথা বলছে, যে-বিষয়ে কিছুই জানা নেই আমার। আর্কবিশপের মতো মহান মানুষ, তাঁর ওপর কী অবিচারই না হয়েছে! আর সে ব্যাপারে আমেরিকান হিসেবে আমারও নাকি

অংশ আছে! কে জানে, আছে হয়তো। তবু জানার ভান করে চলেছি—কথার খেলা করে নিজেকে বাঁচাচ্ছি। আলোচনাটা প্রায় একতরফাই চলছে। পাদ্রি মানুষটা ভাল, কিন্তু একেবারে নির্বোধ! অফিসাররা ভাল মানুষ নয়, কিন্তু বোকা। রাজা মানুষ ভাল, কিন্তু একেবারে বুদ্ধিহীন। মদটা অবশ্য খারাপ হলেও নিস্তেজ নয়, তবে তাতে দাঁতের চটা উঠে যায়। নৈশভোজটা বেশ জমে উঠেছে!

রোক্কা বলছে,

"সেই পাদ্রিটাকে আটক করে রেখেছিল, কারণ তাঁর কাছে শতকরা পাঁচ লিরে সুদের বন্ডের কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। ফ্রান্স বলেই হয়েছে, এখানে হলে ওঁকে গ্রেপ্তার করত না। উনিও বন্ডের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। ঘটনাটা ঘটেছিল বেজিয়ার্সে, আমি তখন সেখানেই ছিলুম, কাগজে ব্যাপারটা পড়েছিলুম। পাদ্রিটির সঙ্গে দেখা করার জন্য জেলেও গিয়েছিলুম। বোঝাই গেছলো বন্ডগুলো তিনি চুরিই করেছিলেন।"

রিনাল্‌দি বলল, "তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।"

"সে তোমার মর্জি।" রোক্কা বলল, "ব্যাপারটা আমি আমাদের এখানকার পাদ্রিটির জন্যে বলছি। ব্যাপারটা ওর জানা দরকার। তা ছাড়া ও নিজে পাদ্রি—বিষয়টা বুঝবে ভাল।"

পাদ্রি সামান্য হেসে বলল,

"বলে যাও, আমি শুনছি।"

"কতকগুলো বন্ডের অবশ্য কোনও হিসেব ছিল না, তবে তিন পার্সেন্টের সবক'টা বন্ডই তাঁর কাছে পাওয়া গেছলো। সেইসঙ্গে আরও কিছু স্থানীয় কাগজপত্র ছিল ওঁর কাছে—ঠিক কী কী ছিল ভুলে গেছি। কাণ্ডটা দেখতে জেলখানায় গেলুম। এইবার হল গল্পের আসল ব্যাপার। পাদ্রির ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তির সুরে বললুম—'হে পিতা, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন, কারণ আপনি পাপ করিয়াছেন'।"

ওর হাবভাব দেখে সকলে হেসে অস্থির।

পাদ্রি বলল,

"উত্তরে তিনি কী বললেন?"

সে-কথায় কান না দিয়ে আমাকে তার রসিকতার অর্থ বোঝাতে শুরু করল রোক্কা। ঠিকমতো বুঝতে পারলে এ যেন একটা দারুণ রসিকতা। এইসব বোঝাতে বোঝাতে ওরা আরও মদ ঢেলে দিল আমার গ্লাসে। আমিও স্নানরত ব্রিটিশ সৈনিকটিকে নিয়ে হাসির গল্প শোনালাম ওদের। তারপর মেজর আর একটা গল্প বললেন। এইভাবে গল্পের মোড় ক্রমশ কোন্ দিকে ঘুরছে আঁচ করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাদ্রি।

এইসময় মেজর বললেন, তিনি শুনেছেন আমি নাকি খুব ওস্তাদ মদ্যপায়ী। আমি কথাটা অস্বীকার করলাম। মেজর সেটা বিশ্বাস করলেন না, সুরার দেবতা ব্যাক্কাসের নামে শপথ করে বললেন ওরা আমার ক্ষমতা যাচাই করে দেখবে। আমি বললাম, ব্যাক্কাসের নামে নয়। ওরা বলল, হ্যাঁ, ব্যাক্কাসের নামেই। বাস্‌সি ফিলিপো ভিসেন্তসার সঙ্গে মদ্যপানের প্রতিযোগিতা করতে হবে আমাকে। বাস্‌সি আপত্তি জানাল—সে নাকি ইতিমধ্যেই আমার দ্বিগুণ পান করে ফেলেছে। আমি বললাম, ডাহা মিথ্যে কথা বলছে ও। ব্যাক্কাসই হোক আর যাই হোক—ওই ও—ওই ফিলিপো ভিসেন্তসা বাস্‌সি না বাস্‌সি ফিলিপো ভিসেন্তসা—সন্ধে থেকে ও এক ফোঁটাও মদ খায়নি। বাস্‌সি চটে গিয়ে জানতে চাইল আমার কী নাম—ফ্রেডেরিকো এনরিকো নাকি এনরিকো ফ্রেডেরিকো! আমি বললুম, ব্যাক্কাসকে বাদ দিয়ে যে হয় জিতুক। আমাদের পাত্রে লাল সুরা ঢেলে দিলেন মেজর। অর্ধেকটা খেয়ে মনে পড়ল আমাকে কোথায় যেন যেতে হবে। কাজেই বললাম,

"বাস্‌সিই জিতেছে। ও আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। তা ছাড়া আমায় এক জায়গায় যেতে হবে।"

রিনাল্‌দি সায় দিল,

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যিই ওকে যেতে হবে। ওদের ব্যাপার আমি জানি।"

"আচ্ছা, চলি তাহলে।" বলে উঠে দাঁড়ালাম।

"বেশ, আরেকদিন হবে'খন"—বাস্‌সি আমার কাঁধ চাপড়ে দিল।

টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে, অফিসাররাও ঝলমল করছে ফুর্তিতে। ওদের শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। রিনাল্‌দিও আমার সঙ্গে বাইরে এল। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রিনাল্‌দি বলল,

"এমন মাতাল অবস্থায় আজ নাই-বা গেলে!"

"না রিনিন, নেশা আমার হয়নি।"

"তাহলে বরং একটু শুকনো কফি চিবিয়ে নাও।"

"কী যে বলো!"

"নিয়ে আসছি, দাঁড়াও।"

এক মুঠো কফির দানা-ভাজা নিয়ে এল ও।

"নাও, চিবিয়ে ফেলো—ঈশ্বর তোমার সহায় থাকবেন।"

"না, ব্যাক্কাস থাকবেন।"

"চলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না না, আমি ঠিক আছি।"

তবু রিনাল্‌দি চলল আমার সঙ্গে। কফি চিবোতে চিবোতে শহরের রাস্তা ধরে

হাঁটতে লাগলাম আমরা। ইংরেজদের ভিলার সামনে এসে রিনাল্‌দি শুভরাত্রি জানাল। আমি বললাম,

"তুমিও এসো না!"

রিনাল্‌দি বলল,

"না হে, আমার সোজা রাস্তায় ফুর্তিই ভাল।"

"কফির জন্যে ধন্যবাদ।"

"আরে ও কিছু নয়।"

আমি এগিয়ে গেলাম। দু'সারি সাইপ্রেস গাছের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। রিনাল্‌দি তখনও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হাত নেড়ে আবার বিদায় জানালাম ওকে।

ভিলার হলে বসে রইলাম ক্যাথারিনের আসার অপেক্ষায়। কে-যেন আসছে ওপাশের হলঘর দিয়ে। উঠে দাঁড়ালাম। না, ক্যাথারিন নয়—হেলেন ফার্গুসন।

"এই যে," ফার্গুসন বলল, "ক্যাথারিন বলে পাঠাল ও অত্যন্ত দুঃখিত, আজ আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।"

"বড় দুঃখিত হলাম। শরীর খারাপ নাকি?"

"তেমন ভালও নয়।"

"ওকে বলে দেবেন—আমি খুব দুঃখিত হয়েছি।"

"বলব।"

"কাল দেখা করার চেষ্টা করলে লাভ হবে কি? আপনি কী বলেন?"

"তা হতেও পারে!"

"অনেক ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।"

বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ সব কেমন যেন ফাঁকা মনে হল—মনে হল বড় একা আমি। ক্যাথারিনের সঙ্গে দেখা করতে আসাটাকে খুব হাল্কা ভাবেই নিয়েছিলাম। বেশ নেশাও হয়ে গেছে। মদ খেতে গিয়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এখানে আসার কথা। কিন্তু এখন ওকে দেখতে না পেয়ে মনে হচ্ছে সব যেন শূন্য হয়ে গেল। একটা অন্তহীন একাকিত্বের অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মনটা।

পরদিন সকালে খবর পেলাম—রাত্রে নদীর ওপারে আক্রমণ করা হবে। চারটে গাড়ি নিয়ে আমাদের যেতে হবে সেখানে। এ-ব্যাপারে কেউই কিছু জানে না, অথচ সবাই সবজান্তার মতো গুরুগম্ভীর আলোচনা করে চলেছে।

আমি সামনের গাড়িটাতে। ব্রিটিশ হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়

ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বললাম। পিছনের গাড়িগুলোও দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে পিছনের চালকদের এগিয়ে যেতে বললাম। বলে দিলাম—যদি আমরা গিয়ে না পড়ি, তবে তারা যেন করমোনসের মোড়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। গাড়ি তিনটে এগিয়ে গেল। আমি চটপট ভিতরে গিয়ে মিস বার্কলেকে খবর দিতে বললাম। ওরা জানাল সে ডিউটিতে আছে। আমি এক মিনিটের জন্য দেখা করার অনুমতি চাইলাম। আর্দালিকে দিয়ে খবর পাঠাল ওরা—তার সঙ্গেই এল ক্যাথারিন।

"কেমন আছ জানার জন্যে মাঝপথে নেমে পড়েছি। ওরা বলল তুমি কাজ করছ, তাই একবার দেখা করতে চাইলাম।" বললাম আমি।

"আজ ভালই আছি। কাল বোধ হয় গরমে কাবু হয়ে পড়েছিলাম।" ও বলল।

"এবার আমাকে যেতে হবে।"

"আমিও একটু দরজার বাইরে যাই চলো।"

"ভাল আছ তো?" বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ভালই আছি। রাত্তিরে আসছ তো?"

"না, আমরা চলে যাচ্ছি। প্লাভার ওপরে আজ রাতে একটা প্রহসন আছে।"

"প্রহসন?"

"তার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করি না।"

"কবে ফিরবে?"

"কাল।"

গলা থেকে কী-একটা খুলছিল, সেটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল,

"সেন্ট অ্যান্টনি—এটা রেখে দাও। আর কাল রাতে আমার কাছে এসো।"

"সেন্ট অ্যান্টনি মানো—তুমি কি ক্যাথলিক?"

"না। কিন্তু ওরা বলে সেন্ট অ্যান্টনি খুব পয়মন্ত।"

"বেশ, তোমার জন্যে তাঁকে যত্ন করে রাখব। বিদায়।"

"না, বিদায় বলতে নেই।"

"বেশ, বলব না।"

"লক্ষ্মী হয়ে থেকো আর সাবধানে থেকো। না না, এখানে দাঁড়িয়ে আদর করা চলবে না।"

"আচ্ছা।"

যেতে যেতে ফিরে তাকালাম। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ও। হাত নাড়ল। আমার হাতটা ঠোঁটে ছুঁইয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম, ও আবার হাত নাড়ল। রাস্তার শেষে এসে গাড়ির পাদানি বেয়ে উঠে বসলাম, অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে দিল।

ছোট্ট একটা সাদা মাদুলির মধ্যে সেন্ট অ্যান্টনি রয়েছে। মাদুলিটা খুলে হাতের ওপর ঢাললাম।

"সেন্ট অ্যান্টনি?" ড্রাইভার জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।"

"আমারও একটা আছে।"

স্টিয়ারিং থেকে ডান হাতটা সরিয়ে জামার বোতাম খুলে ভেতর থেকে টেনে বার করল।

"দেখেছেন?"

আমার সেন্ট অ্যান্টনিকে আবার মাদুলিতে পুরে, সরু হারটা জড়ো করে পকেটে রাখলাম।

ড্রাইভার বলল, "পরবেন না?"

"না।"

"পরাই কিন্তু ভাল, এগুলো পরার জন্যেই তৈরি।"

"বেশ, তাহলে পরাই যাক।"

সোনার হারের টিপকল খুলে গলায় পরে নিলাম। উর্দির ওপর সেন্ট অ্যান্টনি দুলতে লাগল। জামার বোতাম খুলে শার্টের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম সেটা। গাড়ির দোলায় মাদুলিটা আমার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেন্ট অ্যান্টনির অস্তিত্ব জানান দিতে লাগল। তারপর মাদুলিটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। জখম হওয়ার পর আর সেটা দেখতে পাইনি। শুশ্রূষা-কেন্দ্রে কেউ বোধহয় নিয়ে নিয়েছিল।

সেতুর ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। খানিক পরেই সামনের গাড়িগুলোর ধুলো চোখে পড়ল। রাস্তাটা মোড় ঘুরেছে, সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তিনখানা গাড়ি—ছোট্ট দেখাচ্ছে, গাড়ির চাকায়-ওড়া বিপুল ধুলো গাছের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। গাড়ি তিনটেকে পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা, তারপর ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের রাস্তা ধরলাম। সার বেঁধে যেতে ভালই লাগে, যদি সারির সামনে থাকা যায়। সিটের পেছনে ঠেস দিয়ে চারপাশ দেখতে দেখতে চলেছি। নদীর কাছে পাহাড়ের নীচে পৌঁছলাম। ওপরের রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে দেখা গেল—পিছনের দীর্ঘ পাহাড়সারি উত্তরদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার শিখরে শিখরে জমে আছে তুষার। পিছনে তাকালাম। গাড়ি তিনটে উঠে আসছে পিছনে পিছনে, মাঝখানে ধুলোর ব্যবধান। দীর্ঘ একসারি খচ্চর চলেছে, পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলেছে চালকরা, লাল ফেজ টুপি তাদের মাথায়।

তাদের পাশ কাটিয়ে পাহাড়গুলোর ভেতর দিয়ে ফাঁকা রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠলাম। তারপর অন্য একটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলাম একেবারে নদীর উপত্যকায়।

পথের ধারে গাছের সারি, ডান দিকে গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে নদী—অগভীর স্বচ্ছ জলধারা তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। নদীর বুক জুড়ে প্রচুর বালি আর নুড়ি, তার মধ্যে দিয়েই ছুটে চলেছে নদী, কোথাও বা ছড়িয়ে পড়ে চকচক করছে বালি আর নুড়ির বুকের ওপর। পাড়ের কাছে কোথাও কোথাও জল গভীর, আকাশের মতো নীল রঙ। রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই নদীর ওপরকার সেতুর খিলানগুলো চোখে পড়ল। পথের দু'ধারে কিছু খামারবাড়ি। দক্ষিণের উঁচু দেওয়ালের গা ঘেঁষে উঠেছে নানান গাছ, খেতের দিকের পাথরের দেওয়ালটা নিচু। রাস্তাটা অনেকটা পর্যন্ত উপত্যকার মাঝ দিয়ে গেছে, তার পরেই আবার শুরু হয়েছে পাহাড়ে ওঠা।

আখরোট বনের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে খাড়া উঠে গেছে রাস্তাটা, তার পরে আবার একটা পাহাড়ের ওপরে সমতল হয়ে গেছে। ওপর থেকে বনের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে বহুদূর দেখা যায়—দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনীকে আলাদা করে রেখেছে যে-নদীটা তার সরু ধারা, তার ওপরে উজ্জ্বল সূর্য। পাহাড়ের শেষে নতুন অসমান সামরিক রাস্তাটা দিয়ে এগোচ্ছি। উত্তরদিকে দুটো পাহাড়সারি, তাদের ঘন সবুজ অবয়ব আর মাথার ওপরে জমাট তুষার—সূর্যকিরণে অপরূপ দেখাচ্ছে। রাস্তাটা যেখানে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠেছে, সেখান থেকে চোখে পড়ল তৃতীয় একটা পাহাড়সারি—তার তুষার-ঢাকা চূড়াটা আরও উঁচু—খড়ির মতো সাদা। তার ওপরে আরও পাহাড়সারি। অনেক দূরে আবছা হয়ে আছে—সন্দেহ হচ্ছে সত্যি কিনা! এ সবই অস্ট্রিয়ানদের দখলে, আমাদের হাতে এমন একটাও নেই। সামনের রাস্তাটা গোল হয়ে ঘুরে গেছে ডানদিকে। সেখান থেকে চোখে পড়ছে গাছের ফাঁক দিয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। রাস্তার ওপরে রয়েছে সৈন্যদল, মোটর ট্রাক আর খচ্চরের পিঠে চাপানো পাহাড়ি বন্দুক।

রাস্তার ধার দিয়ে নামতে নামতে অনেক নীচে নদীটা দেখা গেল, তার সমান্তরালে টানা রেললাইন। আরও দূরে একটা পুরনো সেতু, তার ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে রেললাইনটা চলে গেছে আর একটা পাহাড়ের নীচে দিয়ে—যেখানে চোখে পড়ছে ছোট্ট একটা শহরের ভাঙা বাড়িঘর। এই শহরটাই দখল করতে হবে আমাদের।

নীচে নামতে নামতে সন্ধে হয়ে এল। বড় রাস্তার দিকে পা বাড়ালাম—নদীর ধার দিয়ে সোজা চলে গেছে রাস্তাটা।

রাস্তায় প্রচুর লোকজন। বোনা পাটির বেড়া আর খড় দিয়ে রাস্তার দু'ধার ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওপরটাও পাটি দিয়ে ঢাকা, যেন কোনও গ্রামের কিংবা সার্কাসের প্রবেশপথ। বেড়া-ঢাকা সুড়ঙ্গ দিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছলাম।

আগে এখানেই রেল-স্টেশনটা ছিল। রাস্তা এখানে নদীর পাড় থেকে বেশ নীচে, সেই নিচু রাস্তার ধারে ধারে গর্ত করে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নদীর পাড় ধরে যেতে যেতে ওপর দিকে তাকাতে চোখে পড়ল পাহাড়ের ওপরে অস্ট্রিয়ানদের নজরদার বেলুন—পড়ন্ত সূর্যের সামনে কালো দেখাচ্ছে। একটা ইটখোলার পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। ইটখোলার চুল্লি এবং আরও কয়েকটা গর্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে শুশ্রূষা-কেন্দ্র বানানো হয়েছে। ওখানকার তিনজন ডাক্তারকে চিনতাম আমি। মেজরের কাছ থেকে আক্রমণের সময়টা জেনে নিলাম। শুনলাম আহতদের গাড়িতে চাপিয়ে বেড়া-ঢাকা রাস্তা পেরিয়ে, বড় রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের ধার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। সেখানে একটা ঘাঁটিতে আহতদের সরিয়ে নেওয়ার জন্যে গাড়ির বন্দোবস্ত থাকবে। মেজর আশা করছেন রাস্তাটা নিরাপদ থাকবে। এই একটা রাস্তাই তো সম্বল। নদীর ওধারে অস্ট্রিয়ানদের ঘাঁটি থেকে সম্পূর্ণ চোখে পড়ে বলে রাস্তাটা বেড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে, এই ইটখোলায়, নদীর উঁচু পাড়টা আমাদের আড়াল করে রেখেছে শত্রুর রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি থেকে।

নদীর ওপারে একটা ভাঙা সেতু, ওরা সেখানে একটা নতুন সেতু বানানোর ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যেতে ওপারে যে-সব সৈন্যরা ছিল, তাদেরকে মোড় ঘুরে নদীর অগভীর অংশটা দিয়ে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

মেজরটির ছোটখাটো চেহারা, ওপরদিকে তোলা গোঁফ, জামায় লিবিয়ার যুদ্ধে পাওয়া দুটি সম্মান-চিহ্ন। আমাকে বললেন—অবস্থা ভাল থাকলে আমারও মেডেলের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি বললাম—আশা করি অবস্থা ভালই থাকবে, তবে আমার জন্যে এত পরিশ্রম তাঁর অতিরিক্ত করুণারই নিদর্শন।

আমার ড্রাইভারদের থাকার জন্যে কোনও বড় গর্ত আছে কিনা জানতে চাওয়ায় মেজর আমার সঙ্গে একজন সৈনিককে দিলেন গর্ত দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। বেশ পছন্দসই একটা গর্ত পাওয়া গেল। ড্রাইভাররাও খুব খুশি। তাদের সেখানে রেখে আমি আবার ফিরে এলাম। অন্য দু'জন অফিসারও সেখানে হাজির। মেজারের নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে বসে রাম খেলাম, খাতির বেশ জমে উঠল। বাইরে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলেই আক্রমণ শুরু হবে। ড্রাইভারদের কাছে ফিরে গেলাম, গর্তে বসে কথাবার্তা বলছিল ওরা, আমাকে দেখে চুপ করে গেল। ওদের প্রত্যেককে এক প্যাকেট করে ম্যাসিডোনিয়া সিগারেট দিলাম। আলগা করে পাকানো, ভেতরের তামাকটা ঝরে যেতে চায়, সেই জন্যে ঠোঁটে গোঁজার আগে গোড়াটা দুমড়ে বন্ধ করে নিতে হয়। মানেরা একটা সিগারেট ধরিয়ে

জ্বালানিটা অন্যদের হাতে দিয়ে দিল। জ্বালানিটা দেখতে ঠিক ফিয়াট গাড়ির রেডিয়েটারের মতো।

যা-কিছু শুনে এসেছি সব বললাম। পাসিনি বলল,

"আসার সময় ঘাঁটি তো দেখতে পেলুম না!"

"আমরা যে-জায়গাটায় মোড় ঘুরেছিলুম, ঘাঁটিটা তার একটু ওপাশে আছে।"

"রাস্তাটায় একটা মারাত্মক কাণ্ড হবে।" মানেরা বলল, "ওরা গোলা দেগে একেবারে নরক বানিয়ে ছাড়বে।"

"হতেই পারে।"

"খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে, লেফটেন্যান্ট? আক্রমণ শুরু হয়ে গেলে কিন্তু আর খাওয়ার ফুরসত মিলবে না।"

"গিয়ে দেখছি কী ব্যবস্থা করা যায়।" আমি বললাম।

"আমরা কি এখানেই থাকব, না একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে পারি?"

"এখানে থাকাই ভাল।"

আবার মেজরের ট্রেঞ্চে গেলাম। মেজর জানালেন, রান্নার ব্যবস্থা পেছনে আসছে। এসে পড়লেই ড্রাইভারদের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। সঙ্গে বাসনপত্র না থাকলে তা-ও তিনি জোগাড় করে দেবেন। আমি বললাম, বাসনপত্র বোধ হয় ওদের সঙ্গেই আছে। ফিরে গিয়ে ড্রাইভারদের খবর দিলাম, খাবার এসে গেলেই ওরা খেতে পাবে। মানেরা বলল, "বোমাবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার আগে এসে পৌঁছলে হয়।"

যতক্ষণ আমি রইলাম, ওরা চুপ করে বসে রইল। ওরা সবাই মিস্ত্রি, যুদ্ধকে ওরা ঘৃণা করে।

গাড়িগুলো আর বাইরের অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে আবার গর্তে এসে বসলাম ওদের সঙ্গে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছি সবাই। বাইরে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, ট্রেঞ্চের মেঝেটা বেশ গরম আর শুকনো। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আয়েশ করে বসলাম। গাভুৎসি বলল,

"কারা আক্রমণ চালাবে?"

"বার্সিগ্‌লিয়ারি-দল?"

"বার্সিগ্‌লিয়ারি-দলের সবাই?"

"সে-রকমই মনে হচ্ছে।"

"সত্যিকারের আক্রমণের মতন যথেষ্ট সৈন্য তো এখানে নেই!"

"মনে হচ্ছে আসল আক্রমণ থেকে শত্রুদের দৃষ্টি অন্য দিকে আকর্ষণ করার জন্যেই এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে।"

"যারা আক্রমণ করবে তারা সেটা জানে?"

"মনে তো হয় না।"

"নিশ্চয়ই জানে না।" মানেরা বলল, "জানলে ওরা আক্রমণ করবেই না।"

পাসিনি বলল, "উঁহুঁ, জানলেও করবে—বার্সিগ্‌লিয়ারি-দলের সবক'টাই তো বুদ্ধু।"

আমি বললাম, "ওরা কিন্তু সাহসী আর নিয়মনিষ্ঠ।"

"ছাতির মাপে ওরা বড়, স্বাস্থ্যবানও বটে, তবু ওরা বুদ্ধু।"

"ওরা বেশ লম্বাও বটে!" মানেরার রসিকতায় হেসে উঠল সকলে।

"ওরা যখন আক্রমণ করতে অস্বীকার করেছিল, আর সেই জন্যে প্রতি দশম লোকটাকে গুলি করে মারা হয়েছিল, তখন আপনি ছিলেন নাকি, তেনেন্তে?"

"না।"

"সত্যিই ওরা পরে সবাইকে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে, প্রতি দশ নম্বর লোকটাকে বেছে নিয়েছিল। কারাবিনিয়েরি-দল গুলি করেছিল ওদের।"

কারাবিনিয়েরির নাম শুনে মেঝেতে থুতু ফেলল পাসিনি। তারপর বলল,

"কিন্তু ছ' ফুট লম্বা ওই গ্রেনেডিয়ারগুলো কিছুতেই আক্রমণ করতে রাজি হয়নি।"

মানেরা বলল, "কেউ আক্রমণ না করলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যেত।"

"গ্রানাতিয়েরিদের ব্যাপারটা কিন্তু আসলে তা ছিল না। ওরা ভয় পেয়েছিল। ওদের সব অফিসাররাই বড় বড় ঘরের ছেলে।"

"দু'জন অফিসার এগোতে চায়নি—তারা একজন সার্জেন্টের গুলিতে মরল।"

"কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে গিয়েছিল।"

"তাদেরকে পরে গুলি করে মারার জন্যে সারিতে দাঁড় করানো হয়নি।"

"আমার শহরের একটা ছেলে ওই কারাবিনিয়েরিদের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল।" পাসিনি বলল, "গ্রানাতিয়েরি-দলে যোগ দেওয়ার পক্ষে একটু বেশিই সুন্দর দেখতে ছিল ছেলেটা। লম্বা, বিশালদেহী আর সপ্রতিভ—রোমেই থাকত বেশির ভাগ সময়, মেয়েদের সঙ্গে আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ করে সময় কাটাত। এখন তাদের বাড়ির সামনে সারাক্ষণ সঙ্গিনধারী পাহারা—ওর বাবা, মা, বোনেদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে পারে না। ওর বাবার নাগরিক অধিকার, ভোট দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হতভাগ্যদের রক্ষা করার কোনও আইন নেই। যে খুশি ওদের বিষয়-সম্পত্তি কব্জা করে নিতে পারে!"

"ওর পরিবারকে ওই ভাবে অত্যাচার না করলে অন্যরা আক্রমণ করতে রাজি হত না।"

"না, আলপিনি-দল আক্রমণ করত, ভি-ই সৈন্যদল করত, কিছু কিছু বার্সিগ্‌লিয়ারিরাও করত।"

"বার্সিগ্‌লিয়ারি-দলও তো একবার পালিয়েছিল। এখন অবশ্য সেটা ওরা ভোলার চেষ্টা করছে।"

পাসিনি ব্যঙ্গের সুরে বলল, "আমাদের এমনি ভাবে কথা বলতে দেওয়া কিন্তু আপনার উচিত হচ্ছে না, তেনেন্তে।"

"তোমরা কেমন কথাবার্তা বলো আমার জানা আছে।" আমি বললাম, "কিন্তু গাড়িটা যতক্ষণ ঠিকভাবে চালাবে আর আমার কথা মেনে চলবে—"

"—আর অন্য অফিসারদের কান বাঁচিয়ে কথাগুলো বলবে।" আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফুট কাটল মানেরা।

আমি বললাম, "আমার মতে—যুদ্ধটাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে। একপক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করলেই কিন্তু যুদ্ধ থামবে না। আমরা যুদ্ধ বন্ধ করলে অবস্থা বরং আরও খারাপ হয়ে উঠবে।"

গম্ভীর গলায় পাসিনি বলল,

"যুদ্ধের চেয়ে খারাপ আর কী আছে?"

"পরাজয় আরও খারাপ।"

পাসিনি তখনও শ্রদ্ধার সুরেই বলল,

"আমার তা মনে হয় না। হেরে গেলে আর কী-ই হবে? বাড়ি চলে যাব!"

"শত্রু তোমার পেছনে ধাওয়া করে আসবে, তোমার বাড়ি দখল করবে, তোমার বোনেদের টেনে নিয়ে যাবে।"

পাসিনি বলল, "সেটাও আমি বিশ্বাস করি না। সকলের ওপরে এ-রকম অত্যাচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকে নিজের ঘর সামলাক, নিজের বোনেদের ঘরে রাখুক।"

"ওরা তোমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে, কিংবা আবার তোমায় সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করবে। তখন আর অ্যাম্বুল্যান্সে নয়, পদাতিক বাহিনীতে।"

মানেরা বলল, "সকলকে তো আর ফাঁসি দিতে পারবে না। একটা বিদেশি জাত এসে কীভাবে আমাদের দিয়ে নিজের সৈন্যদল বানাবে? প্রথম যুদ্ধেই তো আমরা সবাই পালাব।"

"পরাজয় যে কী জিনিস সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই তোমাদের, তাই ভাবছ—এ আর এমন কী খারাপ!" আমি বললাম।

পাসিনি বলল, "তেনেন্তে, আপনি বলতে দিচ্ছেন বলেই বলছি—দেখুন, এই যুদ্ধের চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। আমরা অ্যাম্বুল্যান্স বাহিনীতে আছি বলে এ-যুদ্ধ কতটা খারাপ সেটা বুঝতে পারি না। আর মানুষ যখন এর ক্ষতির পরিমাণটা বুঝতে পারে, তখন তাদের যুদ্ধ থামানোর আর উপায় থাকে না। কারণ সবাই তখন উন্মত্তের মতো মেতে ওঠে। কিছু লোক কোনওদিনই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা

বুঝতে পারে না, আবার অন্য কিছু লোক যুদ্ধ করে স্রেফ তাদের অফিসারের ভয়ে। আর এই সব লোকেদের দিয়েই যুদ্ধ চালানো হয়।”

“আমি জানি যুদ্ধ খুবই খারাপ জিনিস, তবু আমাদের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতেই হবে।”

“এ কখনও শেষ হয় না—যুদ্ধের শেষ বলে কিছু নেই।”

“নিশ্চয়ই আছে।”

পাসিনি ঘাড় নাড়ল,

“জয় মানেই কিন্তু যুদ্ধে জেতা নয়। আজ যদি আমরা সান গাব্রিয়েলে দখল করি, কী হবে তাতে? কী হবে কার্সো, মনফালকোনে বা ত্রিস্তে জয় করে? কী হবে বলুন? আসার সময় দূরের যে-পাহাড়গুলো দেখেছিলেন, আপনি কি মনে করেন সেগুলো সব আমরা দখল করে নিতে পারব? অস্ট্রিয়ানরাও যদি যুদ্ধ বন্ধ করত! কোনও-একটা পক্ষকে তো বন্ধ করতেই হবে, তা সেটা আমাদের পক্ষ থেকেই হোক না! ওরা ইতালিতে এলেও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাবে। ওদেরও তো নিজেদের দেশ আছে, ঘর-সংসার আছে।”

“তুমি তো দারুণ বক্তা, হে!”

“আমরা চিন্তাভাবনা করি, পড়াশোনা করি। আমরা চাষি নই, মিস্ত্রি। তবে চাষিরাও যুদ্ধের ওপর ভরসা করার মতন বোকা নয়। এই যুদ্ধকে সকলেই ঘৃণা করে।”

“যে-দেশের লোকেরা মূর্খ, কিছুই বোঝে না, তাদের যেমন খুশি চালিয়ে নেওয়ার জন্যে এক শ্রেণির লোক সব সময়েই থাকে। সেই জন্যেই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে।”

“যুদ্ধ বাধিয়ে লোকেরা তা থেকে রোজগারও তো করে।”

“তাদের বেশির ভাগই তেমন কিছু টাকা পায় না।” পাসিনি বলল, “তারা যুদ্ধে যোগ দেয় নিছক বোকামির জন্যে।”

মানেরা বলল, “এবার চুপ করা যাক। আমরা বড্ড বেশি বকি, তেনেন্তের পক্ষেও সেটা বেশি।”

পাসিনি বলল, “উনি পছন্দ করেন বলেই বলি। আমরা ওঁকে আমাদের দলের করে নেব।”

মানেরা বলল, “কিন্তু এখন আমরা মুখ বন্ধ করব।”

গাভুৎসি বলল,

“এবার খাবার ব্যাপারটা দেখলে হয় না, তেনেন্তে?”

“আমি দেখছি গিয়ে।” বললাম আমি।

গর্দিনিও উঠে বাইরে এল আমার সঙ্গে। চারজনের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে কম কথা বলে। আমার কোনও কাজে লাগতে পারে কি না.জানতে চাইল ও। বললাম,

"ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে আসতে পারো। গিয়ে দেখি চলো।"

বাইরে নিকষ অন্ধকার। সার্চলাইটের দীর্ঘ রশ্মি পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে আলো ফেলছে।

ইটখোলা পার হয়ে প্রধান শুশ্রূষা-কেন্দ্রের সামনে এসে পৌঁছলাম। প্রবেশ পথের সামনে সবুজ ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা ছাউনি, অন্ধকারে হাওয়ার দোলায় তার শুকনো পাতায় ঝিরিঝিরি শব্দ উঠছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। টেলিফোনের সামনে একটা বাক্সের ওপর বসে আছেন মেজর। একজন ক্যাপ্টেন ডাক্তার জানালেন, আক্রমণের সময়টা এক ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক গ্লাস কগনাক পান করার নিমন্ত্রণ জানালেন তিনি।

টেবিলের ওপর যন্ত্রপাতি, হাত ধোওয়ার গামলা আর ছিপি-আঁটা বোতলগুলো আলোয় ঝকঝক করছে। গর্দিনি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। মেজর টেলিফোন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এক্ষুনি শুরু হচ্ছে। আবার আগের সময়টাই স্থির হল।"

বাইরের অন্ধকারে আমাদের পিছনের পাহাড়ের ওপর অস্ট্রিয়ান সার্চলাইটের আলো ঘুরছে। একমুহূর্ত গভীর নিস্তব্ধতা, তারপরই আমাদের পিছনের সমস্ত কামান থেকে একসঙ্গে শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ।

"শুরু হয়ে গেল!" মেজর বললেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "সুপের কী হল, মেজর?"

কথাটা তিনি শুনতে পেলেন না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

"এখনও এসে পৌঁছয়নি।" উত্তর দিলেন মেজর।

একটা বিরাট গোলা এসে বাইরে ইটখোলার ওপর ফেটে পড়ল, পরক্ষণেই আর একটা, আর সেই তীব্র শব্দের মধ্যেই শোনা গেল একটা হালকা শব্দ—ভাঙা ইট আর ধুলোবালি ঝরে পড়ছে।

"খাবার কী আছে?"

"ম্যাকারোনি আছে কিছুটা।"

"যা দেবেন, তা-ই নেব।"

মেজর একজন আর্দালিকে বলতেই পিছনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। খানিক পরে একটা ধাতুর পাত্রে খানিকটা ঠান্ডা রান্না-করা ম্যাকারোনি নিয়ে এল। আমি সেটা গর্দিনির হাতে দিলাম।

"চিজ আছে নাকি?" জিজ্ঞেস করলাম মেজরকে। একটু বিরক্ত হয়েই আর্দালিকে হুকুম দিলেন মেজর। সে আবার পিছন দিকের গর্তটায় ঢুকে সিকি টুকরো সাদা চিজ নিয়ে এল।

"অসংখ্য ধন্যবাদ।" আমি বললাম।

"তুমি বরং এখন বাইরে বেরিয়ো না।"

প্রবেশপথে ভারী একটা কিছু রাখার শব্দ হল। যে-দু'জন বয়ে এনেছে তাদের একজন ভেতরে উঁকি দিল।

"ভেতরে আনছ না কেন?" খিঁচিয়ে উঠলেন মেজর, "মতলবটা কী—আমাদের বাইরে গিয়ে বয়ে আনতে হবে নাকি?"

বাহক দু'জন লোকটিকে চ্যাংদোলা করে ভিতরে এনে ফেলল।

"জামাটা সরাও।" মেজর বললেন। একটা সন্নায় খানিকটা গজ তুলে নিলেন মেজর, ক্যাপ্টেন দু'জনও পরনের কোট খুলে তৈরি হলেন।

বাহক দু'জনকে মেজর বললেন.

"তোমরা এখান থেকে যাও।"

আমি গর্দিনিকে বললাম, "চলো, আমরাও যাই।"

"গোলাবর্ষণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বরং এখানেই থাকো।" আমাকে বললেন মেজর।

আমি বললাম,

"ওরা যে খেতে চাইছে!"

"তাহলে যা-খুশি করো।"

ইটখোলার ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম দু'জনে, নদীর পাড়ের কাছাকাছি একটা গোলা ফাটল, তারপর আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আর একটা গোলা ফেটে পড়ল। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম আমরা। আগুনের ঝল্কানি আর গোলা ফাটার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল বিস্ফোরকের গন্ধ, গোলার টুকরোগুলোর ছুটে যাওয়ার আওয়াজ, আর ইট খসে পড়ার শব্দ। গর্দিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের গর্তের দিকে ছুটল, তার পেছনে আমিও ছুটলাম। হাতে আমার চিজের ডেলা; তার ওপরদিকটা ইটের গুঁড়োয় ঢেকে গেছে। গর্তের মধ্যে তিনজন ড্রাইভার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ধূমপান করছে।

আমি বললাম, "নাও হে, খাবার।"

"গাড়িগুলোর কী অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল মানেরা।

"ঠিক আছে।"

"গোলার জন্যে ভয় পেয়েছিলেন, তেনেন্তে?"

"তা পেয়েছিলাম!"

ছুরিটা বার করে ফলাটা মুছে নিয়ে চিজের ওপরের ময়লাগুলো চেঁছে ফেলে দিলাম। ম্যাকারোনির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিল গাভুৎসি।

"খেতে শুরু করুন, তেনেন্তে।"

বললাম, "না, মাটিতে রাখো, সবাই একসঙ্গে খাব।"

"কাঁটা নেই যে!"

"একেবারে বিশ্রী ব্যাপার!" আমি ইংরেজিতে বললাম। চিজের ডেলাটা টুকরো করে কেটে ম্যাকারোনির ওপর রাখলাম। ওদের বললাম খাওয়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আমার জন্য অপেক্ষা করছে ওরা। ম্যাকারোনির মধ্যে আঙুল চালিয়ে খানিকটা টেনে বার করলাম, তারপর অনেক কায়দায় সেটা মুখে ফেলে একটুকরো চিজ কামড়ে নিলাম। এক ঢোঁক মদ দিয়ে খাদ্যটা গলাধঃকরণ করা গেল। মরচে-ধরা বাসনের গন্ধ খাবারে। পাসিনির হাতে পাত্রটা তুলে দিলাম।

"জঘন্য," পাসিনি বলল, "কখন থেকে পড়ে আছে কে জানে—গাড়িতেও একই জিনিস খেয়েছি!" পাত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুষে চুষে খাচ্ছে সবাই। আমি আরও কিছুটা ম্যাকারোনি আর একটু চিজ খেলাম, সঙ্গে এক ঢোঁক মদ। চারপাশ কাঁপিয়ে বাইরে একটা গোলা ফাটল।

"চারশো কুড়ি নম্বরের গোলা।" গাভুৎসি বলল।

আমি বললাম,

"পাহাড়ের ওপর একটাও চারশো কুড়ি নম্বরের কামান নেই।"

"বিরাট স্কোডা কামান আছে ওদের, সেই গর্তগুলো দেখেছি আমি।"

"ওসব তিনশো পাঁচ নম্বরের।"

আমরা খাচ্ছি। একটা কাশির শব্দ হল, একটা রেল-ইঞ্জিন চলতে শুরু করল যেন—তারপরই চারপাশ কাঁপিয়ে ফের একটা বিস্ফোরণ।

পাসিনি বলল, "আমাদের গর্তটা কিন্তু খুব-একটা গভীর নয়।"

"ওটা একটা বিরাট ট্রেঞ্চ-মর্টার গোলা।"

'ঠিক বলেছেন।"

চিজের শেষটুকু খেয়ে আর এক ঢোঁক মদ খেলাম। তখনই নানান শব্দের মধ্যে ফের সেই কাশির আওয়াজ, তার সঙ্গে একটানা চুঃ-চুঃ-চুঃ শব্দ, পরক্ষণেই আলোর ঝল্‌কানি। মনে হল যেন একটা বিশাল চুল্লির দরজা খুলে গেল...বাতাসের ভেতর দিয়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে ভেসে চলেছে সাদা আর লাল, লাল আর সাদা আর অবিরাম আগুনের হল্‌কা। শ্বাস নিতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে...আমার আমিটুকু যেন সবেগে বেরিয়ে গেছে বাইরে। শূন্যে বিপুল বেগে চলেছে...চলেছে...চলেছে... অনন্তকাল ধরে হাওয়ায় হাওয়ায় পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ছুটে বেরিয়ে এসেছি, মনে হল যেন মরে গেছি—কিন্তু শুধুই কি মরে গেছি! তা-ও তো নয়! শূন্যে ভাসন্ত শরীরটা আর এগোচ্ছে না—পিছ্‌লে পড়ছি নীচের দিকে...ফিরে এলাম আবার, মাটিতে আছড়ে পড়ে শ্বাস নিলাম।

চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে সমস্ত জায়গাটা—আমার মাথার কাছে টুকরো হয়ে যাওয়া একটা কাঠের বরগা। মাথাটা ঝাঁকুনি খেয়ে পড়তেই শুনতে পেলাম কে-যেন কাঁদছে—মনে হল কেউ যেন চিৎকার করছে। নড়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মেশিনগান আর রাইফেলের আওয়াজ ভেসে আসছে নদীর ওপার থেকে—নদীর চারদিক থেকে। একটা বিরাট আলোর ঝলক। ফুলঝুরির মতো সাদা আগুন জ্বালিয়ে আকাশের বুকে ফেটে পড়ল একটা কামানের গোলা। শূন্যের বুকে একটা রকেট ফাটল, কানে এল বোমাবর্ষণের একটানা শব্দ। এ-সবই মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই শুনতে পেলাম আমার খুব কাছে কে-যেন গোঙাচ্ছে—"মা গো! উঃ, মা গো!"

জোর করে টেনে-মুচড়ে অনেক কষ্টে পা-টা আলগা করলাম, পাশ ফিরে হাত দিলাম ওর গায়ে—পাসিনি!

গায়ে হাত দিতেই পাসিনি কাতরে উঠল। ওর পা দুটো আমার দিকে। আলো-আঁধারিতে দেখলাম, দুটো পা-ই হাঁটুর ওপর থেকে একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। একটা পায়ের কোনও চিহ্নই নেই, অন্যটা শিরা স্নায়ু আর প্যান্টের কাপড়ে কোনওমতে আটকে আছে। সেটাও এমন ভাবে মুচড়ে উঠছে যে মনেই হচ্ছে না শরীরের সঙ্গে কোনও যোগ আছে! নিজের হাত কামড়ে ধরে গুমরে গুমরে কাঁদছে পাসিনি,

"মা গো, ওহ্ মা গো—মুক্তি দাও! মুক্তি দাও, মা মেরি। হে যিশু, ও ক্রাইস্ট, গুলি করে মেরে ফ্যালো আমায়, এ-যন্ত্রণার শেষ করো—ওহ্ মাগো—ওহ্—"

গলাটা বুজে এল ওর। হাতটা কামড়ে ধরে চুপ করে গেল। প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পায়ের অংশটুকু তখনও মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।

হাতটা মুখের কাছে চোঙার মতো গোল করে ধরে চিৎকার করলাম, "এখানে জখম হয়েছে, কেউ সাহায্য করো!"

রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্যে ওর পায়ে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব বলে ওর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আবার একবার চেষ্টা করলাম—পাদুটো একটু নাড়ানো গেল। হাত আর কনুইতে ভর দিয়ে বুকে হেঁটে পিছিয়ে যেতে পারলাম এবার। পাসিনি তখন চুপ করে গেছে। ওর পাশে বসে আমার টিউনিকটা খুলে শার্টের নীচে ছেঁড়ার চেষ্টা করলাম। ছেঁড়া গেল না। দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে মনে পড়ল ওর পায়ের পট্টির কথা। আমার পায়ে গরম মোজা, কিন্তু পাসিনির পায়ে পট্টি ছিল—সব ড্রাইভারই পায়ে পট্টি বাঁধে। তবে পাসিনির তো এখন একটাই পা। পট্টি খুলতে শুরু করে বুঝলাম—ব্যান্ডেজ বাঁধার আর প্রয়োজন হবে না, সব শেষ হয়ে গেছে। পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলাম।

এবার অন্য তিনজনকে খুঁজে বার করতে হবে। সোজা হয়ে উঠে বসলাম। বসতে গিয়ে মনে হল, মাথার মধ্যে একটা বিশাল ওজনের গোল জিনিস যেন ঘুরে গিয়ে

ভেতর থেকে চোখের গোলকের ওপর তীব্র ঘা মারল। পা দুটো গরম লাগল। জুতোর ভেতরটাও গরম আর ভিজে-ভিজে। বুঝলাম চোট লেগেছে। ঝুঁকে পড়ে হাঁটুতে হাত রাখলাম—জানুসন্ধির মাঝে হাঁটুর চাকিটা নেই!আরও নীচে হাত চালিয়ে দেখলাম—পায়ের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে সেটা। ভিজে হাতটা শার্টে মুছে নিলাম। আকাশ চিরে আর-একটা আলো নেমে আসছে। তার আভায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম পায়ের হালটা। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম,

"হায় ভগবান! এখান থেকে উদ্ধার করো আমাকে!"

জানতাম আরও তিনজন আছে। আমার চারজন ড্রাইভারের মধ্যে পাসিনির মৃত্যু হওয়ায় তিনজন এখনও রয়ে গেছে। কে-যেন হাতের তলা দিয়ে আমাকে তুলে ধরল, আর একজন পা-দুটো তুলল।

"আরও তিনজন আছে।" আমি বললাম, "একজন মারা গেছে।"

"আমি মানেরা। আমরা স্ট্রেচার আনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও স্ট্রেচার নেই। কেমন আছেন, তেনেন্তে?"

"গাভুৎসি আর গর্দিনি কোথায়?"

"গর্দিনি ঘাঁটিতে ব্যান্ডেজ বাঁধাচ্ছে, আর গাভুৎসি আপনার পা ধরে আছে। আমার গলাটা ধরুন। জখমটা কি খুব বেশি হয়েছে?"

"পায়ে চোট লেগেছে। গর্দিনি কেমন আছে?"

"ভালই আছে। একটা বিরাট ট্রেঞ্চ-মর্টার গোলা ছিল ওটা।"

"পাসিনি মারা গেছে?"

"হ্যাঁ, মারা গেছে।"

কাছেই একটা গোলা ফাটতে ওরা মাটিতে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে আমাকেও ফেলে দিল। মানেরা বলল,

"দুঃখিত, তেনেন্তে। এবার আমার গলাটা ধরুন।"

"আবার যদি ফেলে দাও!"

"হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বলে সামলাতে পারিনি।"

"তোমরা জখম হওনি তো?"

"আমাদের দু'জনেরই অল্প চোট লেগেছে।"

"গর্দিনি গাড়ি চালাতে পারবে?"

"না বোধহয়!"

ঘাঁটিতে পৌঁছবার আগে আর-একবার ফেলে দিল ওরা আমাকে। গালাগাল দিয়ে উঠলাম। মানেরা দুঃখ প্রকাশ করল, কথা দিল আর ফেলবে না।

ঘাঁটির বাইরে অন্ধকারে আমাদের মতো অনেকে মাটিতে পড়ে আছে। আহতদের

ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বাইরে আনা হচ্ছে। শুশ্রূষা-কেন্দ্রের দরজায় ঝোলানো পর্দা সরানোর সময় যেটুকু আলো আসছিল, তাতেই আহতদের আনা-নেওয়া দেখতে পাচ্ছি। মৃতদের একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কাঁধ পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে কাজ করছে ডাক্তাররা—ওদের হাতগুলো জল্লাদের মতো লাল। পর্যাপ্ত স্ট্রেচার নেই। আহতদের মধ্যে কেউ কেউ গোলমাল করছে, তবে বেশির ভাগই চুপ করে আছে।

শুশ্রূষা-কেন্দ্রের দরজার ওপরে লতাকুঞ্জের পাতায় বাতাসের ছোঁয়া লাগে। রাত ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসে। স্ট্রেচার-বাহকেরা সমানে আসছে, স্ট্রেচার নামিয়ে বোঝা খালি করে আবার ফিরে যাচ্ছে।

আমরা শুশ্রূষা-কেন্দ্রে পৌঁছতেই একজন সার্জেন্ট ডাক্তারকে বাইরে নিয়ে এসে আমার পা-দুটোয় ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে দিল মানেরা।

ডাক্তার বললেন, ক্ষতস্থানে এত ধুলো পড়েছে যে খুব বেশি রক্তপাত হয়নি। যত দ্রুত সম্ভব আমাকে ভেতরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

মানেরা জানাল, গর্দিনি গাড়ি চালাতে পারবে না, ওর কাঁধ ভেঙে গেছে, মাথায়ও আঘাত লেগেছে। এতক্ষণ ততটা খারাপ লাগছিল না, কিন্তু এখন কাঁধটা যেন ক্রমশই ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটা ইটের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে গর্দিনি। মানেরা আর গাভুৎসি দু'জনেই এক-এক গাড়ি আহতকে নিয়ে চলে গেল, তারপর আবার ফিরে এসে ভেতরে ঢুকল।

ব্রিটিশরা তিনখানা অ্যাম্বুল্যান্স এনেছিল, প্রতিটা অ্যাম্বুল্যান্সে দু'জন করে লোক। তাদের একজন ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে এল গর্দিনি। খুব অসুস্থ আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে গর্দিনিকে। ব্রিটিশটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল,

"খুব লেগেছে?" লোকটি বেশ লম্বা। চোখে লোহার ফ্রেমের চশমা।

বললাম, "পায়ে লেগেছে।"

"আশা করি গুরুতর কিছু হয়নি। সিগারেট খাবেন?"

"ধন্যবাদ।"

"ওরা বলছিল—আপনার দু'জন ড্রাইভার গেছে?"

"হ্যাঁ, একজন মারা গেছে, অন্যজন হচ্ছে যে আপনাকে এখানে নিয়ে এল।"

"কী দুর্ভাগ্য! আপনি কি আপনার গাড়িগুলো আমাদের নিয়ে যেতে বলেন?"

"ঠিক এই কথাটাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম।"

"ওগুলো আমরা ঠিকভাবেই আপনাদের ভিলায় পৌঁছে দেব—২০৬ নম্বর তো?"

"হ্যাঁ।"

"বড় চমৎকার জায়গাটা—দেখেছি আপনাকে ওখানে। ওরা বলছিল আপনি নাকি আমেরিকান?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ইংরেজ।"

"তাই নাকি?"

"ঠিকই বলছি! আপনি কি ভেবেছিলেন আমি ইতালিয়ান? আমাদের একটা দলের সঙ্গে কয়েক জন ইতালিয়ান আছে।"

আমি বললাম, "আপনি গাড়িগুলো নিয়ে গেলে খুব ভাল হয়।"

"সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটি, "আপনার এই লোকটি আমাকে আপনার কাছে আনার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।" গর্দিনির পিঠটা চাপড়ে দিল সে। মুখ বিকৃত করে সামান্য হাসল গর্দিনি। শুদ্ধ ইতালিয়ান ভাষায় ইংরেজটি বলতে শুরু করল,

"কী, সব ঠিক হয়ে গেল তো? তোমার তেনেন্তেকে দেখলাম, তোমাদের গাড়ি দুটোও নিয়ে যাব। আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেমন?"

তারপর আমায় বলল,

"দেখি, চিকিৎসা বিভাগের লোকেদের ধরে আপনাকে এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতেই হবে। আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যাব আপনাকে।"

আহতদের মাঝখান দিয়ে সাবধানে পা ফেলে শুশ্রূষা-কেন্দ্রের ভেতরে চলে গেল ইংরেজটি।

"উনি ভালভবেই আপনার দেখাশোনা করবেন, তেনেন্তে।" গর্দিনি বলল।

"তুমি কেমন আছ, ফ্রাঙ্কো?"

"আমি ঠিক আছি।" আমার পাশে বসে পড়ল ও। একটু পরেই আবার কম্বলের পর্দা সরে গেল, এক ঝলক আলো এসে পড়ল বাইরে। সেই সঙ্গে দু'জন স্ট্রেচার-বাহকের পিছু পিছু বেরিয়ে এল সেই দীর্ঘদেহী ইংরেজটি। ওদের নিয়ে আমার কাছে এসে ইতালীয় ভাষায় বলল, "ইনিই সেই আমেরিকান তেনেন্তে।"

আমি বললাম, "আমি বরং অপেক্ষা করি। আমার চেয়ে অনেক গুরুতর আহতরা আছে এখানে—আমি তো ভালই আছি।"

"চলুন চলুন, আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই।" ইংরেজটি বলল। তারপর আবার ইতালীয় ভাষায় বলল,

"সাবধানে তুলো। ওঁর পা-দুটোয় প্রচণ্ড ব্যথা, প্রেসিডেন্ট উইলসনের ছেলে—বুঝলে তো?"

আমাকে তুলে শুশ্রূষা-কেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে গেল ওরা। ভেতরে প্রতিটি টেবিলেই অপারেশন চলছিল।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন মেজর, চিনতে পেরে হাতে-ধরা ফরসেপটা নেড়ে অভিবাদন জানালেন। দীর্ঘদেহী ইংরেজটি বলল,

"ওঁকে ভেতরে নিয়ে এলাম—আমেরিকার রাজদূতের একমাত্র ছেলে বলে কথা! আপনাদের হাত ফাঁকা না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবেন উনি। তারপর আমার প্রথম যাত্রাতেই ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

তারপর আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল,

"ওদের সহকারীর সঙ্গে কথা বলে আপনার কাগজপত্র যাতে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়, তার বন্দোবস্ত করছি গিয়ে।"

সামনে ঝুঁকে দীর্ঘ শরীরটা নিচু করে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ইংরেজটি। ফরসেপের কব্জা খুলে আলাদা করে গামলার জলে ফেলেছেন মেজর। ওঁর সক্রিয় হাতদুটোকে অনুসরণ করছি চোখ দিয়ে—ব্যান্ডেজ বাঁধছেন এবার। শেষে স্ট্রেচার-বাহকেরা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল আহত লোকটিকে। একজন ক্যাপ্টেন বললেন, "এবার আমি আমেরিকানটিকে ধরব।"

ধরাধরি করে আমাকে টেবিলে তুলে দিল ওরা। শক্ত পিচ্ছিল টেবিল। হরেকরকম ওষুধ আর সেই সঙ্গে রক্ত, সবটা মিলেমিশে একটা কড়া গন্ধ।

আমার প্যান্টালুনটা খুলে ফেলল ওরা। ক্যাপ্টেন ডাক্তারটি কাজ করতে করতে সহকারী সার্জেন্টকে লেখার জন্য বলে যেতে লাগলেন, "ডান এবং বাঁ উরুতে, ডান এবং বাঁ জানুতে আর পায়ে প্রচুর গভীর ক্ষত, ডান জানু এবং ডান পায়ের আঘাত গভীর। মাথার খুলির উপরিভাগ ছিন্নভিন্ন।"

চুলের মধ্যে শলা দিয়ে খুঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন,

"লাগছে?"

"ওহ্, ভীষণ লাগছে!"

ক্যাপ্টেন বলে চললেন,

"মাথার খুলি ভেঙে থাকতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় আহত।"

তারপর আমাকে বললেন,

"এটা তোমাকে কোর্ট মার্শাল থেকে বাঁচাবে—যাতে ওরা ভাবতে না পারে ইচ্ছে করে আঘাত বানিয়েছ। একটু ব্র্যান্ডি খাবে? এমন হাল কী করে হল? কী করার চেষ্টা করছিলে—আত্মহত্যা? অ্যান্টি-টিটেনাস দাও একটা—দু'পায়ে একটা করে দাগ মারো। এবার একটু পরিষ্কার করা যাক। ধুয়ে সাফসুতরো করে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেব।"

কাগজ থেকে মুখ তুলে সহকারীটি বলল,

"চোটটা হল কী করে?"

ক্যাপ্টেন ডাক্তার আমাকে বললেন, "কীসে লাগল?"

চোখ বন্ধ অবস্থায় উত্তর দিলাম,

"একটা ট্রেঞ্চ-মর্টার গোলা—"

ক্যাপ্টেনের হাত চলছে, মাংসপেশীর মধ্যে অস্ত্র চালিয়ে কাটাকুটি করছেন। বললেন, "ঠিক জানো?"

আপ্রাণ চেষ্টা করছি স্থির থাকার, তবু তীক্ষ্ণ ব্যথায় পেটের পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে সমানে।

"তা-ই তো মনে হয়।"

ক্যাপ্টেন ডাক্তার ক্ষতস্থান থেকে কিছু আবিষ্কারের উৎসাহে বললেন, "শত্রুর ট্রেঞ্চ-মর্টার গোলার ছোট ছোট টুকরো। বলো তো এগুলো খুঁচিয়ে কিছু বার করতে পারি, তবে তেমন দরকার হবে না। ফুটছে? ও কিছু নয়। এরপর যা হবে তার তুলনায় কিছু নয়, যন্ত্রণা তো এখনও শুরুই হয়নি। ওহে, এক গ্লাস ব্র্যান্ডি এনে দাও তো একে। আঘাতের প্রথম চোটে যন্ত্রণা একটু চাপা থাকে। কিন্তু এ ভালই আছে, অবশ্য যদি পেকে না ওঠে—আর আজকাল সাধারণত পাকেও না। মাথাটা কেমন লাগছে?"

"খুব খারাপ।"

"তাহলে বেশি ব্যান্ডি খেয়ো না। হাড় ভেঙে থাকলেও যন্ত্রণা কাম্য নয়। কেমন লাগছে?"

আমার সারা শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছিল।

কোনওমতে বললাম, "ওঃ, ভগবান!"

"ভেঙেই গেছে বোধহয়। ভাল করে জড়িয়ে দিচ্ছি তোমায়—মাথাটা নাড়াচাড়া কোরো না।"

দ্রুত হাত চালিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। চমৎকার শক্ত আঁটোসাঁটো ব্যান্ডেজ।

"শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ফ্রান্সের জয় হোক!"

"উনি তো আমেরিকান!" অন্য একজন ক্যাপ্টেন বলল।

"তুমি যে বললে ফরাসি? ফরাসি ভাষায় কথা বলে তো!" ক্যাপ্টেন বললেন, "আমি ওকে আগেও জানতাম—বরাবর মনে হত ও ফরাসি।" আধ গ্লাস কগনাক খেলেন ক্যাপ্টেন, তারপর বললেন, "আরও কিছু অ্যান্টি-টিটেনাস দাও।"

হাত নেড়ে আমায় অভিবাদন জানালেন ক্যাপ্টেন। ওরা আমায় সরিয়ে নিয়ে এল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কম্বলের পর্দাটার ঝাপ্‌টা লাগল মুখে।

বাইরে যেখানে পড়েছিলাম, সেখানে সেই সহকারী সার্জেন্টটি এসে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। খুব নরম গলায় প্রশ্ন শুরু করলেন,

"নামটা কী? পুরো নাম? সেনাদলের কোন্ পর্যায়ভুক্ত? কোথায় জন্ম? কোন্ শ্রেণি? কোন্ বাহিনী?" ইত্যাদি। শেষে বললেন,

"আপনার মাথার চোটটার জন্যে আমি খুব দুঃখিত, তেনেন্তে। আশা করি এবার একটু ভাল বোধ করবেন। ইংরেজদের অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।"

বললাম, "আমি ঠিক আছি। অনেক ধন্যবাদ।"

ক্যাপ্টেনের কথামতো যন্ত্রণাটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। চারপাশের আর কোনও কিছুই মনে অনুভূতি সৃষ্টি করছে না।

খানিক পরে ব্রিটিশ অ্যাম্বুল্যান্স এল। আমাকে একটা স্ট্রেচারে তুলে অ্যাম্বুল্যান্স অবধি উঁচু করে ভেতরে ঠেলে দিল ওরা। পাশেই আর-একটা স্ট্রেচারে একজন শুয়ে আছে—সারা মুখ জোড়া ব্যান্ডেজের ফাঁক দিয়ে মোমের মতো সাদা নাকটা শুধু দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘ গভীর শ্বাস পড়ছে তার। ওপর দিকে আরও কয়েকটা স্ট্রেচার তুলে দেওয়া হল। দীর্ঘদেহী ইংরেজ ড্রাইভারটি এসে ভিতর দিকে তাকিয়ে বলল,

"এ আমি সহজেই নিয়ে যেতে পারব। আশা করি আরামেই থাকবেন আপনি।"

বুঝতে পারলাম গাড়ির ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে, আর গাড়ির পাদানি বেয়ে ওপরে উঠে সামনের সিটে বসল সে। ইঞ্জিনের ব্রেক টেনে, ক্লাচটা চেপে দিল, তারপরেই চলতে শুরু করল গাড়িটা। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। যন্ত্রণাটা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

গাড়িটা অন্য সব গাড়ির ভিড় ঠেলে, কখনও থেমে থেমে, কখনও মোড় ঘোরার জন্য একটু পিছু হঠে গিয়ে রাস্তা বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে। তারপর ভিড় কাটিয়ে দ্রুত বেগে উঠতে শুরু করল।

মনে হল ওপর থেকে টপ্‌টপ্ করে কী-যেন পড়ছে আমার গায়ে। প্রথমে ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়ছিল, তারপর পড়তে লাগল অঝোরে। চিৎকার করে ড্রাইভারকে ডাকলাম। গাড়ি থামিয়ে ওর সিটের পিছন দিকের ফাঁকটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বলল,

"কী হয়েছে?"

"আমার ওপরের স্ট্রেচারের লোকটার রক্তপাত হচ্ছে।"

"ঘাঁটি আর বেশি দূরে নয়। তা ছাড়া আমি একা তো স্ট্রেচার বার করতে পারব না।"

গাড়ি আবার চলতে লাগল।

রক্তপাত হয়েই চলেছে। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছিলাম না ওপরে ক্যানভাসের ঠিক কোন্‌খান দিয়ে রক্ত পড়ছে। একটু পাশের দিকে সরার চেষ্টা করলাম, যাতে সরাসরি আমার গায়ে না পড়ে। শার্টের ভেতর দিয়ে যেখানে যেখানে রক্ত ঢুকে গেছে, সেখানে গরম আর চটচটে লাগছে। আমার শরীর ঠান্ডা, পায়ের যন্ত্রণাটাও বেড়েছে, বেশ অসুস্থ বোধ করছি। খানিক পরে ওপরের রক্তস্রোত কমে আবার ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়তে লাগল—ওপরের ক্যানভাসের ওপারে নড়ে ওঠার আভাস পেলাম লোকটির। এতক্ষণে আরাম করে শুতে পেরেছে বেচারি।

"কেমন আছে লোকটি?" ইংরেজ ড্রাইভার মুখ ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা।"

"মনে হচ্ছে মারা গেছে।" জবাব দিলাম আমি।

সূর্যাস্তের পর গলে-যাওয়া তুষারবিন্দুর মতো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ছোট ছোট ফোঁটা পড়ছে এখন, খুব ধীরে ধীরে। গাড়ির ভেতরটা ঠান্ডা, বাইরে অন্ধকার রাত, আমরা পাহাড়ি পথ বেয়ে ওপরদিকে চলেছি। পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটিতে এসে ওরা ওপরের স্ট্রেচারটা বার করে আর-একটা স্ট্রেচার তুলে দিল সেখানে। আবার চলতে লাগলাম আমরা।

যুদ্ধক্ষেত্রের অস্থায়ী হাসপাতালে শুয়েই খবর পেলাম, বিকেলের দিকে কে-একজন আমাকে দেখতে আসবে। দিনটা ভীষণ গরম, ঘরে প্রচুর মাছি। আমার আর্দালি একটা লাঠির ডগায় কাগজের টুকরো বেঁধে মাছি তাড়ানোর চেষ্টা করছে, মাছিগুলো গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ছাদের সিলিঙে। মাছি তাড়াতে তাড়াতে আর্দালি ঘুমিয়ে পড়লেই আবার নেমে আসছে সেগুলো। দু'-একবার ফুঁ দিয়ে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করলাম, শেষে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ঘুম ভাঙতেই পায়ের ভেতরে একটা চুলকুনির অনুভূতি বোধ করলাম। আর্দালিকে ডেকে তুললাম। সে খানিকটা খনিজ জল ঢেলে দিল আমার ব্যান্ডেজের ওপর। বিছানাটা ভিজে গেল, একটু ঠান্ডাও হল সেইসঙ্গে। যারা জেগে আছে, তারা বিছানা থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। বিকালে চারপাশ নিস্তব্ধ থাকে। সকালে তিনজন পুরুষ নার্স এসে আমাকে অন্য ঘরে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে আমার ব্যান্ডেজ বদলানো হয়, সেই ফাঁকে আমার বিছানাটাও বদলে দেওয়া হয়। এই যাওয়া-আসাটা আদৌ স্বস্তিদায়ক নয়। পরে অবশ্য জেনেছিলাম বিছানা বদলানোর জন্যে রোগীকে তোলার দরকার হয় না। আর্দালির জল ঢালা হয়ে গেছে—বিছানাটা বেশ ঠান্ডা লাগছে। ওকে বোঝালাম, পায়ের পাতার কোন্‌খানটা চুলকোতে হবে—এই সময় একজন ডাক্তার রিনাল্‌দিকে নিয়ে ভেতরে এলেন। রিনাল্‌দি ছুটে এসে নিচু হয়ে চুমু খেল আমাকে। ওর হাতে দস্তানা।

"কেমন আছ হে খোকা—কেমন লাগছে? দেখো কী এনেছি তোমার জন্যে।"

এক বোতল কগনাক বার করল ও। আর্দালি একটা চেয়ার এনে দিল। তাতে বসে রিনাল্‌দি বলল,

"সুসংবাদ আছে—তোমাকে মেডেল দেবে। ওরা তোমাকে রুপোর মেডেলই দিতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ব্রোঞ্জ ছাড়া আর কিছু জুটবে না।"

"কিন্তু দেবেটা কেন?"

"কারণ তুমি মারাত্মক জখম হয়েছ। ওরা বলছে তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো কোনও বীরত্বের কাজ করেছ, তাহলেই রুপোর মেডেল পাবে। তা নইলে ব্রোঞ্জের মেডেল দেবে। ঠিক কী-কী ঘটেছিল বলো তো—কোনও বীরত্বের কাজ করেছ?"

আমি বললাম,

"না। আমরা যখন চিজ খাচ্ছিলাম, তখনই বোমা মেরে আমাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।"

"মশকরা কোরো না। আগে-পরে নিশ্চয়ই কিছু বীরত্বের কাজ করেছিলে—ঠিক করে ভেবে দ্যাখো তো!"

"কিছুই করিনি।"

"পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওনি কাউকে? গর্দিনি বলছিল তুমি নাকি অনেককে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গেছলে, কিন্তু ঘাঁটির মেজর ডাক্তার বলছিলেন, সেটা অসম্ভব। ওঁকে তো আবার ওই প্রস্তাবপত্রে সই করতে হয় কিনা।"

"কাউকেই বয়ে নিয়ে যাইনি। নড়ারই শক্তি ছিল না আমার।"

"ঠিক আছে, ওতে কিছু যাবে-আসবে না।" হাতের দস্তানাটা খুলে ফেলল রিনাল্‌দি। "রুপোর একটা মেডেল তোমাকে পাইয়ে দেবই আমরা। আচ্ছা, তুমি কি অন্য আহতদের আগে নিজের পরিচর্যায় আপত্তি করোনি?"

"তেমন জোর দিয়ে করিনি।"

"তাতে কিছু যায়-আসে না। সাংঘাতিক জখম হয়েছ, সব সময় নির্ভীকভাবে সামনের সারিতে থাকতে চেয়েছ! তা ছাড়া আমাদের অভিযান সফল হয়েছে।"

"ওরা ঠিকমতো নদী পেরোতে পেরেছে?"

"দারুণভাবে। হাজার খানেককে তো বন্দীই করেছে। ইস্তেহার বেরিয়েছে, পড়োনি?"

"না।"

"ঠিক আছে, আমি এনে দেব। চোখের পলকে কেল্লা ফতে হয়ে গেছে।"

"আর সব খবর কেমন?"

"দারুণ। আমরা সুন্দর সময় কাটাচ্ছি আর তোমার জন্যে সবাই একেবারে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা, ঘটনাটা প্রথম থেকে পুরো খুঁটিয়ে বলো তো দেখি—একটা রুপোর মেডেল নিশ্চিত পাবে। নাও, যা যা ঘটেছে বলো।"

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলতে লাগল, "ইংরেজদের তরফ থেকেও একটা মেডেল পেতে পারো। ওখানে তো একজন ইংরেজও ছিল। ওর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করব সে তোমার জন্য একটু সুপারিশ করবে কিনা। হয়তো সে কিছু করতেও পারে। খুব কষ্ট হচ্ছে? একটু মদ খাও। আর্দালি, একটা কর্কস্ক্রু আনো তো। ওহো,

তুমি যদি দেখতে আমি কীভাবে একজনের তিন মিটার লম্বা ক্ষুদ্রান্ত্র কেটে বাদ দিয়েছি! লোকটা এখন বেশ ভাল আছে—ল্যান্সেট পত্রিকায় ছাপাবার মতো খবর। তুমি একটু অনুবাদ করে দিয়ো তো, ল্যান্সেটে পাঠিয়ে দেব। দিন দিন আমার অপারেশনের হাত একেবারে খুলে যাচ্ছে! এখন কেমন লাগছে তোমার? এ ব্যাটা যে কর্কস্ক্রু আনতে বেলা কাটিয়ে দিল! তুমি যা মুখ বুজে সহ্য করতে পারো, মনেই থাকে না যে তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

আর্দালিটি ফিরে এল।

"এই যে কর্কস্ক্রু, সিনর তেনেন্তে।" সে বলল।

"বোতলটা খোলো আর একটা গেলাস আনো। এটুকু খেয়ে নাও, ভাই! মাথাটা কেমন আছে? তোমার কাগজপত্র দেখেছি, হাড়টাড় কিছু ভাঙেনি। ঘাঁটির মেজরটা একটা শুয়োর-কাটা কশাই। আমি হলে তোমাকে একটুও ব্যথা দিতাম না। কাউকে ব্যথা দিই না আমি। ঠিকমতো কাজ করতে শিখছি। এমনভাবে এত কথা বলার জন্যে মাফ কোরো ভাই, তোমাকে এভাবে জখম হয়ে পড়ে থাকতে দেখে ভীষণ মন খারাপ লাগছে। নাও, এটুকু খেয়ে ফেলো—ভাল জিনিস! পনেরো লিরে দাম নিয়েছে। ভাল হতেই হবে, একেবারে পাঁচ তারা মার্কা। এখান থেকে গিয়ে ইংরেজটির সঙ্গে দেখা করব, ও তোমার জন্যে ইংরেজদের তরফ থেকে একটা মেডেলের বন্দোবস্ত করে দেবে।"

"এভাবে মেডেল দেয় না ওরা।"

"তুমি বড্ড বেশি ভদ্র। আমি লিয়াজোঁ অফিসারকে পাঠাব ইংরেজটিকে বোঝানোর জন্যে।"

"মিস বার্কলের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?"

"আমি ওকে এখানে নিয়ে আসব। এখনই নিয়ে আসি বরং।"

"না না, যেয়ো না। গোরিজিয়ার খবর বলো। মেয়েদের কী খবর?"

"কোনও মেয়ে-টেয়ে নেই। দু'সপ্তা ধরে বদলি করছে না ওদের। আর যাই না ওখানে—যত সব বিশ্রী কাণ্ড—ওরা কি আর মেয়ে আছে? সব যেন দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সাথী হয়ে গেছে।"

"একেবারেই যাও না?"

"যাই—নতুন মাল কিছু এল কিনা দেখতে যাই। বাড়িটার সামনে দাঁড়াই। ওরা তোমার কথা জানতে চায়। কী কাণ্ড বলো! একই দল একনাগাড়ে এতদিন ধরে আছে যে সব যেন দোস্ত হয়ে গেছে।"

"মেয়েরা বোধহয় যুদ্ধ-সীমান্তে আর আসতে চায় না।"

"খুব চায়—ওদের হাতে প্রচুর মেয়ে আছে। আসলে ব্যবস্থাটা বিচ্ছিরি, তাই এই

হাল। পেছনের লাইনে ট্রেঞ্চে যারা লুকিয়ে বসে আছে, তাদের আমোদের জন্যে সব জমিয়ে রেখে দিয়েছে।"

"বেচারা রিনাল্‌দি!" আমি বললাম, "একা-একা যুদ্ধ করছে, হাতের কাছে একটাও নতুন মেয়ে নেই!"

আর এক গ্লাস কগনাক ঢালল ও।

"এতে তোমার কিছু ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। খেয়ে নাও।" ও বলল।

কগনাক খেয়ে শরীরে একটা উষ্ণতা অনুভব করলাম। রিনাল্‌দি আর-এক গ্লাস ঢালল। ও অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে এখন। গ্লাসটা উঁচু করে ধরে বলল,

"বীর আহতের নামে আর তার রুপোর মেডেলের উদ্দেশ্যে।"

তারপর বলল,

"আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো—এখানে গরমের মধ্যে শুয়ে কখনও তোমার কোনও উত্তেজনা আসে না?"

"মাঝেমধ্যে আসে।"

"এভাবে পড়ে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি হলে স্রেফ পাগল হয়ে যেতাম।"

"তুমি তো এমনিতেই পাগল।"

"কবে তুমি আমাদের মধ্যে ফিরবে? এখন আর রাত করে ঘরে ফেরার কেউ নেই, আমোদ করার মতো লোক পাই না। আমায় টাকা ধার দেওয়ার কেউ নেই—আমার রক্তের ভাই, ঘরের সঙ্গী নেই। কেন এমন জখম হতে গেলে?"

"পাদ্রিকে নিয়ে তো আমোদ করতে পারো!"

"পাদ্রিকে নিয়ে তো আমি মজা করি না, সেটা ক্যাপ্টেন করে। আমার ওকে ভালই লাগে। তুমি যদি পাদ্রিই চাও, তাহলে এই পাদ্রিটিই ভাল! তোমাকে দেখতে আসবে ও, তার জন্যে জোরদার তোড়জোড় করছে।"

"ওকে আমার ভাল লাগে।"

"সে আমি খুব জানি। তোমাদের দু'জনের একটু যেন অন্য ব্যাপার আছে বলে মনে হয় আমার।"

"কী আবোল-তাবোল বকছ?"

"হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে মনে হয়।"

"জাহান্নমে যাও তুমি।"

উঠে দাঁড়িয়ে দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে রিনাল্‌দি বলল, "তোমাকে রাগাতে খুব ভাল লাগে, তোমার পাদ্রি আর তোমার ওই ইংরেজ মেয়েটির কথা নিয়ে। কিন্তু সবকিছু নিয়েও আদতে তুমি ঠিক আমারই মতো।"

"একেবারেই না।"

"হ্যাঁ, আমরা একই। আদতে তুমি একজন ইতালিয়ান। বাইরেটাই গরম, ভেতরে কোনও জ্বালা নেই। তুমি যে আমেরিকান সেটা তোমার ভড়ং। আমরা ভাই-ভাই—একে অপরকে ভালবাসি।"

"আমি চলে গেলে ভাল ছেলে হয়ে থেকো কিন্তু।" আমি বললাম।

ও বলল, "মিস বার্কলেকে পাঠিয়ে দেব—আমি না থাকলেই ওর সঙ্গে তোমার ভাল জমে। তুমি আমার চেয়ে অনেক মিষ্টি আর অনেক খাঁটি কিনা।"

"চুলোর দোরে যাও তুমি।"

"পাঠিয়ে দেব, পাঠিয়ে দেব তোমার স্বপ্নের ঠান্ডা দেবীকে। ইংরেজ দেবী। হা কপাল, ওরকম একটা মেয়েকে নিয়ে পুজো করা ছাড়া আর কী করতে পারে পুরুষমানুষরা! ইংরেজ মেয়েমানুষরা আর কোন্ কম্মে লাগে?"

"তুমি একটা খিস্তিবাজ আকাট হেলে।"

"আকাট কী?"

"আকাট চাষা।"

"চাষা! তাহলে তুমি একটা ঠান্ডামুখো চাষা!"

"তুমি একটা আকাট মুখ্যু, পয়লা নম্বর বুদ্ধু।" অনভিজ্ঞতার খোঁচাটা ওকে খুব আঘাত করছিল বুঝতে পেরে, ওই কথাটা দিয়েই বারবার খোঁচাতে লাগলাম।

"কিচ্ছু জানো না তুমি—পয়লা নম্বরের আকাট বুদ্ধু, কিচ্ছু দেখোনি, কিচ্ছু শেখোনি।"

"তাই নাকি? বেশ, তাহলে ওই সতীসাধ্বী নারীদের সম্বন্ধে বলছি—তোমার ওই দেবীদের কথা গো। ওসব মেয়েদের সঙ্গে সত্যিকারের ভাল মেয়ের অনেক ফারাক। ভাল মেয়েকে পটাতে মনে কষ্ট হয় এটুকু অন্তত আমি জানি।" হাতের দস্তানাটা দিয়ে বিছানার ওপর ঝাপ্টা মারল একটা, তারপর আবার বলল,

"তা ছাড়া ভাল মেয়েটির এসব ভাল লাগবে কিনা, তা কি জানা যায়!"

"আরে আরে, চটছ কেন?"

"মোটেই চটছি না। তোমার ভালর জন্যেই বলছি খোকাবাবু—পণ্ডশ্রম বাঁচবে তোমার।"

"শুধু এটুকুই ফারাক নাকি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমার মতো লক্ষ লক্ষ গাধারা এটুকুও জানে না।"

"ভাগ্যিস তুমি বললে!"

"না ভাই, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, বড্ড ভালবাসি তোমাকে। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধু বোলো না।"

"বেশ, তোমার মতো আমিও চালাক-চতুর হব।"

"রাগ কোরো না খোকাবাবু—হাসো। নাও, আর একটু মদ খাও। এবার কিন্তু সত্যি যেতে হবে।

"তুমি খুব ভাল ছেলে।"

"দেখলে তো—ভেতরে আমরা দু'জনেই এক, লড়াইয়ের বন্ধুত্ব আমাদের। চুমু খেয়ে বিদায় দাও আমাকে।"

"তুমি পাঁকের মতো চটচটে।"

"না গো, বেশি স্নেহপরায়ণ, আর কিছু না।" ঝুঁকে পড়ল আমার ওপর, ওর শ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। বলল,

"এখন চলি। আবার শিগগিরই আসব।" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,

"তোমার যখন ভাল লাগে না, তখন চুমু খাব না। তোমার ইংরেজ প্রাণেশ্বরীকেই পাঠিয়ে দেব। চলি—বিদায়। খাটের নীচে কগনাকটা রইল। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।"

বেরিয়ে গেল রিনাল্‌দি।

পাদ্রি এল সন্ধের পর। ইতিমধ্যে আমাকে সুপ দিয়ে গিয়েছিল ওরা, পাত্রটাও ততক্ষণে সরিয়ে নিয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে দেখছি ঘরের মধ্যে লম্বা বিছানার সারি, জানলার বাইরে উঁকি দিচ্ছে একটা গাছের মাথা—সন্ধ্যার মৃদু বাতাস দোলা জাগাচ্ছে তার গায়ে। জানলা দিয়ে বয়ে আসছে ঠান্ডা বাতাস। মাছিগুলো এখন গিয়ে জুটেছে সিলিংয়ের গায়ে আর বৈদ্যুতিক বাতি-ঝোলানো তারের ওপর।

রাত্তিরে নতুন রুগী এলে কিংবা কোনও কাজ হলে আলো জ্বালানো হয়। সন্ধের পরে অন্ধকারে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা—সেই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া!

আর্দালিটি একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়াল। পাদ্রি এসেছে। ছোটখাটো মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে আমার খাটের সামনে, পিঙ্গল মুখে অপ্রস্তুত ভাব।

"কেমন আছ?" পাদ্রি বলল, বিছানার পাশে মাটিতে নামিয়ে রাখল কতকগুলো মোড়ক।

"ভাল আছি, ফাদার।"

রিনাল্‌দির জন্যে আনা চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল পাদ্রি, তারপর অপ্রতিভ ভঙ্গিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মুখে ক্লান্তির ছাপ। বলল,

"বড্ড দেরি হয়ে গেল। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।"

"না না, কিছু দেরি হয়নি। মেসবাড়ির খবর-টবর কী?"

সামান্য হাসল পাদ্রি,

"এখনও আমি ওদের পরিহাসের পাত্র।" ওর গলায় ক্লান্তির ছোঁয়া। একটু থেমে আবার বলল, "ঈশ্বরের কৃপায় ওরা সবাই ভালই আছে আর তুমিও ভাল আছ দেখে খুব খুশি হলাম। আশা করি কষ্ট হচ্ছে না তোমার।"

ওকে ভীষণ শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, এমনটা আগে কখনও দেখিনি। বললাম,

"না, এখন আর কোনও কষ্ট নেই।"

"মেসে তোমার অভাবটা খুব অনুভব করি।"

"আমারও ভীষণ ইচ্ছে করে ওখানে যেতে। তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার সবসময়েই ভাল লাগত।"

"তোমার জন্যে দু'-একটা জিনিস এনেছি।" মোড়কগুলো তুলে নিল ও, "একটা মশারি, এক বোতল ভার্মুথ—তুমি তো ভার্মুথ ভালবাসো! আর কয়েকটা ইংরেজি পত্রিকা।"

খুশিমনে সব খুলতে লাগল পাদ্রি। মশারিটা হাতে নিয়ে দেখছিলাম। ভার্মুথের বোতলটা আমাকে দেখিয়ে বিছানার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখল ও। ইংরেজি পত্রিকার একটা বান্ডিল তুলে নিলাম। জানলা দিয়ে আসা আবছা আলোর দিকে ধরে নামটা পড়তে পারছিলাম—'দ্য নিউজ অফ দ্য ওয়ার্লর্ড'।

পাদ্রি বলল,

"অন্যগুলো ছবিওয়ালা।"

"এগুলো পড়তে খুব ভাল লাগবে। কোথায় পেলে?"

"মেস্ত্রে থেকে আনিয়েছি। আরও পাব।"

"তুমি এসে খুব ভাল করেছ ফাদার। একটু ভার্মুথ খাবে?"

"না না, ধন্যবাদ। ওটা তোমার জন্যে এনেছি, রেখে দাও।"

"এক গেলাস খাও না?"

"বেশ, তা হলে তোমাকে আরও এনে দেব।"

আর্দালি সব ব্যবস্থা করে দিল।

গেলাসটা তুলে ধরে বললাম "তোমার স্বাস্থ্য—ফাদার!"

ফাদার বলল,

"তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক।"

গেলাসটা হাতে ধরে রইল ও। আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম। অনেক সময় বিস্তর কথা বলি আমরা, ভালই বন্ধুত্ব আছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু আজ যেন কোথায় আন্‌সুর বাজছে।

"তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ফাদার।"

"সত্যিই বড় ক্লান্ত আমি, কিন্তু ক্লান্ত হলে তো চলবে না!"

"গরমের জন্যে হচ্ছে।"

"না, এই তো সবে বসন্ত শুরু হল। আসলে ভীষণ অবসাদ এসেছে।"

"যুদ্ধে অনীহা এসেছে তোমার?"

"ঠিক অনীহা নয়, তবে যুদ্ধকে আমি চিরদিনই ঘৃণা করি।"

"আমিও যুদ্ধকে উপভোগ করি না।" জবাব দিলাম আমি।

ঘাড় নেড়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল পাদ্রি।

"আসলে যুদ্ধটা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও না। তোমাদের কোনও অনুভূতি নেই। আমাকে মার্জনা করো, তুমি তো জখম হয়ে পড়ে আছ—!"

"ওটা তো একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা।"

"তবু এই জখম হয়েও যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। আমিও সব কিছু দেখতে পাই না, তবু আমি অন্তরে অনুভব করি—কী-যেন একটা ভয়াবহ পরিণতি আছে এর শেষে।"

"জখম হওয়ার ঠিক আগে আমরাও এই কথাই আলোচনা করছিলাম। পাসিনি-ই বলছিল।"

গেলাসটা নামিয়ে রাখল পাদ্রি। কী-যেন ভাবছে।

তারপর বলল,

"ওদের আমি জানি—কারণ, আমিও ওদেরই মতো।"

"তবু তুমি ওদের থেকে আলাদা।"

"সত্যিই আমি ওই সাধারণেরই দলের।"

"অফিসাররাও তো কিছু বোঝে না।"

"অনেকে বোঝে, অনেকে খুব কোমল প্রকৃতির—আমাদের চেয়েও বেশি অনুভব করে।"

"তবু ওদের বেশির ভাগই অন্য রকম।"

"শিক্ষা নয়, অর্থ নয়, নিজের মনের মধ্যে এই যে নিজেকে জানা—এটা একেবারেই অন্য ব্যাপার। অর্থ বা শিক্ষা থাকলেও পাসিনির মতো মানুষ কখনও অফিসার হতে চাইত না।"

"কিন্তু তুমি তো অফিসারদের দলেই পড়ো! আমিও তো অফিসার।"

"না, আদতে আমি তা নই। আর তুমি তো ইতালিয়ানই নও, বিদেশি। তবে সাধারণ মানুষের থেকে অফিসারদের সঙ্গেই তোমার মনের মিল বেশি।"

"ফারাকটা কোথায়?"

"সেটা বলা সহজ নয়। একদল লোক যুদ্ধ বাধায়—এদেশে এরকম লোক প্রচুর আছে। আবার অন্য একদল লোক যুদ্ধ চায় না।"

"কিন্তু ওই প্রথম দলের লোকেরা এদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করে।"

"ঠিক তাই।"

"আর আমি তাদের সাহায্য করছি।"

"তুমি বিদেশি, তোমার নিজের দেশের ভক্ত।"

"আচ্ছা, যারা যুদ্ধ বাধাতে চায় না, তারা কি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে?"

"বলতে পারব না।"

আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল পাদ্রি, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললাম,

"তারা কী কখনও যুদ্ধ থামাতে পেরেছে?"

"থামানোর জন্যে তো কখনও একজোট হয়নি তারা। আর দল বেঁধে থাকলেও তাদের নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

"তার মানে কোনও আশা নেই?"

"আশার মৃত্যু নেই। তবে মাঝেমাঝে আমিও হতাশ হয়ে পড়ি। সর্বদাই চেষ্টা করি আশা বজায় রাখতে, তবু মাঝেমধ্যে যেন আর পারি না।"

"হয়তো যুদ্ধ থেমে যাবে।"

"সেটাই আশা করি।"

"তুমি তখন কী করবে?"

"পারলে আব্রুৎসিতে ফিরে যাব।" ওর পিঙ্গল মুখটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে।

আমি বললাম,

"তুমি আব্রুৎসিকে ভালবাসো, না?"

"হ্যাঁ, ভীষণ ভালবাসি।"

"তাহলে তোমার যাওয়াই উচিত।"

"ওখানে থাকতে পারলে আমি খুব সুখী হব। ওখানে থেকে ঈশ্বরকে ভালবাসব, তাঁর সেবা করব।"

"আর সবার কাছ থেকে সম্মান পাবে।"

"তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার দেশের লোকেরা বোঝে যে-মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে, সে আদৌ ইয়ার্কির পাত্র নয়।"

"বুঝেছি।"

আমার দিকে চেয়ে হাসল পাদ্রি,

"বুঝেছ, কিন্তু তুমি তো ঈশ্বরকে ভালবাসো না।"

"তা বাসি না।"

"এতটুকুও ভালবাসো না তাঁকে?"

"রাত্রে মাঝেমধ্যে ভয় পাই তাঁকে।"

"কিন্তু ভালবাসা তোমার উচিত।"

"আমি কাউকেই তেমন ভালবাসি না।"

পাদ্রি বলল, "না, ভালবাসো। রাতের পর রাত যে-সব অভিজ্ঞতা তুমি অর্জন করেছ, তার যে-বৃত্তান্ত আমায় বলেছ, তাকে ভালবাসা বলে না—তাকে বলে কাম, সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার। ভালবাসলে তার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে হয়। তার জন্যে ত্যাগ করতে, তার সেবা করতে ইচ্ছে হয়।"

"আমি তো ভালবাসি না।"

"ভালবাসবে। আমি জানি তুমি ভালবাসবে। আর তখন তুমি সুখী হবে।"

"আমি তো সুখীই, সব সময়েই সুখী থাকি আমি।"

"সে অন্য জিনিস। যতক্ষণ ভালবাসা না পাচ্ছ, ততক্ষণ বুঝতে পারবে না।"

"ঠিক আছে, যদি কোনওদিন পাই, তোমায় জানাব।"

"আমি অনেকক্ষণ আছি আর বড্ড বেশি বকবক করছি।"

দেরি করেছে বলে সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠল ও।

ওকে বললাম,

"যেয়ো না। আচ্ছা, মেয়েদের ভালবাসা সম্বন্ধে তোমার কী মত? আমি যদি কোনও মেয়েকে সত্যিই ভালবাসি, তাহলে সেই ভালবাসাও কি ওরকমই হবে?"

"এ-ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আমি কখনও মেয়েদের ভালবাসি না।"

"তোমার মাকে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই, মাকে ভালবেসেছি তো বটেই!"

"তুমি কি বরাবরই ঈশ্বরকে ভালবাসো?"

"একেবারে ছোটবেলা থেকেই।"

কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম,

"তুমি খুব চমৎকার ছেলে।"

"ছেলে তো বটে, কিন্তু ডাকো তো ফাদার বলে!"

"ওটা ভদ্রতা।"

একটু হেসে পাদ্রি বলল, "এবার সত্যিই যেতে হবে।" তারপর জানতে চাইল,

"আমাকে তোমার কোনও দরকার নেই তো?"

"শুধু গল্প করার জন্যে দরকার।"

"মেসের সবাইকে তোমার অভিনন্দন জানাব।"

"তোমার উপহারগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।"

"ও কিছু না।"

"আবার দেখতে এসো কিন্তু।"

"আসব। আচ্ছা, চলি এখন।"

আমার হাতটা চাপড়ে দিল পাদ্রি।

"চিআও!" দেশি ভাষায় বিদায় জানালাম।

"চিআও!" জবাব দিল ও।

পাদ্রি চলে যাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে শুয়ে ওর কথাই ভাবতে লাগলাম—ওর কথা, ওর আব্রুৎসির বসন্তকালের কথা, মানুষকে মানুষের ভালবাসার কথা, অতিথিবৎসল সরল চাষিদের কথা। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেদিন সকালে আমাদের ওয়ার্ডের মেজর জিজ্ঞেস করলেন, আমি পরের দিন বাইরে যেতে পারব কিনা। বললাম, পারব। তিনি জানালেন তা হলে তাঁরা আমাকে পরের দিন ভোরেই জাহাজে করে পাঠিয়ে দেবেন, আর গরম বেশি পড়ার আগে জাহাজে যেতে ভালই লাগবে।

ডাক্তাররা ভাল লোক, আর বেশ দক্ষ বলেই মনে হল। আমাকে মিলানে পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ওঁরা, কারণ ওখানে এক্স-রে'র ব্যবস্থাটা অনেক ভাল, উপরন্তু অপারেশনের পর চিকিৎসাটাও ওখানেই ভাল হবে। আমিও মিলানেই যেতে চেয়েছিলাম।

ওরা এখান থেকে আহতদের দ্রুত সরিয়ে দিতে চাইছে, কারণ আবার আক্রমণ শুরু হলেই হাসপাতালে জায়গার সমস্যা দেখা দেবে।

হাসপাতাল ছাড়ার আগের রাতে আমাদের মেসের মেজরকে নিয়ে রিনাল্‌দি এল। ওরা জানাল মিলানে একটা নতুন আমেরিকান হাসপাতাল খোলা হয়েছে, সেখানেই পাঠানো হবে আমাকে। কয়েকটা অ্যাম্বুল্যান্স দলেরও সেখানে যাওয়ার কথা আছে। ইতালিতে যুদ্ধরত সব আমেরিকান এবং এই অ্যাম্বুল্যান্স দলগুলোকে প্রয়োজনে দেখাশোনা করবে এই হাসপাতাল। রেড ক্রসের বহু আমেরিকান আছে ইতালিতে।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে করেনি। আমেরিকা যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করবে, সে-ব্যাপারে ইতালিবাসীরা নিশ্চিত। তাই কোনও আমেরিকান এলেই, এমনকী সে রেড ক্রসের লোক হলেও, ওরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের এই যুদ্ধ ঘোষণা সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইল ওরা। আমি বললাম, কয়েক দিনের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার

বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করবেন তিনি। অবশ্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের কী অভিযোগ সেটা আমার জানা নেই, তবুও জার্মানির বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় আমার। ওরা জানতে চাইল, আমরা টার্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব কিনা। বললাম, সে-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে, কারণ টার্কি হচ্ছে আমাদের জাতীয় পাখি। কিন্তু রসিকতাটার ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ এমন বিশ্রী হয়ে গেল যে ওরা বেশ বিভ্রান্ত এবং সন্দিহান হয়ে উঠল। তাই ভুল শোধরাতে তাড়াতাড়ি বললাম—সম্ভবত টার্কির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। আর বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে? ইতিমধ্যে বেশ কয়েক গ্লাস সুরা পান করা হয়ে গেছে। বললাম—শুধু বুলগেরিয়াই নয়, আমরা জাপানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করব। ওরা বলল, কিন্তু জাপান তো ইংল্যান্ডের মিত্র। তা হলেও হতচ্ছাড়া ইংরেজদের বিশ্বাস করা যায় না। জাপানিরা হাওয়াই দখল করতে চায়। হাওয়াই কোথায়? প্রশান্ত মহাসাগরে। জাপানিরা ওটা দখল করতে চাইবে কেন? বললাম, সত্যিই চায় না, এসব আসলে গুজব। জাপানিরা অপূর্ব জাত, ছোটখাটো শরীর, নাচতে ভালবাসে, হালকা মদ খেতে ভালবাসে। মেজর বললেন, ঠিক ফরাসিদের মতো। রিনাল্‌দি বলল, আমরা ফরাসিদের থেকে নিস্ আর সাভোয়া নিয়ে নেব। মেজর বললেন, কর্সিকা আর আড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলভাগের সবটাই দখল করে নেব। রোমের সেই পুরনো বিজয়-গৌরবের দিনে ফিরে যাবে ইতালি। আমি বললাম—আমার রোম ভাল লাগে না, ভীষণ গরম আর মাছি! তোমার রোম ভাল লাগে না? হ্যাঁ, লাগে; সর্বজাতির জন্মদাত্রী রোম। টাইবার নদীর স্তন্যপানপুষ্ট রোমুলাসকে আমি কখনও ভুলতে পারব না। মানে? মানে কিছু না—চলো সবাই রোমে চলে যাই, চলো আজ রাতেই রোমে চলে যাই—আর কখনও ফিরব না। মেজর বললেন—রোম এক চমৎকার শহর। আমি বললাম, সর্বজাতির পিতামাতা রোম। রিনাল্‌দি বলল—রোমা তো স্ত্রীলিঙ্গ, পিতা হতে পারে না। তাহলে পিতা কে? পবিত্র আত্মা? ঈশ্বরনিন্দা কোরো না। আমি ঈশ্বরনিন্দা করছি না, তথ্য জানতে চাইছি। খোকাবাবু, তোমার নেশা হয়েছে। কে আমাকে নেশা করালো? আমি করিয়েছি—বললেন মেজর—আমি তোমায় মাতাল করেছি, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি আর আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমি বললাম—পুরোদস্তুর যোগ দিয়েছে। রিনাল্‌দি বলল—খোকাবাবু, কাল সকালে তুমি চলে যাচ্ছ। আমি বললাম রোমে যাব। না, মিলানে—বললেন মেজর—মিলানে, সেখানে আছে ক্রিস্টাল প্যালেস, আছে কোভা, কাম্পারি, বিফি, গালেরিয়া; আহা, কী সৌভাগ্য তোমার! মহীয়সী ইতালি—বললাম আমি—ওখানে জর্জের কাছ থেকে টাকা ধার করব। রিনাল্‌দি বলল—স্কালায় যেয়ো। আমি বললাম—রোজ যাব। রোজ রাতে যাওয়ার খরচ জোগাতে পারবে না—মেজর বললেন।

ওখানের প্রবেশমূল্য খুব বেশি। ঠাকুর্দার নামে হুন্ডি কাটব। সে কী? হ্যাঁ, হয় টাকা দেবে, নয়তো আমি জেলে যাব। ব্যাঙ্কের কানিংহামও তাই করে। আমি তো ওই হুন্ডি কেটেই চালাচ্ছি। ইতালিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিচ্ছে যে দেশপ্রেমিক নাতি, কোনও ঠাকুর্দা কি তাকে জেলে পাঠাতে পারে? আমেরিকার গ্যারিবল্ডি দীর্ঘজীবী হোক—রিনাল্‌দি বলল। হুন্ডি বেঁচে থাক—আমি বললাম। এবার আমাদের চুপ করা দরকার—মেজর বললেন। ইতিমধ্যে কয়েকবার গোলমাল করতে বারণ করা হয়েছে। তুমি কি সত্যিই কাল যাবে? জানতে চাইলেন মেজর। বলছি তো ও আমেরিকান হাসপাতালে যাচ্ছে— রিনাল্‌দি বলল—সুন্দরী নার্সদের কাছে। আমাদের এখানকার দাড়িওয়ালা নার্স নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, আমেরিকান হাসপাতাল—বললেন মেজর। আমি বললাম—দাড়ি আমার লাগে না। কারুর যদি দাড়ি রাখার ইচ্ছে হয় রাখবে না কেন? তুমি কেন দাড়ি রাখো না, সিনর মেগ্‌গোরি? গ্যাস-মুখোশ ঢুকবে না বলে। হ্যাঁ, ঢুকবে। গ্যাস-মুখোশে সব ঢুকে যায়—একবার আমি গ্যাস-মুখোশে বমি করেছিলাম। চেঁচিয়ো না খোকাবাবু, রিনাল্‌দি বলল—সবাই জানে তুমি যুদ্ধে গিয়েছিলে। তারপর একটু থেমে বলল—সোনাবাবু, তুমি চলে গেলে আমি কী করব ভাই? মেজর বললেন—এবার যেতে হবে। এখন যত সব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার! তোমাকে একটা দারুণ খবর দিচ্ছি। তোমার ইংরেজ মহিলা, যার কাছে রাতে যেতে তুমি ইংরেজদের হাসপাতালে, সে-ও মিলানে যাচ্ছে। আরও-একজন নার্সের সঙ্গে আমেরিকান হাসপাতালে যাবে সে। আজ সকালে ওদের প্রধানার সঙ্গে কথা বলেছি আমি। এখানে যুদ্ধ-সীমান্তে মেয়ে বেশি হয়ে গেছে ওদের। খবরটা কেমন লাগল হে? ভাল না? রিনাল্‌দি বললে—একটা বড় শহরে থাকবে, আর ইংরেজ প্রেয়সীর সেবা পাবে। হায় রে, আমি কেন জখম হলাম না! হতেও পারো—আমি বললাম।

এবার আমাদের যেতেই হবে—বললেন মেজর—মদ খেয়ে, হইচই করে ফেদেরিকোকে খুব বিরক্ত করছি আমরা। আর একটু থাকো না। না, এবার উঠতেই হবে। বিদায়—গুড লাক—চিআও! চিআও—চিআও! তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, খোকাবাবু—রিনাল্‌দি চুমু খেল আমায়—ওঃ, লাইজলের গন্ধ! বিদায়—বিদায়—আমার পিঠ চাপড়ালেন মেজর। পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল ওরা। প্রচুর নেশা হয়েছিল, তবুও ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে যাত্রা করে আটচল্লিশ ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার পর মিলানে পৌঁছলাম। যাত্রাটা খুব বিশ্রী ছিল। মেস্ত্রের এধারে অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হয়েছিল আমাদের, বাচ্চারা এসে উঁকি দিয়ে আমাদের দেখছিল। একটা ছোট ছেলেকে এক বোতল কগনাক আনতে পাঠলাম, সে ফিরে এসে জানাল গ্রাপ্পা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাই-ই আনতে বললাম। সে বোতলটা নিয়ে আসতে ফেরত খুচরোটা তাকে আর

আমার পাশের লোকটিকে বখশিশ দিয়ে, আকণ্ঠ মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভিসেন্‌জা-য়। খুব অসুস্থ লাগছে, মেঝেয় পড়ে আছি। সেটা অবশ্য খুব-একটা বড় ব্যাপার নয়, কেননা ওদিকের লোকটিও বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়ে মেঝেয় পড়ে থেকেছে। খানিক পরে মনে হল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ট্রেনের বাইরের করিডরে একজন সৈনিক টহল দিচ্ছিল। ভেরোনা-য় পৌঁছে তাকে বলতে সে জল এনে দিল। জর্জেত্তি, মানে অন্য যে-ছেলেটা মাতাল হয়ে পড়ে ছিল, তাকে ডেকে জল খেতে বললাম। সে বলল জলটা তার কাঁধে ঢেলে দিতে। বলে ঘুমিয়ে পড়ল। সৈনিকটিকে এক পেনি বখশিশ দিতে গেলাম, সে নিল না, উল্টে একটা কমলালেবু এনে দিল আমাকে। করিডরে টহল দিচ্ছে সৈনিকটি, কমলালেবুটা খেতে খেতে দেখতে লাগলাম তাকে। খানিক পরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল ট্রেনটা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ভোরে মিলানে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নামিয়ে গুদামখানার উঠোনে ফেলে রাখা হল আমাদের। তারপর একটা অ্যাম্বুল্যান্স এসে আমাকে নিয়ে গেল আমেরিকান হাসপাতালে। অ্যাম্বুল্যান্সের স্ট্রেচারে শুয়ে যাওয়ার সময় শহরের কোন্ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারিনি। স্ট্রেচার নামাতে দেখতে পেলাম একটা বাজার, আর একটা খোলা মদের দোকানে ঝাঁট দিচ্ছে একটি মেয়ে। রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে। বাতাসে ভোরের সৌরভ।

স্ট্রেচার নামিয়ে হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে একজন লোককে ডেকে আনল বাহকেরা। লোকটির মাথায় দারোয়ানের টুপি, মুখে পাকা গোঁফ, পরনে হাফহাতা শার্ট। লিফটের ভেতরে স্ট্রেচার ঢুকবে না। কাজেই ওরা আলোচনা শুরু করল—আমাকে স্ট্রেচারে সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে যাবে, নাকি স্ট্রেচার রেখে দিয়ে শুধু মানুষটাকেই তুলবে লিফটে করে। চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনি আমি। অবশেষে ওরা মানুষটাকে লিফটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে স্ট্রেচার থেকে তুলে নিল আমাকে।

আমি বললাম, "সাবধানে তোলো, দেখেশুনে।"

ছোট লিফটের মধ্যে এত লোকে বেশ ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। জায়গার অভাবে আমার পা-দুটো বাঁকিয়ে ধরেছিল ওরা, ফলে ভীষণ ব্যথা লাগছিল।

বললাম, "পাগুলো সোজা করে ধরো।"

"হচ্ছে না, সিনর তেনেন্তে, জায়গা বড় কম," একজন বলল। লোকটি আমাকে বগলের তলা দিয়ে ধরেছিল, আমার হাতদুটো দিয়ে তার গলা জড়ানো। তার নিঃশ্বাসে রসুন আর মদের একটা মেশামেশি বিশ্রী গন্ধ।

অন্য লোকটি বলল, "অস্থির হবেন না।"

"কোন্ হারামজাদা বলে আমি অস্থির হচ্ছি!" গালাগাল দিয়ে উঠলাম।

"বলছি অস্থির হবেন না।" পায়ের দিকের লোকটি আবার বলল।

লিফটের দরজা বন্ধ করে পাঁচতলার বোতাম টিপে দিল দারোয়ান। তার মুখে চিন্তার ছায়া। লিফট ধীরে ধীরে উঠছে।

রসুনের গন্ধওয়ালা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "খুব ভারী লাগছে?"

"ও কিছু না।" উত্তর দিল সে। বেচারার সারা মুখে ঘাম, গলার স্বর করুণ।

পাঁচতলায় এসে থামল লিফট। পায়ের দিকের লোকটি দরজা খুলে আগে বের হল। লিফটের সামনে বারান্দা, তার পাশে সারি সারি অনেকগুলো দরজা, পিতলের হাতল লাগানো। পায়ের দিকের লোকটি একটা বোতাম টিপে ঘণ্টি বাজাল, ঘরের

ভেতরেও ঘন্টির শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু কেউ এল না। ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দারোয়ানটি। স্ট্রেচারবাহকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে,

"এরা সব কোথায়?"

"কী জানি। ওরা তো নীচে থাকে।" জবাব দিল দারোয়ান।

"কাউকে ডেকে নিয়ে এসো।"

দারোয়ান ঘণ্টি বাজাল, দরজায় টোকা দিল, তারপর দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে একজন বয়স্কা মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। মহিলার চোখে চশমা, পরনে নার্সের পোশাক। তিনি বললেন,

"আমি তো ইতালিয়ান ভাষা জানি না।"

আমি বললাম, "আমি ইংরেজি বলতে পারি। আমাকে কোথায় রাখা হবে?"

"একটা ঘরও ঠিক নেই। কোনও রুগী আসার খবর পাইনি আমরা।"

মাথার চুলগুলো উল্টে চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি।

"যে-কোনও একটা ঘর দেখিয়ে দিন, যাতে ওরা আমায় নামিয়ে রাখতে পারে।"

"আমি জানি না, কোনও খবর নেই, কিচ্ছু নেই, অমনি-অমনি একটা ঘরে রাখলেই হল!"

"যে-কোনও ঘর হলেই চলবে।"

তারপরে দারোয়ানটিকে ইতালীয় ভাষায় বললাম,

"একটা খালি ঘর দ্যাখো তো!"

সে বলল, "সব ঘরই খালি, আপনিই এখানে প্রথম রুগী।" টুপিটা হাতে নিয়ে নার্সটির মুখের দিকে তাকাল সে।

"ধর্মের দোহাই, যে-কোনও একটা ঘরে নিয়ে চলো আমাকে।"

মোড়া অবস্থায় থাকায় ভীষণ ব্যথা লাগছে পায়ে, হাড়ের ভেতর দিয়ে কনকনিয়ে উঠছে ব্যথাটা। দারোয়ান দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল, তার পিছনে গেলেন নার্সটি। একটু পরেই ফিরে এসে দারোয়ান বলল,

"আমার সঙ্গে এসো।"

লম্বা একটা হলঘরের মধ্যে দিয়ে একটা ঘরে আমাকে নিয়ে গেল ওরা। জানলা-বন্ধ ঘরটাতে নতুন আসবাবপত্রের গন্ধ। ঘরের মধ্যে একটা খাট আর আয়না-লাগানো বিশাল একটা আলমারি। বাহকেরা বিছানায় শুইয়ে দিল আমাকে। নার্সটি বললেন,

"চাদর-টাদর দিতে পারব না এখন, সব চাবি-বন্ধ আছে।"

কোনও উত্তর দিলাম না। ওঁর সঙ্গে কথা না বলে দরোয়ানকে বললাম,

"বোতাম-আঁটা পকেটে টাকা আছে, বার করো তো।" লোকটি টাকা বার করল।

স্ট্রেচারবাহক দু'জন টুপি হাতে নিয়ে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দারোয়ানকে বললাম,

"ওদের দু'জনকে পাঁচ লিরে করে দিয়ে দাও, আর তোমার জন্যেও পাঁচ লিরে রাখো। অন্য পকেটে আমার কাগজপত্র আছে, ওগুলো নার্সটিকে দিতে পারো।"

স্ট্রেচারবাহকরা ধন্যবাদ দিয়ে অভিবাদন জানাল, আমিও তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালাম। তারা আবার অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল। নার্সটিকে বললাম,

"কাগজে আমার অবস্থা আর চিকিৎসার বিবরণ লেখা আছে।"

ভাঁজ-করা কাগজ তিনটে নিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন মহিলা। তারপর বললেন, "কী করব বুঝতে পারছি না। ইতালিয়ান ভাষা পড়তে পারি না, ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া কিছু করতেও পারব না আমি।"

কাগজগুলো অ্যাপ্রনের পকেটে পুরে কেঁদে ফেললেন তিনি। কান্নাভেজা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

"আপনি কি আমেরিকান?"

"হ্যাঁ, আমেরিকান। কাগজগুলো বরং খাটের পাশে টেবিলের ওপর রেখে দিন।"

ঘরের ভেতরটা বেশ ঠান্ডা আধো-অন্ধকার। খাটে শুয়ে আলমারির আয়নাটা চোখে পড়ে কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্বটা দেখা যায় না।

দারোয়ানটি তখনও আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মিষ্টি সহায়তার ছাপ। ওকে বললাম,

"এবার তুমি যেতে পারো।"

নার্সটিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তাঁর নাম মিসেস ওয়াকার। বললাম,

"মিসেস ওয়াকার, আপনি এখন যেতে পারেন, আমি একটু ঘুমোব।"

ঘরের মধ্যে একা শুয়ে আছি। ঠান্ডা, শান্ত পরিবেশ, হাসপাতালের গন্ধ নেই। ব্যথাটা একটু কমেছে, নরম গদিতে আয়েশ করে শুয়ে সেটাই উপভোগ করছি। বেশ তেষ্টা পেয়েছে। বিছানার পাশে ঝোলানো ঘণ্টার দড়িতে টান দিলাম। কেউ এল না। অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পডলাম।

ঘুম ভেঙে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকেছে ঘরে। ঘরের মাঝখানে বিশাল আলমারিটা, একপাশে দুটো চেয়ার, দেওয়ালগুলো খালি। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ময়লা ব্যান্ডেজ-বাঁধা পাদুটো বিছানা থেকে বেরিয়ে আছে। সাবধান থাকলাম যাতে পাদুটো না নড়ে। খুব তেষ্টা পেয়েছিল—হাত বাড়িয়ে ঘণ্টা টিপলাম। দরজা খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখি, দরজার সামনে একজন নার্স, সুন্দরী তরুণী। বললাম,

"সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি। বলল,

"আমরা এখনও ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারিনি—তিনি লেক কমোতে গেছেন। রুগী আসার খবরটা কারুরই জানা ছিল না। যাক সে-কথা। আপনার কী হয়েছে?"

"দুটো পা জখম হয়েছে, মাথায় চোট লেগেছে।"

"আপনার নাম?"

"হেনরি—ফ্রেডারিক হেনরি।"

"আমি আপনাকে সাফসুতরো করে দিচ্ছি, কিন্তু ডাক্তারবাবু না-আসা পর্যন্ত আপনার ব্যান্ডেজের কিছু করা যাবে না।"

"মিস বার্কলে কি এখানে আছেন?"

"না, ও-নামে এখানে কেউ নেই।"

"আমাকে দেখেই যিনি কেঁদে ফেললেন, উনি কে?"

নার্সটি হেসে বলল, "ও হচ্ছে মিসেস ওয়াকার। ওর রাতের ডিউটি ছিল। রুগী আসবে জানত না, তাই ঘুম দিচ্ছিল।"

কথা বলতে বলতে নার্সটি আমার পোশাক খুলে দিল একে একে। সব খোলা হয়ে যেতে—অবশ্য ব্যান্ডেজ বাদে—খুব সাবধানে আমার সারা শরীর ধুয়ে সাফ করে দিল। মাথায় একটা পট্টি বাঁধা ছিল, তার পাশ দিয়েও সুন্দরভাবে ধুইয়ে দিল। খুব আরাম হচ্ছিল।

"কোথায় জখম হলেন?"

"আইসোনজো-তে—প্লাভার উত্তরে।"

"সেটা কোথায়?"

"গোরিজিয়ার উত্তরে।"

বুঝতে পারছিলাম, কোনও নামটাই ও বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল,

"খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"না, এখন তেমন যন্ত্রণা নেই।"

আমার মুখের মধ্যে একটা থার্মোমিটার গুঁজে দিল নার্সটি। আমি বললাম,

"ইতালিয়ানরা বগলে দেয়।"

"কথা বলবেন না।"

থার্মোমিটার দেখে ঝাঁকিয়ে পারা নামিয়ে দিল।

জানতে চাইলাম, "কত উঠেছে?"

"সেটা আপনাকে জানতে হবে না।"

"বলুনই না!"

"প্রায় স্বাভাবিক।"

"আমার কখনও জ্বর হয়নি। পা তো পুরনো লোহায় ভর্তি হয়ে আছে।"

"মানে?"

"ট্রেঞ্চ-মর্টার গোলার টুকরোয় ভর্তি, তার মধ্যে পুরনো লোহালক্কড় থাকে।"

নার্সটি মাথা নেড়ে একটু হেসে বলল,

"শরীরে বাইরের কিছু ঢুকে থাকলে পা ফুলে জ্বর হত।"

বললাম, "যখন বেরোবে তখন বুঝতে পারবেন।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সকালের বয়স্কা নার্সটিকে নিয়ে ফিরে এল সে। আমাকে বিছানায় শুইয়ে রেখেই দু'জনে মিলে বিছানাটা ভাল করে পেতে দিল। এটা আমার কাছে একটা নতুন ব্যাপার, খুব অবাক হলাম। বললাম,

"এই হাসপাতালের দায়িত্বে কে আছেন?"

"মিস ভ্যান ক্যাম্পেন।"

"মোট ক'জন নার্স আছে?"

"আমরা এই দু'জন মাত্র।"

"আর বাড়বে না?"

"হ্যাঁ, আরও কয়েকজন আসবে।"

"কবে?"

"তা জানি না। রুগীদের এত কথা বলতে নেই।"

"আমি রুগী নই, আহত।"

ওদের বিছানা করা শেষ হল। এর মধ্যে মিসেস ওয়াকার জামা আর পাজামা নিয়ে এসে পরিয়ে দিয়েছেন আমাকে। পোশাক পরে, পরিষ্কার চাদর গায়ে দিয়ে, পরিষ্কার চাদরে শুয়ে খুব তৃপ্তি হল।

বললাম, "তোমরা খুব যত্ন করছ আমার।"

আমার কথা শুনে মিস গেগ নামে তরুণী নার্সটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

বললাম, "একটু জল খেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন। সকালের খাবারও খেতে পারেন।"

"না, খাবারের দরকার নেই। খড়খড়িগুলো খুলে দেওয়া যায় না?"

ঘরের মধ্যে আলো কম ছিল, খড়খড়িগুলো খুলে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা ভরে গেল। ঘরের বাইরে একটা বারান্দা, তার ওপারে চোখে পড়ে সামনের বাড়িগুলোর লাল টালির ছাদ আর চিমনির চুড়ো। তার ওপরে অনন্ত সুনীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের দল।

"অন্য নার্সরা কবে আসবে তোমরা জানো না?"

"কেন, আমরা কি যত্ন করছি না?"

"তোমরা খুব ভাল।"

বিছানায় শুয়ে খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়েছিলাম বারান্দার দিকে। সেদিকে তাকিয়েই বললাম—

"ডাক্তার কখন আসবেন?"

"ফিরলেই আসবেন। আমরা লেক কমোতে ফোন করার চেষ্টা করছি।"

"এখানে অন্য কোনও ডাক্তার নেই?"

"এ-হাসপাতালের উনিই একমাত্র ডাক্তার।"

একটা গ্লাস আর জলের কুঁজো নিয়ে এল মিস গেগ। তিন গ্লাস জল খেলাম। ওরা বেরিয়ে যেতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুপুরের খাওয়ার পর বিকেলের দিকে হাসপাতালের প্রধানা মিস ভ্যান ক্যাম্পেন আমাকে দেখতে এলেন। প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে অপছন্দ করলাম আমরা। ছোটখাটো মহিলাটি সব বিষয়েই সন্দেহপ্রবণ এবং নিজের পদের চেয়ে যেন একটু বেশিই মর্যাদাবোধসম্পন্না। নানান প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমি যে ইতালিয়ানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক মনে হল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি কি খাবারের সঙ্গে একটু মদ খেতে পারি?"

"ডাক্তার যদি বলেন, তবেই পারবেন।"

"তিনি না-আসা পর্যন্ত হবে না?"

"একেবারেই না।"

"তিনি কি আদৌ আসবেন?"

"লেক কমোতে ফোন করেছি আমরা।" কথাটা বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই মিস গেগ এল। খুব সুকৌশলে আমার একটা কাজ করে দিয়ে সে বলল,

"মিস ভ্যান ক্যাম্পেনের সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করেছেন কেন?"

"ঠিক ইচ্ছে করে করিনি, তবে উনি খুব মেজাজ দেখাচ্ছিলেন।"

"বলছিল, আপনি নাকি উদ্ধত আর রূঢ় ভাবে কথা বলেছেন!"

"একেবারেই না। কিন্তু বিনা ডাক্তারে এভাবে হাসপাতাল রাখার মানেটা কী?"

"ডাক্তার আসছেন। লেক কমোতে তাঁকে ফোন করা হয়েছে।"

"ডাক্তারবাবু কি সেখানে সাঁতার কাটেন নাকি?"

"না, ওখানে ওঁর একটা ক্লিনিক আছে।"

"তা অন্য কোনও ডাক্তারের বন্দোবস্ত করা হয় না কেন?"

"চুপ, চুপ! লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকুন, ডাক্তার এসে যাবেন।"

দারোয়ানটিকে ডেকে পাঠালাম। সে আসতে তাকে ইতালীয় ভাষায় বললাম, এক বোতল সিন্‌জানো আর এক বোতল চিয়ান্তি কিনে আনতে, সেই সঙ্গে সান্ধ্য খবরের কাগজ। খবরের কাগজে মুড়ে বোতলদুটো নিয়ে এল দারোয়ান, বোতলের ছিপি আলগা করে বিছানার তলায় রেখে গেল। সবাই চলে যাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধের খবর পড়লাম, তারপর হাত বাড়িয়ে খাটের নীচে থেকে সিন্‌জানোর বোতলটা নিয়ে এসে পেটের ওপর রাখলাম। বোতলের ঠান্ডা কাচটা খোলা পেটে লাগছে, পেটে বোতলের তলার গোল দাগ পড়ছে। একটু একটু করে সিন্‌জানো পান করছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি—ছাদগুলোর ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সোয়ালো পাখির দল, বিশাল কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে বাজপাখি। দেখছি আর সিন্‌জানোয় চুমুক দিচ্ছি। এই সময় মিস গেগ গ্লাসে কিছুটা ডিমে-ফেটানো মদ, মানে এগ নগ, নিয়ে হাজির হল। খাটের উল্টো দিকে মেঝেতে সিন্‌জানোর বোতলটা নামিয়ে রাখলাম।

মিস গেগ বলল,"মিস ভ্যান ক্যাম্পেন আপনার জন্যে এতে একটু শেরি দিয়ে দিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে অমন রুক্ষ আচরণ করা আপনার উচিত হয়নি। ওঁর বয়েস হয়েছে, তা ছাড়া এত বড় হাসপাতালের ভার সামলানো তো সহজ কথা নয়! মিস ওয়াকার বুড়ি হয়ে গেছেন, তাঁর কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পান না উনি।"

"না, সত্যিই ভদ্রমহিলা অতি চমৎকার মানুষ, ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো।" উত্তর দিলাম।

"আমি এখনই আপনার রাতের খাবার নিয়ে আসছি।"

"পরে আনলেও চলবে, আমার খিদে পায়নি।"

খাবার এনে আমার টেবিলে রেখে গেল। সামান্য কিছু খেলাম। তারপর শুয়ে পড়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের অন্ধকারের দিকে। আঁধারি আকাশে সার্চলাইটের দীর্ঘ রশ্মির চলাচল দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

চোখ মেলে দেখি ঘরে উজ্জ্বল রোদ ঝকঝক করছে। ঘুমের ঘোরে মনে হল আবার যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেছি। হাত-পা ছড়িয়ে শুতে গিয়ে পায়ে ব্যথা লাগল। চোখ মেলে পায়ের নোংরা ব্যান্ডেজটা দেখেই মনে পড়ল কোথায় আছি। হাত বাড়িয়ে ঘণ্টি বাজাতে ও-পাশের হলে কার যেন গলা শুনতে পেলাম, সেই সঙ্গে রবার-সোলের জুতোর হাল্কা পদধ্বনিও ভেসে এল। পদধ্বনিটা মিস গেগের। উজ্জ্বল আলোয় বয়েসটা কালকের চেয়ে বেশিই মনে হল, রূপটাও যেন একটু কম।

সে বলল, "সুপ্রভাত। রাতটা ভালভাবে কেটেছে তো?"

"হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ।" আমি বললাম, "আচ্ছা, একটা নাপিতের ব্যবস্থা করা যায় না?"

মিস গেগ বলল,

"আগে একবার ঘুরে গেছি। আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন—বিছানায় এইটা নিয়ে।"

আলমারির পাল্লা খুলে ভার্মুথের বোতলটা বার করে দেখাল। বোতলটা প্রায় শেষই হয়ে গেছলো। ও আবার বলল, "খাটের নীচে থেকে অন্য বোতলটাও এখানে সরিয়ে রেখেছি। আমার কাছে গ্লাস চাইলেন না কেন?"

"মনে হয়েছিল, বললে খেতে দেবে না।"

"আমিও না হয় আপনার সঙ্গে একটু খেতাম।"

"তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে।"

"একা একা মদ খাওয়া একেবারেই ভাল নয়। এমন কাজ আর করবেন না।"

"ঠিক আছে।"

একটু থেমে মিস গেগ বলল,

"আপনার বন্ধু মিস বার্কলে এসেছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তবে আমার কিন্তু ওকে মোটেই ভাল লাগে না।"

"ঠিক ভাল লাগবে। ও খুব ভাল মেয়ে।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিল মিস গেগ,

"ভাল যে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।"

তারপর আবার বলল,

"একটু এপাশে ফিরতে পারবেন? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার আপনাকে পরিষ্কার করে দিই, তারপর খেতে দেব।" খানিকটা কাপড়, সাবান আর গরম জল দিয়ে ভাল করে সাফসুতরো করে দিল আমাকে।

"খাওয়ার আগে একটা নাপিত পাওয়া যাবে না?"

"আচ্ছা, দারোয়ানকে পাঠাচ্ছি নাপিত ডাকতে।" বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরে ফিরে এসে বলল, "ডাকতে গেছে।"

গরম জলের পাত্রে কাপড়টা ডুবিয়ে আবার নিজের কাজ শুরু করে দিল।

দারোয়ান একজন নাপিতকে নিয়ে এল। প্রায় বছর পঞ্চাশ বয়স লোকটির, মুখে পাকানো গোঁফ। মিস গেগ ততক্ষণে কাজ শেষ করে চলে গেছে। আমার মুখে সাবান লাগিয়ে বিনা বাক্যে ক্ষুর চালাতে শুরু করল নাপিতটি।

আমি বললাম, "ওহে, খবর-টবর কিছু বলো।"

"কীসের খবর?"

"যে-কোনও খবর। শহরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে।"

লোকটি জবাব দিল, "এখন যুদ্ধ চলছে, চারদিকে শত্রুর কান খাড়া হয়ে আছে।"

অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। লোকটি বলল,

"মুখ নাড়বেন না, চুপ করে বসুন।" তারপর ক্ষুর চালাতে চালাতে বলল,

"আমি কিছু বলব না।"

"কেন? ব্যাপারটা কী?"

"আমি ইতালিবাসী, শত্রুর সঙ্গে কোনও কথাই বলব না।"

চুপ করে রইলাম। যা করছে করুক—কে জানে পাগল কিনা! যত শিগগির সম্ভব ওর ক্ষুরের হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচি। ওর মুখটা একবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম। ও চেঁচিয়ে উঠল,

"হুঁশিয়ার, ক্ষুরটা কিন্তু ধারালো।"

কাজ হয়ে যেতে ওর পাওনা চুকিয়ে আরও আধ লিরে বখশিশ দিলাম। কিন্তু পয়সা ফিরিয়ে দিল লোকটা। বলল,

"ও আমি নেব না। যুদ্ধে না গেলেও আমি একজন ইতালিবাসী।"

"জাহান্নামে যাও তুমি। দূর হও এখান থেকে।"

"আপনার অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি।"

ক্ষুরটা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। পয়সাগুলো আমার টেবিলেই পড়ে রইল। ঘণ্টা বাজাতেই মিস গেগ এল। তাকে বললাম দারোয়ানকে ডাকতে। দারোয়ান এসে দাঁড়াল। হাসি চাপার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে।

"নাপিতটার কি মাথা খারাপ?"

"না সিনোরিনো, আসলে ওর একটু ভুল হয়েছে, সব কিছু ঠিক বোঝে না তো। ওর ধারণা আমি ওকে বলেছি আপনি একজন অস্ট্রিয়ান অফিসার।"

"তাই বলো!"

এবার জোরে হেসে উঠল দারোয়ান, "হো-হো-হো! লোকটা যা মজার মজার কথা বলছিল, আপনি একটু এদিক-ওদিক করলেই—", তর্জনীটা আড়াআড়িভাবে নিজের গলার ওপর দিয়ে চালিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কী হতে পারত। তারপর আবার হাসি চাপতে চাপতে বলতে লাগল, "হো-হো-হো! তারপর যখন বললাম যে আপনি অস্ট্রিয়ান নন, তখন, হো-হো-হো—।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "হো-হো-হো! আমার গলাটা কেটে রাখলে কী মজাই হত—হো-হো-হো!"

"না না সিনোরিনো, আসলে অস্ট্রিয়ান শুনে যা ভয় পেয়েছিল—হো-হো-হো!"

"আর হো-হো করতে হবে না, বিদেয় হও এখান থেকে।"

ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল দারোয়ান। হল-ঘরের ওপার থেকেও ওর হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে ভেসে আসছে কার যেন পায়ের শব্দ। দরজার দিকে ফিরে দেখি—ক্যাথারিন বার্কলে। ঘরে ঢুকে বিছানার সামনে চলে এল ক্যাথারিন।

"কী গো, কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করল ও। যৌবনের আভায় ওকে অপরূপা দেখাচ্ছে। মনে হল এত রূপ যেন আর কখনও দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গেই ভালবেসে ফেললাম ওকে—সমস্ত মনপ্রাণ যেন উছলে উঠল। ক্যাথারিন একবার দরজার দিকে দেখে নিল কেউ আছে কিনা, তারপর আমার বিছানায় বসে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। দু'হাতে ওকে আমার বুকের ওপর টেনে নিয়ে চুমু দিলাম, আমার বুকে ওর বুকের স্পন্দন অনুভব করলাম।

"রানি আমার, তুমি সত্যিই এলে তাহলে?" আবেগে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলাম আমি।

ও বলল, "আসাটা তেমন সমস্যার নয়, কিন্তু থাকাটা মুশকিল হবে।"

"তোমায় থাকতেই হবে, তুমি যে অপূর্ব! তুমি যে আমার সব!"

মনে হল যেন পাগল হয়ে যাব। বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই এসেছে ও—শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

ও বলল, "না! তোমার শরীর এখনও ঠিক হয়নি।"

"হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে, এসো।"

"না না, এখনও তুমি জোর পাওনি।"

"পেয়েছি। এসো সোনা!"

"তুমি আমাকে ভালবাসো?"

"সত্যিই ভালবাসি, তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে গেছি। দোহাই তোমার, এসো।"

"আমার বুকের মধ্যে কী হচ্ছে বুঝতে পারছ?"

"বুকের ভেতর যা-খুশি হোক, আমি তোমাকে চাই—তোমার জন্যে পাগল হয়ে গেছি আমি।"

"সত্যি ভালবাসো?"

"আর ওসব বোলো না। এসো, এসো ক্যাথারিন, সোনা আমার, এসো।"

"আসছি, এক মিনিট দাঁড়াও।"

"বেশ, দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

"না, তুমি পারবে না, এটা উচিত হবে না।"

"কথা বোলো না, এসো।"

খাটের পাশে চেয়ারে বসে আছে ক্যাথারিন। হলের দিকের দরজাটা খোলা। যাবতীয় উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেছে, গভীর তৃপ্তিতে ডুবে আছি আমি। এত আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি।

ক্যাথারিন বলল, "এবার বিশ্বাস হল তো যে তোমায় আমি ভালবাসি?"

"তুমি অতুলনীয়, অপরূপ! তোমাকে এখানে থাকতেই হবে, ওরা তোমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না কিছুতেই।"

"কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। ভীষণ পাগলামি হয়ে গেছে। এসব তুমি আর করতে পারবে না।"

"রাত্তিরে?"

"খুব সাবধানে থাকতে হবে। অন্যদের সামনে সতর্ক থাকবে।"

"থাকব।"

"তুমি খুব মিষ্টি। আমায় ভালবাসো তুমি? বলো!"

"ওসব আর বোলো না। ওতে আমার কী মনে হয় জানো না!"

"বেশ, আর বলব না। তোমায় কষ্ট দিতে চাই না আমি। এবার কিন্তু সত্যিই আমাকে যেতে হবে, কেমন?"

"আবার এক্ষুনি ফিরে আসবে।"

"সুযোগ পেলেই আসব।"

"বিদায়?"

"বিদায়, সোনা।"

চলে গেল ক্যাথারিন। ভগবান জানেন ওকে কখনও ভালবাসতে চাইনি, কোনও মেয়েরেই প্রেমে পড়তে চাইনি কখনও। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আমার মনপ্রাণ ওর প্রেমেই পূর্ণ হয়ে গেছে। মিলানের হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে এই নতুন সত্য অনুভব করছি, আর আকাশপাতাল চিন্তার খেলা চলেছে মাথার মধ্যে। এমন সময় মিস গেগ ঘরে এল।

"লেক কমো থেকে ডাক্তার ফোন করেছেন—তিনি আসছেন।"

"কখন এসে পৌঁছবেন?"

"বিকেলে।"

বিকেল পর্যন্ত নতুন কিছুই ঘটল না। রোগাটে চেহারার ছোটখাটো ডাক্তারটি যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট বিরক্তি অনুভব করছেন বলে মনে হল। আমার উরু থেকে ছোট ছোট লোহার প্রচুর টুকরো বের করতে করতে অত্যন্ত সংযত মার্জিত বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ

করলেন তিনি। আমার চোট-পাওয়া অঙ্গে খানিকক্ষণ খোঁচাখুঁচি করে কোমল প্রকৃতির মানুষটি হাঁপিয়ে পড়লেন। বললেন, চিমটে দিয়ে খুঁচিয়ে বোঝা যাচ্ছে না আরও টুকরো আছে কিনা, এক্স-রে করতে হবে।

মাগ্গিওরে হাসপাতালে এক্স-রে করা হল। ওখানের ডাক্তারটি খুব আমুদে আর কর্মঠ। আমার কাঁধটা একটু উঁচু করে এমন একটা ব্যবস্থা করলেন, যাতে আমি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পায়ের ভেতরকার লোহার টুকরোগুলো দেখতে পাই। ছবিটা পরে পাঠাবার কথা। ডাক্তার তাঁর নোটবইতে আমার নাম, বাহিনীর নাম আর দু'-একটা মনের কথা লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। ডাক্তার বললেন, লোহার টুকরোগুলো কুৎসিত আর মানুষের বর্বরতার নিদর্শন। বললেন, অস্ট্রিয়াবাসীরা কুত্তির বাচ্চা। জানতে চাইলেন, কতজন অস্ট্রিয়ানকে খতম করেছি আমি। আসলে একজনকেও করিনি, তবু তাঁকে খুশি করার জন্য জানালাম, বহু খতম করেছি। মিস গেগ আমার সঙ্গে গিয়েছিল। তার কোমর জড়িয়ে ধরে ডাক্তার বললেন, মিশরের রানি ক্লিওপেট্রার চেয়েও রূপসী সে।

অ্যাম্বুল্যান্সে করে আবার ছোট্ট হাসপাতালটাতে ফিরে এলাম, বিস্তর ধস্তাধস্তি করে আবার ওপরে এসে নিজের বিছানায় শুলাম। বিকেলের দিকে এক্স-রে'র ছবিগুলো এল। লাল রঙের খামের মধ্যে থেকে একটা একটা করে সেগুলো দেখাল আমাকে ক্যাথারিন। একবার ডান পা, একবার বাঁ পা করে দেখছিলাম দু'জনে। শেষে বললাম,

"যাক ও-সব, বিছানায় এসো।"

ও বলল, "না, এক মিনিটের জন্যে তোমাকে ছবিগুলো দেখাতে এসেছি শুধু।"

ও চলে গেল, আমি শুয়ে রইলাম। গরম লাগছিল, শুয়ে থেকে থেকে বিরক্তি ধরে গেছলো। দারোয়ানকে ডেকে খবরের কাগজ আনতে দিলাম, যে-ক'টা পাওয়া যায় নিয়ে আসে যেন। দারোয়ান ফিরে আসার আগেই এসে পড়লেন তিনজন ডাক্তার।

আমি দেখেছি, ডাক্তাররা যখনই নিজেরা পসার জমাতে পারেন না, তখনই পরস্পরের সাহচর্য আর সহযোগিতার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। যিনি অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন করতে ব্যর্থ হন, তিনি এমন একজন ডাক্তারের নাম সুপারিশ করেন যিনি টনসিল তুলতে অক্ষম। ঠিক তেমনই তিনজন ডাক্তার এলেন আমার ঘরে।

"এই সেই যুবক।" আমাদের কোমলহস্ত ডাক্তারটি বললেন। দাড়িওয়ালা লম্বা ডাক্তারটি সম্ভাষণ জানালেন আমাকে। তৃতীয়জনের হাতে আমার এক্স-রে'র ছবিগুলো। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাড়িওয়ালা ডাক্তারটি বললেন,

"ব্যান্ডেজটা খুলব?"

"নিশ্চয়ই। নার্স, ব্যান্ডেজটা খোলো।" মিস গেগকে বললেন আমাদের ডাক্তারটি। মিস গেগ ব্যান্ডেজ খুলে দিল। আমিও তাকিয়ে দেখলাম। যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে

ওটার চেহারা ছিল একটু-আগে-কাটা শুয়োরের মাংসের কিমার মতো। এখন সেটার ওপর একটা শক্ত আবরণ পড়েছে, হাঁটুটা ফুলেছে, রংটা বিবর্ণ হয়ে গেছে আর পায়ের ডিমটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু একটুও পুঁজ নেই।

"বেশ পরিষ্কার আছে।" আমাদের ডাক্তার বললেন, "খুব ভাল!"

"হুঁ!" দাড়িওয়ালা বললেন। তৃতীয়জন উঁকি দিলেন ওদের কাঁধের ফাঁক দিয়ে। দাড়িওয়ালার জামার হাতায় তিনখানা তারকার পাশে একটি ফিতে—অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের প্রথম ক্যাপ্টেন। নানান কায়দায়, আমাকে বিস্তর ব্যথা দিয়ে পরীক্ষা করা শেষ করে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

"এক্স-রে'র ছবিগুলো আর একবার দেখতে পারি, ডাক্তার?" বললেন দাড়িওয়ালা। তৃতীয়জন একটা ছবি তাঁর হাতে দিলেন।

"এটা নয়, বাঁ পায়েরটা।"

"ওটাই বাঁ পায়ের।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে আমি অন্য পাশ থেকে দেখছিলাম তো।"

ছবিটা ফেরত দিলেন। অন্য ছবিটা দীর্ঘক্ষণ ধরে পরীক্ষা করা চলল। ছবির মধ্যে একটা লোহার টুকরো দেখিয়ে প্রথম ক্যাপ্টেন বললেন,

"দেখেছ ডাক্তার?"

আলোর সামনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গোল টুকরোটা। আবার খানিকক্ষণ পরীক্ষা করলেন ওঁরা। শেষে দাড়িওয়ালা প্রথম ক্যাপ্টেনটি বললেন,

"আমি একটা কথাই বলতে পারি, অনেক সময় লাগবে। তিন মাস, ছ'মাসও লাগতে পারে।"

"তা তো বটেই—যতক্ষণ না অস্থিরস আবার জমে।"

"ঠিক। সেটা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। আর লোহার টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো না-হওয়া পর্যন্ত হাঁটু অপারেশনের ব্যাপারে জেনেশুনে তো মত দিতে পারব না।"

"আমিও এ ব্যাপারে একমত, ডাক্তার।"

আমি বললাম, "ছ' মাস কেন লাগবে?"

"লোহার টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো হতে ছ' মাস লাগবে। তার পরে নিশ্চিন্তে অপারেশন করা যাবে।"

"ওসব আমি বিশ্বাস করি না," বললাম আমি।

"হাঁটুটা কি বাঁচাতে চাও, না চাও না?"

"চাই না।"

"মানে।"

"হাঁটু কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা হুক লাগিয়ে নিতে চাই।"

"কী বলছ? হুক মানে কী?"

আমার পিঠ চাপড়ে আমাদের হাসপাতালের ডাক্তার বললেন,

"ও মজা করছে। পা-টা বাঁচাতে চায় তো বটেই! খুব সাহসী ছেলে, বীরত্বের জন্যে ওকে রুপোর মেডেল দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে।"

"অভিনন্দন।" আমার করমর্দন করলেন প্রথম ক্যাপ্টেন, "আমি তোমাকে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে ছ' মাস অপেক্ষা করাই ভাল হবে। তবে অন্য ডাক্তারের মতও নিতে পারো তুমি।"

আমি বললাম, "অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার মতামতের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন,

"এবার আমাদের যেতে হবে। শুভেচ্ছা রইল।"

"আমারও শুভেচ্ছা রইল। অনেক ধন্যবাদ।" তৃতীয় ডাক্তারের সঙ্গেও করমর্দন করলাম। তিনজনে বেরিয়ে গেলেন।

"মিস গেগ।" ডাকলাম আমি। গেগ ফিরে এল।

"আমাদের হাসপাতালের ডাক্তারটিকে একটু ডাকো তো।"

টুপি হাতে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার, "আমায় ডেকেছ?"

"হ্যাঁ। অপারেশনের জন্যে ছ' মাস অপেক্ষা করতে আমি পারব না। কী ভয়ঙ্কর! আপনি কখনও ছ' মাস বিছানায় পড়ে থেকেছেন, ডাক্তারবাবু?"

"সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে না। প্রথমে তোমার ক্ষতস্থানে রোদ লাগাতে হবে, তারপর তুমি ক্রাচ নিয়ে বেড়াতে পারবে।"

"ছ' মাস—তারপর অপারেশন?"

"সেটাই নিরাপদ হবে। লোহার টুকরোগুলো জড়ো হবে, তারপর হাঁটুর অস্থিরস ফিরে আসবে। তখন আর অপারেশনে কোনও ভয় থাকবে না।"

"আপনি নিজেও কি তাই মনে করেন?"

"হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি থাকবে না।"

"ওই প্রথম ক্যাপ্টেনটি কে?"

"উনি মিলানের একজন বিখ্যাত সার্জেন।"

"প্রথম ক্যাপ্টেন তো উনি, তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু খুব ভাল শল্যচিকিৎসক।"

"একজন প্রথম ক্যাপ্টেনকে দিয়ে আমার পায়ের সর্বনাশ করতে চাই না। কাজের লোক হলে এতদিনে মেজর হয়ে যেত। প্রথম ক্যাপ্টেনের কেরামতি আমার জানা আছে।"

"উনি মস্ত খুব বড় শল্যচিকিৎসক, ওঁর বিচার-বিবেচনার ওপরেই আমি সব চেয়ে বেশি নির্ভর করব।"

"আর কোনও সার্জেনকে দেখানো যায় না?"

"তুমি চাইলে দেখাতে পারি। তবে আমি নিজে ডাঃ বারেল্লার মতামতই মানব।"

"অন্য কোনও সার্জেনকে এসে দেখতে বলবেন?"

"ডাক্তার ভালেন্তিনিকে ডাকব।"

"তিনি কে?"

"মাগ্গিওরে হাসপাতালের সার্জেন।"

"সেটাই ভাল হবে। ছ' মাস বিছানায় শুয়ে থাকা সম্ভব নয়।"

ডাক্তার হেসে বললেন,

"যুদ্ধে ফিরে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত?"

"কেন নয়?"

"দারুণ! আদর্শ ছেলে তুমি।"

একটু ঝুঁকে আলতো করে আমার কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন ডাক্তার। তারপর বললেন, "আমি ভালেন্তিনিকে ডেকে পাঠাচ্ছি, দুশ্চিন্তা করে নিজের শরীর খারাপ কোরো না। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাক।"

"একটু পান করবেন?"

"ধন্যবাদ, আমি মদ খাই না।"

"একটু খান।" গেলাস আনার জন্যে ঘণ্টি বাজালাম।

"না না, অনেক ধন্যবাদ। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আচ্ছা, চলি।"

"তাহলে আসুন।"

ঘণ্টা দুয়েক পরে ডাঃ ভালেন্তিনি আমার ঘরে এলেন। মেজর পদ তাঁর। রোদ-পোড়া মুখে ছুঁচলো গোঁফের দু'দিক ওপরে তোলা। ব্যস্তবাগীশ লোকটি সারাক্ষণ একাই নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন।

"এই বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটল কী করে? এক্স্-রে'র ছবিগুলো কই? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্বাস্থ্য তো একেবারে ষাঁড়ের মতো! মিষ্টি মেয়েটা কে? প্রেমিকা? ঠিক যা ভেবেছি। কী সর্বনেশে যুদ্ধ যে লেগেছে! কেমন লাগছে? খুব চমৎকার ছেলে তুমি। আমি তোমাকে একদম সারিয়ে দেব। ব্যথা লাগছে? তা তো লাগবেই। ডাক্তাররা ব্যথা দিতে খুব ভালবাসে, না? কী-কী চিকিৎসা হয়েছে তোমার এখন পর্যন্ত? মেয়েটি ইতালীয় ভাষা বলতে পারে না? শিখে নেওয়া দরকার। এত সুন্দর মেয়ে—আমিই ওকে ইতালীয় ভাষা শেখাতে পারি। এখানেই রুগী হয়ে শুয়ে থাকব আমিও! ও যখন মা হবে তখন সব ব্যবস্থা আমিই করব, টাকা লাগবে না। কথাটা বুঝতে পারলে? খুব

সুন্দর ছেলে উপহার দেবে তোমায়, ঠিক ওরই মতন মাথাভর্তি সোনালি চুল থাকবে তার। কী চমৎকার মেয়ে! ওকে জিজ্ঞেস করো তো, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাবে কিনা? আচ্ছা থাক, তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব না। অনেক ধন্যবাদ—ধন্যবাদ মিস।" আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "ব্যাস, এটুকুই দেখা দরকার ছিল। ব্যান্ডেজটা খুলে রাখো।"

"একটু পান করবেন, ডাক্তার ভালেন্তিনি?" আমি বললাম।

"অবশ্যই। একটু কেন, অনেকটা খাব। কোথায় আছে?"

"আলমারিতে। মিস বার্কলে, বোতলটা আনবে?"

"তোমার নামে পান করছি মিস—কী চমৎকার মেয়ে! তোমাকে আমি এর চেয়েও ভাল কগনাক এনে দেব।" গোঁফটা হাত দিয়ে মুছে নিলেন ডাক্তার।

আমি জানতে চাইলাম, "অপারেশন কবে হতে পারে?"

"কাল সকালে—তার আগে হবে না। পেটটা পুরো খালি করে নিতে হবে। আমি নীচে গিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে কথা বলে কী-কী করতে হবে বলে যাব। চলি, কাল দেখা হবে। এর চেয়ে ভাল কগনাক নিয়ে আসব। এখানে তোফা আরামে আছ হে। আচ্ছা, চলি। কাল আবার দেখা হবে। ভাল করে ঘুমিয়ো, ভোরেই আসব।"

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন ডাক্তার—গোঁফের ছুঁচলো ডগা দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে, তার নীচে হাস্যোজ্জ্বল তামাটে মুখ। জামার হাতায় তারকাচিহ্ন—মেজরের প্রতীক।

সে-রাতে বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা বাদুড় ঘরের ভেতরে ঢুকে ওড়াউড়ি শুরু করল। অন্ধকার ঘরে শহরের সাধারণ আলোর সামান্য আভা। বাদুড়টা নির্ভীকভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল ঘরময়, যেন খোলা জায়গাতেই আছে। আমরা শুয়ে শুয়ে ওর ওড়া দেখছি—বাদুড়টা নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে পায়নি, একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছি আমরা। একটু পরে বাদুড়টা বেরিয়ে গেল আকাশের দিকে। আকাশের বুকে একটা সার্চলাইটের দীর্ঘ আলো ঘুরছে—দূর প্রান্তে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আলোটা। রাতের আকাশ চিরে বয়ে আসছে বাতাস। পাশের বাড়ির ছাদে বিমান-বিধ্বংসী লোকেদের কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডা পড়েছে বেশ।

সারাক্ষণ মনে হচ্ছে কেউ যদি এসে পড়ে! ক্যাথারিন বলল, সবাই ঘুমোচ্ছে। রাতে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে দেখি ও পাশে নেই। হলের দিকে পায়ের শব্দ শুনলাম—দরজা খুলে ভেতরে এসে আবার বিছানায় শুলো। বলল, দেখে এসেছে চারপাশটা, সবাই ঘুমোচ্ছে।

খুব খিদে পেয়েছিল। ক্যাথারিনের আনা কিছু বিস্কুট খেলাম দু'জনে, সঙ্গে একটু ভার্মুথ। কিন্তু ক্যাথারিন জানাল—ভোরবেলা সবই নাকি আমার পেট থেকে বার করে ফেলা হবে। ভোরের আলো ফুটতেই ঘুমে চোখ বুজে এল। যখন উঠলাম তখন ক্যাথারিন আবার চলে গেছে। ফিরে এল সাফসুতরো হয়ে—বেশ তরতাজা দেখাচ্ছিল ওকে। বিছানায় বসে আমার মুখে থার্মোমিটার দিল। আকাশে সূর্যের কিরণ, হাওয়ায় শিশিরের সৌরভ, তার সঙ্গে মিশেছে পাশের ছাদে পাহারাদার সৈন্যদের কফির গন্ধ।

ক্যাথারিন বলল,

"একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটা হুইল চেয়ার থাকলে তোমাকে ঠেলে নিয়ে যেতাম।"

"আমি চেয়ারে বসতাম কী করে?"

"সে কিছু-একটা হয়ে যেত।"

"তাহলে পার্কে বেড়িয়ে বাইরেই কোথাও ব্রেকফাস্ট খেতাম দু'জনে।"

"কিন্তু এখন তোমাকে তোমার ডাঃ ভালেন্তিনির বন্ধুর জন্যে তৈরি করব।"

"চমৎকার মানুষ।"

"আমার অবশ্য তোমার মতো অতটা ভাল লাগেনি। তবে এমনিতে লোক ভালই।"

আমি বললাম, "ক্যাথারিন সোনা আমার, আবার শোবে এসো।"

"এখন নয়। কেন, রাতটা সুন্দর কাটেনি আমাদের?"

"আজও তুমি রাতের ডিউটিতে থাকতে পারবে তো?"

"বোধহয় পারব, তবে আজ আর আমাকে তোমার দরকার হবে না।"

"অবশ্যই হবে।"

"হবে না! কখনও তো অপারেশন হয়নি তোমার, জানো না কী অবস্থা হবে।"

"আমি ঠিক থাকব।"

"দুর্বল হয়ে পড়ে থাকবে, আমার কোনও মূল্যই থাকবে না তখন।"

"তাহলে এখনই এসো।"

"না, এখন আমাকে চার্ট লিখতে হবে, তোমাকে তৈরি করে দিতে হবে।"

"আসলে তুমি আমাকে ভালবাসো না, ভালবাসলে আসতে।"

"একেবারে বোকা তুমি," কাছে এসে ক্যাথারিন চুমু খেল আমায়, "নাও—চার্ট তৈরি করা হল। তোমার তো কখনোই জ্বর থাকে না। কী দারুণ শরীর! তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে আমার খুব অহঙ্কার হয়।"

"আমাদের সমস্ত ছেলেমেয়েদেরও এরকম স্বাস্থ্য হবে।"

"কচু হবে।"

ক্যাথারিনকে জিজ্ঞেস করলাম ডাঃ ভালেন্তিনির জন্যে তৈরি করতে ওরা কী-কী

করবে আমাকে। ও বলল, তেমন কিছু না হলেও সুখকর কিছু নয়। আমি বললাম,

"তাহলে তুমি এসব না করলেই ভাল হত।"

ক্যাথারিন বলল,

"করার কথাও নয়, কিন্তু অন্য কেউ তোমাকে ছুঁলে আমার একেবারে সহ্য হয় না। জানি এটা বোকামি, তবু—"

"ফার্গুসন হলেও?"

"বিশেষ করে ফার্গুসন, গেগ আর ওয়াকার। এখানে অনেক নার্স আছে। আমাকে হয়তো অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারে।"

"তাহলে আমিও চলে যাব।"

"পাগলামি কোরো না। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। তারপর দু'জনে একসঙ্গে কোথাও চলে যাব।"

"তারপর?"

"তারপর যুদ্ধ শেষ হবে, চিরদিন তো আর যুদ্ধ চলতে পারে না।"

"ভালেন্তিনি আমাকে ভাল করে দেবে।"

ক্যাথারিন বলল, "আর শোনো, তোমাকে যখন ইথার দিয়ে অজ্ঞান করবে, তখন আমার কথা একদম ভাববে না, অন্য কিছু ভাববে। অজ্ঞান হওয়ার সময় লোকেরা বোকার মতন নিজেদের সব গোপন কথা বলতে থাকে।"

"তাহলে কী চিন্তা করব?"

"যা-হোক কিছু, শুধু আমাদের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে। তোমার আত্মীয়স্বজন, কিংবা অন্য কোনও মেয়ের কথাও ভাবতে পারো।"

"না।"

"তাহলে প্রার্থনা কোরো। যেই তোমাকে বড় করে শ্বাস নিতে বলবে, তখনই হয় প্রার্থনা করতে শুরু করবে, নয়তো একটা কবিতা বলবে। সত্যি, তোমার জন্যে আমার ভীষণ গর্ব হয়। এত সুন্দর স্বাস্থ্য, বাচ্চাদের মতন এমন গভীর ভাবে ঘুমোও তুমি, বালিশটাকে আমি ভেবে জড়িয়ে ধরো। নাকি, অন্য কোনও মেয়েকে মনে করো—কোনও ইতালিয়ান রূপসীকে?"

"না, তোমাকেই।"

"আমাকে তো বটেই। তোমাকে যে ভীষণ ভালবাসি। ভালেন্তিনি তোমার পা একদম সারিয়ে দেবে, দেখো! ভাগ্যিস আমাকে তোমার অপারেশনটা দেখতে হবে না।"

"কিন্তু তার জন্যে তোমার কিছুই যাবে-আসবে না।"

"বেশ, দেখো।"

কথা বলতে বলতে যা-কিছু করার সব সেরে ফেলল ক্যাথারিন। তারপর বলল, "তোমার শরীরের ভেতর-বাইরে সব সাফসুতরো হয়ে গেল, তুমি এখন তৈরি। বলো না গো, ক'জনকে ভালবেসেছ তুমি?"

"একজনকেও না।"

"আমাকেও না?"

"তোমাকে ভালবাসি তো বটেই।"

"আর ক'জনকে? সত্যি করে বলো।"

"একজনকেও না।"

"ক'জনের সঙ্গে, মানে...বাস করেছ?"

"কারুর সঙ্গে না।"

"বানানো কথা বলছ!"

"হবে।"

"বেশ বেশ, মিথ্যেই বলে চলো আমাকে, আমি তাই চাই। ভাল দেখতে ছিল তারা?"

"আমি কারুর সঙ্গে থাকিনি কখনও।"

"আচ্ছা বেশ, খুব সুন্দরী ছিল তারা?"

"আমি কিছু জানি না।"

"তুমি আমার, শুধুই আমার—আর কারও নও, অন্য কারও ছিলে না কখনও। থাকলেও আমার কিচ্ছু যায়-আসে না—আমি তাদের ভয় পাই না। কিন্তু ওদের কথা কখনও বোলো না আমায়। আচ্ছা, পুরুষেরা যখন ওরকম মেয়েদের সঙ্গে থাকে, তখন দরদামের কথা ওঠে?"

"জানি না।"

"জানো না-ই তো। আচ্ছা, ওরা ভালবাসার কথা বলে? বলো না, আমি জানতে চাই।"

"লোকে বলাতে চাইলে বলে।"

"পুরুষেরা ভালবাসার কথা বলে? বলো, বলো লক্ষ্মীটি—এটা জানা খুব দরকার।"

"ইচ্ছে হলে বলে।"

"কিন্তু তুমি কখনও বলোনি? সত্যি করে বলো।"

"না।"

"সত্যি না? সত্যি কথা বলো।"

"না।" মিথ্যে উত্তর দিলাম।

"তুমি বলবে না, বলতে পারো না। তোমাকে ভীষণ ভালবাসি—প্রিয় আমার!"

বাইরে সূর্য তখন বেশ ওপরে উঠে গেছে, রোদ পড়েছে বাড়িগুলোর ছাদে, গির্জার চূড়াটা ঝকমক করছে, ঘরের মধ্যে আমি ভেতরে-বাইরে সাফসুতরো হয়ে অপেক্ষা করছি ডাক্তারের জন্যে।

ক্যাথারিন বলল,

"তার মানে পুরুষেরা যা বলাতে চায় মেয়েরা তাই বলে?"

"সব সময়েই কি আর সেটা হয়!"

"কিন্তু আমি সেটাই করব। তুমি যা চাইবে সেটাই বলব, যা করতে বলবে তাই করব, তাহলে তো আর অন্য কোনও মেয়েকে চাইবে না তুমি?"

উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকাল সে।

"তুমি যা চাও তা-ই বলব, তা-ই করব। তাহলেই তো আমার জীবন সফল হবে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এখন তুমি ডাক্তারের জন্যে তৈরি—এবার বলো কী করব তোমার জন্যে?"

"শোবে এসো আবার।"

"আচ্ছা, আসছি।"

"ক্যাথারিন, রিনি, আমার রানি!"

"দেখছ তো তুমি যা চাও তাই-ই করি আমি! তুমি যা চাও আমিও সেটাই চাই। আমার আমি বলতে আর কিচ্ছু নেই। তবু এখনও হয়তো তোমায় তেমন তৃপ্তি দিতে পারছি না।"

"তুমি ভীষণ মিষ্টি।"

"আমি ভাল তো? অন্য কোনও মেয়েকে আর চাও না তো?"

"না।"

"দেখলে তো, আমি কত ভাল! তুমি যা চাও তাই-ই করি আমি।"

অপারেশনের পরে জ্ঞান হতে মনেই হল না অন্য জগৎ থেকে ফিরে এসেছি। অজ্ঞান হওয়ার সময়ও মনে হয়নি কোথাও চলে যাচ্ছি—দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, কিন্তু সেটা মৃত্যুর অনুভূতি নয়। শুধু ওষুধের গন্ধে দমবন্ধ ভাব। আর জ্ঞান হওয়ার পর যেন মদের নেশার খোঁয়াড়ি ভাঙার পরের অবস্থা। তফাতের মধ্যে শুধু বমির সঙ্গে পিত্তি উঠে আসে, অথচ তার পরেও নিজেকে সুস্থ মনে হয় না।

খানিক পরে মিস গেগকে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞেস করল, কেমন আছি। বললাম, অনেকটা ভাল। গেগ বলল,

"দারুণ অপারেশন করেছেন ডাক্তার।"

"কতক্ষণ লাগল?"

"আড়াই ঘণ্টা।"

"উল্টোপাল্টা কিছু বকেছি?"

"কিচ্ছু না। এখন কথা বোলো না, চুপ করে শুয়ে থাকো।"

বমি পাচ্ছিল। বেশ খারাপ লাগছিল। ক্যাথারিন ঠিকই বলেছিল—রাতের ডিউটিতে কে আছে, সেটা খেয়াল করার মতো হালই ছিল না।

হাসপাতালে এখন আরও তিনজন রুগী রয়েছে। একজন রেড ক্রসের, জর্জিয়ার লোক, রোগাটে চেহারা, ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। অন্যজনও রোগা, নিউইয়র্কের লোক, সে-ও ম্যালেরিয়া আর জন্ডিসে ভুগছে। তৃতীয়জন বিস্ফোরকের মুখ খুলতে গিয়ে জখম হয়েছে। তিনজনই চমৎকার মানুষ।

ক্যাথারিন বার্কলে সব নার্সেরই প্রিয় হয়ে উঠেছে, কারণ সে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাতের ডিউটি করতে প্রস্তুত। ম্যালেরিয়ার রুগীদের জন্যে ওকে তেমন কিছু করতে হয় না, আর বিস্ফোরকে জখম ছেলেটি আমাদের বিশেষ বন্ধু, সুতরাং খুব দরকার না হলে রাতে কখনও ঘণ্টা বাজায় না সে। তাই ওর কাজের সময়টুকু ছাড়া আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকি। গভীর প্রেমে ডুবে গেছি আমরা। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিই। দিনে জেগে থাকার সময়ে একে অপরকে চিঠি লিখি আর ফার্গুসনের হাত দিয়ে সেগুলো চালাচালি করি। বড় ভাল মেয়ে ফার্গুসন। ওর এক ভাই আছে মেসোপটেমিয়ায়, আর এক ভাই আছে বাহান্ন নম্বর ডিভিশনে। এটুকু ছাড়া ওর সম্বন্ধে আর কোনও খবর জানতে পারিনি—শুধু জেনেছি আমার ক্যাথারিনকে খুব ভালবাসে ও।

একদিন ফার্গুসনকে জিজ্ঞেস করলাম,

"আমাদের বিয়েতে তুমি আসবে তো, ফার্গি?"

"তোমরা কোনওদিন বিয়েই করবে না।" উত্তর দিল ও।

আমি বললাম, "অবশ্যই করব।"

"আদৌ করবে না।"

"এ কথা বলছ কেন?"

"বিয়ের আগেই ঝগড়া হয়ে যাবে তোমাদের।"

"আমরা কখনোই ঝগড়া করি না।"

"এখনও বিস্তর সময় আছে—দেখা যাবে পরে কী হয়।"

"ঝগড়া আমরা করি না।"

"তা হলে মরে যাবে। হয় ঝগড়া করবে, নয়তো মারা যাবে। এ-সব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত এই-ই হয়। বিয়ে হয়ে ওঠে না।"

ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম আমি। ও বলল,

"হাত ধরার দরকার নেই, আমি কাঁদছি না। হয়তো তোমরা ভালই থাকবে। কিন্তু ওকে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ো না যেন। ওকে যদি কোনও ঝামেলায় ফেলো তাহলে তোমাকে খুন করব আমি।"

"ওকে আমি কোনও বিপদে ফেলব না।"

"বেশ, মনে থাকে যেন। আশা করি শেষ পর্যন্ত ভালই হবে। দিব্যি তো কাটছে তোমাদের।"

"চমৎকার সময় যাচ্ছে আমাদের।"

"তাহলে ঝগড়া কোরো না আর ওকে ঝামেলায় ফেলো না।"

"ফেলব না।"

"সাবধানে থাকবে। যুদ্ধজাত সন্তানের কলঙ্ক যেন বইতে না হয় ওকে।"

"তুমি খুব ভাল মেয়ে, ফার্গি।"

"ও-সব কিছু না—খোশামোদ করতে হবে না। পা কেমন আছে?"

"ভাল।"

"মাথাটা?"

আঙুল দিয়ে মাথার ওপরটা ছুঁলো একটু। হাত দিতেই ভেতরটা শিরশির করে উঠল। বললাম,

"ও-সব নিয়ে আমি ভাবি না।"

"এত বড় চোট, মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে, আর তোমার কোনও হেলদোলই নেই?"

"না।"

"ভাগ্যবান লোক বটে। চিঠিটা হয়েছে? এবার নীচে যাব আমি।"

"হয়ে গেছে, নাও।"

"কিছুদিনের জন্যে ক্যাথারিনকে রাতের ডিউটি করতে বারণ করা উচিত তোমার। ও ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।"

"বেশ, বলব।"

"আমি রাতের ডিউটি করতে চাই, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয় না। অন্যরা তো খুব খুশি। তুমি অন্তত ওকে একটু বিশ্রাম দিতে পারো।"

"দেব।"

"তোমার সারা দুপুর ঘুমোনোর কথা বলছিল মিস ভ্যান ক্যাম্পেন।"

"তা তো বলবেই।"

"কয়েকটা দিন ওকে রাতের ডিউটি থেকে রেহাই দিলে ভাল করতে।"

"আমি নিজেও তাই চাই।"

"আদৌ চাও না, কিন্তু ওকে যদি অন্তত কয়েকটা দিন ছুটি নেওয়াতে পারো তাহলে তোমার ওপর শ্রদ্ধা হবে আমার।"

"আমি ঠিক রাজি করাব ওকে।"

"আমি বিশ্বাস করি না।" চিঠি নিয়ে চলে গেল ফার্গুসন।

ঘণ্টা টিপলাম। একটু পরেই মিস গেগ এল।

"কী হল?"

"কিছু না, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। আচ্ছা, মিস বার্কলের কয়েকটা দিন রাতের ডিউটি থেকে ছুটি নেওয়া উচিত, তাই না? বেচারাকে খুব ক্লান্ত দেখায়। এতদিন ধরে একনাগাড়ে রাতের ডিউটি করছে কেন বলো তো?"

আমার দিকে তাকিয়ে মিস গেগ বলল,

"আমার সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বলার দরকার নেই, আমি তোমার বন্ধু।"

"মানে?"

"ভান কোরো না। আর কিছু বলবে?"

"ভার্মুথ খাবে?"

"খেতে পারি, কিন্তু তাহলে তো আবার গেলাস আনতে যেতে হবে।"

আলমারি থেকে ভার্মুথের বোতল বার করে একটা গেলাস নিয়ে এল গেগ। আমি বললাম,

"তুমি গেলাসে খাও, আমি বোতল থেকেই খেয়ে নেব।"

ও গেলাস আর আমি বোতল, দু'জনে বেশ আয়েশ করে শুরু করলাম। ওকে বললাম—

"বেলা পর্যন্ত ঘুমোন নিয়ে ভ্যান ক্যাম্পেন কী বলছিল?"

"কী আর বলবে, একটু বকবক করে। তোমার নাম দিয়েছে 'আহ্লাদে রুগী'।"

"জাহান্নামে যাক।"

"ওর মনটা কিন্তু খারাপ নয়। বয়স হয়েছে তাই একটু খিটখিটে, তাছাড়া তোমাকে একেবারে দেখতে পারে না।"

"তা পারে না বটে।"

"কিন্তু আমি পারি। আমি তোমার বন্ধু—কথাটা মনে রেখো।"

"তুমি খুব ভাল।"

"আদৌ না। আসলে তোমার কাছে কী ভাল সেটা আমি জানি। কিন্তু তবু আমি তোমার বন্ধু। পা কেমন?"

"খুব ভাল।"

"একটু ঠান্ডা সোডার জল এনে ঢেলে দিই, আরাম হবে। প্লাস্টারের মধ্যে নিশ্চয়ই কুটকুট করছে—বাইরেটা তো বেশ গরম হয়ে উঠেছে।"

"খুব ভাল মেয়ে তুমি।"

"খুব চুলকোচ্ছে কি?"

"না, ঠিকই আছে।"

"বালির বস্তাগুলো ঠিক করে দিই।"

নিচু হয়ে বস্তাগুলো ঠিক করতে করতে ও আবার বলল,

"আমি তোমার বন্ধু।"

"আমি জানি।"

"জানো না, কিন্তু একদিন জানবে।"

তিন রাত ছুটি নিল ক্যাথারিন। তারপর যেদিন ফিরে এল, মনে হল যেন বহু দিন পরে, বহু দূরের পথ পার হয়ে, দেখা হল আমাদের।

সেই গ্রীষ্মটা খুব সুন্দর কাটল আমাদের। আমার যখন বাইরে বেরোনোর মতো অবস্থা হল, তখন আমরা গাড়ি চড়ে পার্কে বেড়াতাম। ধীর গতিতে ঘোড়া চলে, চালকের উঁচু আসনে বসে গাড়োয়ান, তার পিঠটা আর তার মাথার চকচকে পালিশ-করা লম্বা টুপিটা দেখতে পাই। গাড়ির মধ্যে আমি, পাশে ক্যাথারিন। ওর হাতের ছোঁয়া লাগে আমার হাতে, ধমনীতে উষ্ণ স্রোত বয়ে যায়।

আবার যখন ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারলাম, তখন আমরা ডিনার খেতে যেতাম বিফিতে, কখনও বা গ্রান ইতালিয়ায়। বাইরে গালেরিয়ার মেঝেতে টেবিল পেতে বসি। হোটেলের বেয়ারাদের ব্যস্ততা, বহু মানুষের আনাগোনা, টেবিলের ঢাকনায় মোমবাতির লম্বা ছায়া—সব মিলিয়ে গ্রান ইতালিয়া আমাদের বেশি ভাল লাগে। প্রধান বেয়ারা জর্জ আমাদের জন্যে একটা টেবিল বাঁচিয়ে রাখে। মানুষটা খুব ভাল। খাবার বাছাইয়ের ভার ওর ওপরে ছেড়ে দিয়ে আমরা দেখি মানুষের আসা-যাওয়া, আবছা আঁধারে বিশাল গালেরিয়া আর দেখি পরস্পরকে। বরফের ছোট বালতিতে বসানো সাদা কাপ্রি পান করি দু'জনে।

এক সন্ধ্যায় দেখি পকেট ফাঁকা। জর্জ একশো লিরে ধার দিল। বলল, "ঠিক আছে, তেনেন্তে। কখনও কখনও লোকের হাতে টাকা থাকে না। আরও লাগলে বলবেন।"

ডিনার শেষ করে গালেরিয়ার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাই। রাস্তার ধারে কত রেস্তোরাঁ,

কত কত দোকান! গালেরিয়ার বাইরে এসে গির্জার সামনে থেকে একটা হুড-খোলা গাড়িতে উঠে ফিরে আসি হাসপাতালের পথে। হাসপাতালের দরজায় এলে দারোয়ান বেরিয়ে এসে আমাকে ক্রাচ নিয়ে নামতে সাহায্য করে। গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে লিফটে চড়ি। আমার নীচের তলায় নেমে যায় ক্যাথারিন—সেখানে নার্সরা থাকে। ওপরে ওঠার পর কখনও ঘরে ঢুকেই পোশাক বদলে শুয়ে পড়ি, কখনও বারান্দায় বসে জখম পা-টা অন্য একটা চেয়ারের ওপর রেখে সামনের দিকে চেয়ে সোয়ালো পাখিদের ওড়াউড়ি দেখি আর ক্যাথারিনের জন্য অপেক্ষা করি। একসময় ওপরে আসে ক্যাথারিন, মনে হয় যেন কত যুগ পরে দেখা হল। ওর সঙ্গে গামলা-টামলা নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে আমিও চলি। রুগীদের ঘরের সামনে এসে আমি থাকি বাইরে আর ও চলে যায় ভেতরে। রুগীটি বন্ধু হলে আমিও ওর সঙ্গে ভেতরে যাই। কাজ হয়ে গেলে ক্যাথারিন আর আমি বসে থাকি ঘরের সামনের বারান্দায়। খানিক পরে আমি শুতে যাই। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, যখন বোঝা যায় আর কেউ ডাকবে না, তখন ক্যাথারিন এসে বসে আমার বিছানায়।

চুপচাপ বসে থাকে ক্যাথারিন। ওর মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে বেশ লাগে। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিচু হয়ে চুমু দেয় আমাকে। একটা একটা করে মাথা থেকে কাঁটাগুলো খুলে নিতে নিতে ওকে দেখি—স্থির হয়ে বসে আছে, বাঁধা চুল ঢিলে হয়ে গেছে। শেষ কাঁটাদুটো খুলে নিলেই হু-হু করে নেমে আসে চুলের রাশি। আমার মুখের ওপর মাথাটা নামিয়ে আনে—ওর ঘন চুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাই আমরা দু'জনেই। যেন তাঁবুর আশ্রয়ে বিশ্রাম খুঁজে পাই।

অপূর্ব সুন্দর চুল ওর। মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখি। পাকিয়ে পাকিয়ে চুল বাঁধতে থাকে ও, আধেক-ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সরু এক ফালি আলো এসে পড়ে ওর চুলের ওপর—রাতের সীমান্তে ভোরের আলোয় নদীর জলের হিরেদানার মতো জ্বলে।

অপূর্ব সুন্দর মুখ ওর, সুঠাম শরীর। কোমল ত্বকে গভীর আবেশ। শুয়ে শুয়ে আলতো করে ওর মুখ স্পর্শ করি, বিহ্বল-করা কোমলতার পরশ পাই। আস্তে আস্তে বলি,

"পিয়ানোর রিডের মতো মসৃণ।"

অল্প হেসে আমার গালে হাত রেখে ও বলে,

"শিরিষ কাগজের মতো মসৃণ, পিয়ানোর রিডের পক্ষে বড্ড কড়া।"

"খস্‌খসে?"

"না না, মজা করছিলাম।"

স্বপ্নের মতো কাটে রাতগুলো। একে অপরের এতটুকু স্পর্শ পেলেই মনে হয়

যেন অসীম সুখ। তা ছাড়াও ভালবাসার আরও কত কত বিচিত্র পন্থা! কাছাকাছি যখন থাকতে পারি না, তখন মনের নানান বিচিত্র চিন্তা অন্যের মনে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি দূর থেকে। অনেক সময় তাতে কাজও হয়, তবে তার কারণ সম্ভবত এই যে আমাদের দু'জনের ভাবনাও পরস্পরের হাত ধরেই চলে।

ক্যাথারিনের হাসপাতালে আসার দিনটাকে আমাদের বিয়ের দিন বলে মনে করি আমরা, সেই তারিখ থেকেই হিসেব করি আমাদের বিয়ের কত মাস হল। আমি সামাজিকভাবে বিয়েটা সেরে নিতে চাই, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হয় না। বিয়ে হয়ে গেলে আর হাসপাতালে থাকতে দেবে না ওকে। আমাদের অবশ্য ইতালীয় প্রথায় বিয়ে করতে হবে, এবং তার রীতিনীতি ভয়ঙ্কর। তবু আমি বিয়েটা সেরে ফেলতে চাই। কারণ প্রায়শই অনাগত সন্তানের আগমন আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠি। তবু এ নিয়ে বেশি ভাবি না আমরা, বিয়ে না-করেও আমরা বিবাহিত এই ভাবনাতেই যেন বেশি আনন্দ। একদিন রাতে ক্যাথারিনকে ব্যাপারটা বললাম। ও বলল,

"না, তাহলে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে ওরা।"

"না-ও দিতে পারে।"

"দেবেই। ওরা আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তারপর যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আলাদা থাকতে হবে আমাদের।"

"আমি ছুটিতে তোমার কাছে যাব।"

"ছুটি নিয়ে স্কটল্যান্ড গিয়ে আবার ফিরে আসা সম্ভব নয়। তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না আমি। তা ছাড়া এখন আবার বিয়ে করে কী হবে? আমাদের বিয়ে তো হয়েই গেছে, এর চেয়ে বেশি আবার কী বিয়ে হবে?"

"আমি তোমার কথা ভেবেই বলছি।"

"আমার আর আলাদা কী আছে! আমি তো সবটুকুই তুমি।"

"আমার ধারণা ছিল মেয়েরা সবসময় বিয়ে করতেই চায়।

"তা চায়। কিন্তু আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। আমি কি তোমার মনের মতো স্ত্রী হতে পারিনি?"

"তুমি আমার সোনা বউ।"

"জানো তো বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করার অভিজ্ঞতা একবার হয়ে গেছে আমার।"

"ও আমি শুনতে চাই না।"

"তুমি জানো, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না আমি, আর কেউ যদি আমাকে ভালবেসে থাকে, তাতে তোমার কিছু মনে করা ঠিক নয়।"

"আমি মনে করি।"

"নিজে সবটুকু পেয়েও, যে মারা গেছে তাকে ঈর্ষা করতে নেই।"

"তা আমি করি না, কিন্তু আমি ও-সব কথা শুনতেও চাই না।"

"দ্যাখো, আমি জানি তুমি সব রকম মেয়েদের সঙ্গে মিশেছ, অথচ তাতে আমার কিচ্ছু যায়-আসে না।"

"আচ্ছা, গোপনে বিয়ে করা যায় না? নইলে আমার যদি কিছু একটা ঘটে যায়, কিংবা তুমি যদি মা হও?"

"আইনমতে কিংবা গির্জায় গিয়ে ছাড়া অন্যভাবে বিয়ে হয় না। লোকের চোখের আড়ালে বিয়ে আমাদের তো হয়েই গেছে। দেখো, আমার যদি কোনও ধর্ম থাকত, তাহলে আমি এ-বিয়েকে তো খুব মূল্য দিতাম। কিন্তু আমার তো কোনও ধর্ম নেই।"

"তাহলে যে আমাকে সেন্ট অ্যান্টনি দিয়েছিলে?"

"সেটা পয়া বলে। কে-যেন ওটা দিয়েছিল আমায়।"

"তোমার কোনও ভয় হয় না?"

"শুধু তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার ভয় হয়। তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার সব।"

"বেশ, তাহলে যেদিন তুমি বলবে সেদিনই বিয়ে হবে।"

"এমন ভাবে বলছ যেন আমাকে সতীসাধ্বী নারী করে গড়ে তুলতে হবে। আমি এমনিতেই সতী। তুমি নিজে যাতে সুখী হও, গর্ব অনুভব করো, তা নিয়ে অন্যের কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তুমি কি সুখী হওনি?"

"কিন্তু অন্য কারুর জন্যে আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না বলো?"

"না না, কারুর জন্যে তোমাকে ছেড়ে যাব না আমি। অবশ্য আমার সবসময়েই মনে হয় সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে আমাদের, কিন্তু তা নিয়ে এখনই মাথা ঘামানোর কিছু নেই।"

"না না, মাথা আমি ঘামাই না। তোমাকে আমি এত ভালবাসি, তুমি কিন্তু আগে আরও একজনকে ভালবেসেছ।"

"তারপর তার কী হল?"

"সে মারা গেল।"

"হ্যাঁ, আর সে মারা না গেলে তোমার সঙ্গে আমার দেখাও হত না। আমি কাউকে ঠকাইনি। আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসের কাজ আমি করি না। আমার একনিষ্ঠতায় শেষ পর্যন্ত তোমারই বিরক্তি আসবে আমার ওপরে।"

"আমাকে তো শিগগিরই যুদ্ধে ফিরে যেতে হবে।"

"তুমি না-যাওয়া পর্যন্ত ও নিয়ে আমরা ভাববই না। এখন আমি ভীষণ সুখী, কী চমৎকার কাটছে আমাদের দিনগুলো। বহুদিন সুখের মুখ দেখিনি, তাই প্রথম যখন তোমাকে দেখি, প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো সত্যিই পাগল হয়ে

গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পরস্পরকে ভালবেসে সুখী হয়েছি আমরা। আমাদের এই সুখই যথেষ্ট, আর কিছু চাই না। তুমিও কি সুখী হওনি? তুমি যা ভালবাসো না, এমন কিছু কক্ষনো করি না আমি। বলো, কী করব তোমার জন্যে এখন, কী করলে তুমি খুশি হবে?"

"শোবে এসো।"

"ঠিক আছে। রুগীদের দেখে ঘুরে আসছি।"

এভাবেই কেটে গেল গ্রীষ্মের দিনগুলো। সেবার প্রচণ্ড গরম, আর কাগজে অনেকগুলো যুদ্ধজয়ের খবর ছিল। স্বাস্থ্য আমার মজবুত, পায়ের চোটটাও সেরে গেল তাড়াতাড়ি, ক্রাচ নিয়ে বেশিদিন হাঁটতে হয়নি, কিছুদিনের মধ্যেই শুধু একটা ছড়ি নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর পা-দুটো স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলার উপযোগী করতে মাগ্গিওরে হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শুরু করালাম। রোজ বিকেলের দিকে সেখানে যাই, ফেরার পথে কাফেতে গিয়ে দু'পাত্র পান করি। সেই সঙ্গে সেদিনের খবরের কাগজটা পড়ি। শক্তি থাকলেও একা-একা শহরে ঘুরি না। মাথার মধ্যে একমাত্র চিন্তা, কতক্ষণে ক্যাথারিনকে দেখব। তারপর বাকি সময়টা একা-একা ঘরে বসে কাটালেও দুঃখ নেই। সকালটা সাধারণত ঘুমিয়ে কাটে, বিকেলে মাঝেমধ্যে রেসের মাঠে যাই, সেখান থেকে হাসপাতালে। কখনও ফেরার পথে অ্যাংলো-আমেরিকান ক্লাবের জানলার ধারে একটা বড় আর নরম গদি-আঁটা চেয়ারে এলিয়ে বসে কাগজ পড়ি। ক্রাচ ছাড়ার পর থেকে আমাদের দু'জনকে আর একসঙ্গে বেরোতে দেয় না ওরা। যে-রুগীর সঙ্গে লোক থাকার দরকার নেই, তার সঙ্গে একজন নার্সের ঘুরে বেড়ানোটা বেশ দৃষ্টিকটু। কাজেই বিকালে বেড়ানোটা আর প্রায় হয়ই না। অনেক সময় দু'জনে একসঙ্গে ডিনার খেতে যেতে পারি, অবশ্য ফার্গুসন সঙ্গে থাকলে। ক্যাথারিনকে দিয়ে অনেক কাজ হয় বলে মিস ক্যাম্পেন আমাদের বন্ধুত্বকে একটা স্বীকৃতি দিয়েছেন। তা ছাড়া মিস ভ্যান ক্যাম্পেনের মতে ক্যাথারিন খুব উঁচু বংশের মেয়ে, সেইজন্যে ওর ওপর তাঁর গভীর ভালবাসা জন্মে গেছে। বংশগৌরবের দুর্বলতাটা ভ্যান ক্যাম্পেনের মধ্যে খুব বেশি, কারণ তিনি নিজেও বনেদি বংশের মেয়ে।

হাসপাতালের কাজ খুব বেড়েছে, তাই ক্যাথারিনকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। ভীষণ গরমও পড়েছে। মিলানের অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনাও ছিল, তবু তাদের সঙ্গে বাইরে না কাটিয়ে, বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ফিরে আসার জন্যে মনটা যেন অস্থির হয়ে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা ক্রমশই এগিয়ে চলেছি কার্সোর দিকে, প্লাভার ওপারে কুক আমাদের দখলে এসে গেছে। আর বাইনসিৎসার মালভূমি জয়ও প্রায় সারা। পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা অবশ্য খুব একটা ভাল নয়। যুদ্ধ শিগগির থামার কোনও লক্ষণই নেই, বরং বেশ জমে উঠেছে, তবু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য জোগাড় করে তাদের তৈরি করে নিতে আরও বছর খানেক সময় লাগবে। সামনের বছর যুদ্ধের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে বলা যায় না। ইতালিয়ানরা সৈন্যসংখ্যা ভীষণ বাড়িয়েছে। এভাবে বেশিদিন কী করে চলবে জানি না। ওরা বাইনসিৎসা আর মন্টে সান গাব্রিয়েলি পুরোপুরি দখল করে নিলেও, তার ওপারে অস্ট্রিয়ানদের অজস্র পাহাড়সারি পড়ে থাকবে। স্বচক্ষে দেখেছি, সমস্ত বড় বড় পাহাড়ই পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। কার্সোর ওপর দিয়ে ইতালিয়ানরা এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু তারপরে উতরাইয়ের দিকে সমুদ্রের পাশের জলাভূমিগুলো রয়ে গেছে। নেপোলিয়ন হলে অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে সমতলভূমিতে যুদ্ধ করে তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতেন, পাহাড়ের ওপরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন না কখনোই। অস্ট্রিয়ানদের ভেরোনা পর্যন্ত নেমে আসতে দিয়ে সেখানে তাদের তছনছ করে দিতেন। পশ্চিম সীমান্তে কিন্তু তখনও পর্যন্ত কেউই কাউকে একেবারে বেসামাল করে ফেলতে পারেনি। হয়তো এ-যুদ্ধে কোনও পক্ষেরই জয় হবে না, হয়তো বা এভাবেই চলবে চিরদিন। এ-যুদ্ধ যে আর-একটা শতাব্দীর যুদ্ধ হবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে! যাকগে, এ-সব ভাবনার শেষও নেই, সমাধানও নেই। তাকের ওপর কাগজটা রেখে দিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে ভিয়া মানজোনির দিকে চললাম।

গ্রান হোটেলের সামনে সস্ত্রীক বৃদ্ধ মেয়ার্সের সঙ্গে দেখা হল—গাড়ি থেকে নামছেন তাঁরা, মাঠ-ফেরত। বিপুলস্তনী গিন্নির পরনে কালো সাটিনের পোশাক আর ছোটখাটো বৃদ্ধ কর্তার হাতে ছড়ি, পদক্ষেপ দৃঢ়, মুখে সাদা গোঁফ।

"কেমন আছ?" করমর্দন করলেন গিন্নি।

"খবর-টবর কী?" অভিনন্দন জানালেন মেয়ার্স।

জিজ্ঞেস করলাম, "রেস কেমন হল?"

"খুব ভাল, একেবারে দারুণ। তিনটে জিতেছি।" গিন্নি উচ্ছ্বসিত। কর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কেমন হল?"

"মন্দ নয়, একটা জিতেছি।"

"কী যে করে বুঝতে পারি না।" মিসেস মেয়ার্স বললেন, "আমাকে কিচ্ছু বলে না কখনও।"

"যা করি ঠিকই করি।" গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন কর্তা। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে আমাকে বললেন, "তোমার একটু বেড়ানো-টেড়ানো দরকার।"

বললাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেড়াব।"

অদ্ভুত ধরন ভদ্রলোকের—কথা বলার সময় মনে হয় যেন অন্যদিকে তাকিয়ে বলছেন, নয়তো অন্য কেউ বলে ভুল করেছেন।

মিসেস মেয়ার্স বললেন, "আমি শিগগিরই তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে হাসপাতালে যাব। আমার ছেলেদের জন্যে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাব। তোমরা সবাই আমার ছেলে, আমার সোনার টুকরো ছেলে তোমরা।"

"আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবে ওরা।"

"আহা! আমরা হিরের টুকরো ছেলেরা—তুমিও আমার এক ছেলে।"

"এবার যেতে হবে।" বিদায় জানালাম ওঁদের।

"ছেলেদের আমার ভালবাসা জানিয়ো। ওদের জন্যে অনেক জিনিস নিয়ে যাব আমি। খুব ভাল কেক আর মার্সালা আছে।"

"আচ্ছা, এখন তাহলে চলি। আসবেন আমাদের ওখানে, খুব খুশি হবে সবাই।" আমি বললাম।

"বিদায়।" বললেন মেয়ার্স, "গালেরিয়াতে চলে এসো একবার। আমার টেবিলটা চেনো? বিকেলটা সবাই ওখানেই থাকি।"

রাস্তায় বেরিয়ে কোভার দিকে চললাম। ওখান থেকে ক্যাথারিনের জন্যে কিছু কেনাকাটা করব। কোভায় গিয়ে এক বাক্স চকোলেট নিলাম। ওরা যখন বাক্সটা কাগজে মুড়ছিল, তখন পানশালায় গিয়ে এক গেলাস মার্টিনি পান করলাম। জনাদুয়েক ইংরেজ আর কয়েকজন বিমানবাহিনীর অফিসার রয়েছে সেখানে। আমি একা এক পাশে দাঁড়িয়ে পানীয় শেষ করে চলে এলাম। দোকান থেকে বাক্সটা নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে হাসপাতালের দিকে চলতে লাগলাম।

স্কালার কাছে রাস্তার ওপরের ছোট মদের দোকানটার সামনে দেখলাম জনকয়েক জড়ো হয়েছে। একজন ভাইস-কনসাল, দুজন সঙ্গীতশিক্ষার্থী আর একজন ছিলেন ইতালিয়ান বাহিনীতে—সানফ্রান্সিসকো-নিবাসী, নাম এত্তোরে মোরেত্তি। ওদের সঙ্গে একপাত্র পান করলাম, সঙ্গে একটু আড্ডাও হল। গায়কদুটির একজনের নাম রাল্ফ সিমন্স, গান গেয়ে বেড়ায় এনরিকো দেলক্রেদো নাম নিয়ে। কেমন গায় সেটা অবশ্য শোনার সুযোগ হয়নি, কিন্তু ওর নিজের ধারণা—ওর প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই বেশ জমজমাট হয়। মোটা শরীর, নাকের আর ঠোঁটের চারপাশটা পাঁশুটে, যেন বিশেষ কোনও রোগ থেকে উঠেছে। পিয়াসেনজা থেকে গান গেয়ে ফিরেছে হালে—ওর টোস্কা গানের অনুষ্ঠান নাকি ভীষণ ভাল হয়েছে। সে বলল,

"তবে তুমি তো কখনও আমার গান শোনোনি।"

"এখানে কবে গাইবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এ-বছরের শেষের দিকে স্কালায় একটা অনুষ্ঠান হবে।"

এত্তোরে বলল, "সেখানে তোকে চেয়ার ছুঁড়ে মারবে লোকে।" আমার দিকে ফিরে বলল, "মোদেনাতে ওর গান শুনে ওকে বেঞ্চি ছুঁড়ে মেরেছিল, শোনোনি?"

"বাজে কথা।"

"সত্যি বেঞ্চি ছুঁড়েছিল—আমি নিজেই ছ'টা ছুঁড়েছি।"

"ফ্রিসকোয় বাড়ি তো! ব্যাটা পয়লা নম্বরের শয়তান!"

"ইতালীয় ভাষা উচ্চারণ করতে পারে না ও, যেখানে যায় লোকে চেয়ার ছুঁড়ে মারে।"

অন্য গায়কটি, তার নাম এডগার সন্ডার্‌স্‌, এদুয়ার্দা জিওভান্নি নাম নিয়ে গান গায়। সে বলল, "উত্তর ইতালির মধ্যে পিয়াসেনজায় গান গাওয়া সবথেকে কঠিন। ওখানে গান গাওয়া সত্যি সোজা কথা নয়।"

এত্তোরে বলল, "ওখানে তোমাদের কীভাবে চেয়ার ছুঁড়ে মারে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। ইতালীয় গান গাইতেই জানো না তোমরা।"

"আকাট মুখ্যু কোথাকার! চেয়ার ছোঁড়ার কথা ছাড়া আর কিছু জানা নেই।" এডগার বলল।

"যারা তোমাদের গান শোনে, তাদেরও তো এছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।" এত্তোরে বলল, "যখন আমেরিকায় ফিরে যাবে তখন স্কালায় কী দুর্দান্ত গেয়েছ সেই হামবড়াই করবে। এদিকে স্কালাতে তো তোমাদের গান ধরতে না ধরতেই থামিয়ে দেবে।"

সিমন্‌স্‌ বলল, "স্কালাতেই গান গাইব সামনের অক্টোবরে—টোস্কা গাইব আমি।"

"আমরাও যাব তাহলে, কী বলো ম্যাক?" ভাইস-কনসালকে বলল এত্তোরে, "ওদের বাঁচাতে হবে তো!"

"বলা যায় না, হয়তো আমেরিকান ফৌজই থাকবে ওদের বাঁচাতে।" বলল ভাইস-কনসাল, "আর এক গ্লাস হবে নাকি সিমন্‌স্‌? সন্ডার্‌স্‌, তুমি?"

"হয়ে যাক।" সন্ডার্‌স্‌ বলল।

"তুমি নাকি রুপোর মেডেল পাচ্ছ শুনলাম—কী ব্যাপারে?" আমাকে জিজ্ঞেস করল এত্তোরে।

"তা তো জানি না। মেডেল যে পাব সেটাই তো জানি না।" আমি বললাম।

"পাবে, পাবে। কোভার মেয়েরা তোমাকে এখন কী চোখে দেখবে ভাবো! ওরা ভাববে তুমি নির্ঘাত শ'দুয়েক অস্ট্রিয়ানকে মেরেছ, কিংবা একাই হয়তো একটা গোটা ট্রেঞ্চ দখল করেছ। তবে আমার মেডেলের জন্যে আমাকে কিন্তু সত্যিই মেহনত করতে হয়েছে।"

"ক'টা পেয়েছ?" ভাইস-কনসাল জিজ্ঞেস করলে।

"সব ক'টাই পেয়েছে।" সিমন্‌স্ বলল, "যুদ্ধটাই তো চলছে ওর জন্যে।"

"দুটো ব্রোঞ্জের আর তিনখানা রুপোর মেডেল পেয়েছি। তবে শুধু একটারই কাগজপত্র এসেছে।"

"অন্যগুলোর কী হল?" সিমন্‌স্ বলল।

"আক্রমণটা সফল হয়নি।" এত্তোরে বলল, "আক্রমণ সফল না হলে মেডেল আটকে রাখা হয়।"

"তুমি ক'বার জখম হয়েছ, এত্তোরে?"

"তিনবার হয়েছি মারাত্মকভাবে। তিনটে জখমি-ফিতে আছে।" জামার আস্তিনটা গুটিয়ে তুলে দেখাল একটা কালো কাপড়ের ওপর তিনটে রুপোলি ফিতে সমান্তরাল ভাবে সেলাই করে কাঁধের আধ ইঞ্চি নীচে জামার হাতায় সাঁটা রয়েছে।

"তোমারও তো একটা আছে।" এত্তোরে বলল, "এগুলোই বেশি ভাল, মেডেলের চেয়ে এগুলো পেতেই বেশি ভাল লাগে আমার। তিনটে হলে বুঝবে কিছু হল। তিন মাস হাসপাতালে শুয়ে থেকে মাত্র একটা তো পেয়েছ।"

"কোথায় চোট লেগেছিল, এত্তোরে?" ভাইস-কনসাল বলল।

জামার আস্তিন গুটিয়ে একটা লাল গভীর দাগ দেখাল এত্তোরে,

"এইখানে। আর পায়ের এখানে একটা—সেটা অবশ্য দেখানো যাবে না, পায়ে পট্টি বাঁধা আছে তো। আর একটা চোট আছে পায়ের পাতায়, তাতে টুকরো টুকরো মরা হাড় রয়ে গেছে, সেগুলো বেশ ফোটে, এখনও একটা ফুটছে। রোজ সকালে একটা করে টুকরো বার করি।"

"কীসে চোট লাগল?" সিমন্‌স্ জিজ্ঞেস করল।

"হাতবোমা—আলুভাতে-বোমা একটা। পায়ের একপাশটা উড়েই গেল। আলুভাতে-বোমা জানো তো?" আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল। বললাম,

"জানি।"

"একটা শুয়োরের বাচ্চা ওটা ছুঁড়ল। মাটিতে পড়ে গেলাম—মনে হল বুঝি মরেই গেলাম। কিন্তু বোমাটার মধ্যে কিছু ছিল না বোধ হয়। শুয়োরের বাচ্চাটাকে আমার রাইফেল থেকে গুলি করে দিয়েছি। আমাকে যাতে অফিসার বলে চিনতে না পারে তার জন্যে সবসময় একটা রাইফেল সঙ্গে রাখি আমি।"

"লোকটাকে কেমন দেখতে?" সিমন্‌স্ জিজ্ঞেস করল। ওর কথার উত্তর না দিয়ে এত্তোরে বলে চলল, "লোকটার কাছে ওই একটাই বোমা ছিল। কেন যে সেটা ছুঁড়েছিল কে জানে! লোকটা বোধ হয় কখনও আসল যুদ্ধ দেখেনি, তাই যেভাবে হোক একটা বোমা ছোঁড়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল। আমিও ব্যাটাকে এক গুলিতে খতম করে দিয়েছি।"

"লোকটাকে যখন মারলে, কেমন দেখাচ্ছিল?" সিমন্‌স্‌ জানতে চাইল।

"যাঃ বাবা, কেমন দেখাচ্ছিল কী করে জানব? আমি ওর পেটে গুলি করেছিলাম—মাথায় গুলি করতে গিয়ে পাছে ফসকে যায়, সেই জন্যে।"

আমি বললাম, "এত্তোরে, তুমি কতদিন অফিসার হয়েছ?"

"দু'বছর। শিগগিরই ক্যাপ্টেন হব। তুমি কতদিন লেফটেন্যান্ট হয়েছ?"

"তিন বছর চলছে।"

"তুমি কোনওদিন ক্যাপ্টেন হতে পারবে না। ইতালীয় ভাষা ভাল জান না তাই।" এত্তোরে বলল, "কথা অবশ্য বলতে পারো, কিন্তু ইতালীয় ভাষায় লেখাপড়া তো ভাল জানো না। ক্যাপ্টেন হতে গেলে শিক্ষাটা ভাল থাকা চাই। তুমি আমেরিকান ফৌজে যোগ দিলে না কেন?"

"দেব হয়তো কখনও।"

"আমি যদি সেটা পারতাম! ক্যাপ্টেনের মাইনে কত, ম্যাক?"

"ঠিক বলতে পারব না, তবে আড়াইশো ডলারের কাছাকাছি হবে বোধহয়।"

"হায় ঈশ্বর! আড়াইশো ডলার দিয়ে কী হবে? তুমি বরং চটপট আমেরিকান ফৌজে ঢুকে পড়ো ফ্রেড, আর আমাকেও নিয়ে নেবার চেষ্টা করো।"

"বেশ।"

"ইতালীয় ভাষায় ফৌজ পরিচালনা করতে পারি, ইংরেজিতে তো সহজেই শিখে নেব।"

"তুমি তো জেনারেল হবে।" সিমন্‌স্‌ টিপ্পনী কাটল।

"না, অত বিদ্যে আমার নেই। জেনারেলকে দুনিয়ার অনেক কিছু জানতে হয়। তোমাদের মতো মালেরা ভাবে যুদ্ধ করা খুব সহজ—তোমাদের তো দ্বিতীয়-শ্রেণির কর্পোরাল হবারও যোগ্যতা নেই।"

"ভাগ্যিস হতে হয়নি।" সিমন্‌স্‌ বলল।

"বলা যায় না—তোমাদের মতো ফাঁকিবাজদের নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলে কী হবে কে জানে। তোমাদের দুটোকে আমার দলে একবার পেলে হত। আর ম্যাক, তোমাকেও—তোমাকে আমার আর্দালি করে নিতাম।"

ম্যাক বলল, "তুমি তো বিরাট লোক এত্তোরে! তবে তুমি বড্ড বেশি যুদ্ধবাদী।"

"যুদ্ধ শেষ হতে হতে আমি কর্নেল হয়ে যাব।" এত্তোরে বলল।

"যদি না শত্রুর হাতে মারা পড়ো।"

"না না, মারা পড়ব না।" জামার কলারটা আর তারকা-চিহ্নগুলো তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল এত্তোরে,

"দেখলে, মরার কথা বললেই এই তারাগুলো ছুঁই আমরা!"

"চলো সিম্‌, এবার যাওয়া যাক।" সন্ডার্‌স্‌ উঠে দাঁড়াল।

"চলো।"

"আচ্ছা, আমিও চলি।" আমি বললাম। দোকানের ঘড়িতে পৌনে ছ'টা বাজে—"চিআও, এত্তোরে।"

"চিআও, ফ্রেড।" এত্তোরে বলল, "তোমার রুপোর মেডেল পাওয়ার খবরটা সত্যিই আনন্দের।"

"আমি কিন্তু খবরটা জানি না।"

"না জানলেও পাবে, ফ্রেড। আমি যখন শুনেছি, তখন পাবেই।"

"আচ্ছা, চলি। আবার যেন কোনও ঝামেলা বাধিয়ো না এত্তোরে।"

"আমার জন্যে ভেবো না। মদ, মেয়েমানুষ, কোনও কিছুতেই আকর্ষণ নেই আমার, কাজেই নিজের ভালটা বোঝার মতো হুঁশ আমার আছে।"

বিদায় জানিয়ে বললাম, "তোমার পদোন্নতির কথা শুনে খুশি হলাম।"

"পদোন্নতির জন্যে বসে আছি নাকি? যুদ্ধের গুণেই ক্যাপ্টেন হব। তিন তারা আর জোড়া তলোয়ারের ওপর মুকুট—এগুলো এবার পাব আমি।"

"তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক।"

"তোমারও হোক। কবে যুদ্ধে ফিরে যাচ্ছ?"

"শিগগিরই।"

"এর মধ্যে একবার তোমাকে দেখতে যাব।"

"চলি তাহলে?"

"আচ্ছা—বাজে মেডেল নিয়ো না কিন্তু।"

পিছন দিকের একটা ছোট রাস্তা দিয়ে দ্রুতই হাসপাতালে ফিরে এলাম।

এত্তোরের বয়েস তেইশ বছর হবে। সানফ্রানসিস্‌কোতে কাকার কাছে মানুষ। তোরিনোতে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে, এমন সময় যুদ্ধ লাগল। ওর এক বোন আছে, তাকেও আমেরিকায় কাকার কাছে পাঠানো হয়েছিল পড়াশোনা করার জন্য। সেই বোন এবার নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবে।

বীর খেতাব পাওয়ার অধিকার এত্তোরের সত্যিই আছে, কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হলেই বীরত্বের আস্ফালনে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে ও। ক্যাথারিন ওকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না।

ক্যাথারিন বলল, "আমাদের এখানেও তো অনেক বীর আছে, কিন্তু তারা চুপচাপই থাকে।"

"আমি তাতে কিছু মনে করি না।"

"আমিও করতাম না, যদি না ওই হামবড়া ভাব আর একঘেয়ে কথায় আমাকে অতিষ্ঠ করে দিত।"

"আজ বলছিল, ও নাকি শিগগিরই ক্যাপ্টেন হবে।"

"শুনে খুশি হলাম। এতেই ও খুশি।"

"আমার অনেক পদোন্নতি হলে তুমি খুশি হবে না?"

"নাঃ! একটু ভাল রেস্তোরাঁতে খেতে পারার মতো পদ হলেই আমি খুশি।"

"সে-পদে তো এখনই আছি।"

"তোমার পদ খুব ভাল। এর চেয়ে বড় পদ আমি চাই না। আরও বড় পদ পেলে তোমার মাথা ঘুরে যেতে পারে। তুমি যে অহঙ্কারী নও তাতেই আমি সব চেয়ে সুখী। অহঙ্কারী হলেও অবশ্য তোমাকে বিয়ে করতাম, কিন্তু নিরহঙ্কার স্বামী পেলেই মেয়েদের শান্তি।"

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছি আমরা। চাঁদ ওঠার কথা, কিন্তু গোটা শহরটার ওপর কুয়াশার একটা আস্তরণ ছড়িয়ে আছে। খানিকপরেই ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। ভেতরে চলে এলাম দু'জনে। বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ঘরের মধ্যে জলের ছাট আসছে না বলে দরজাটা খোলাই আছে।

"আর কার সঙ্গে দেখা হল?" ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করল।

"মেয়ার্স দম্পতি।"

"ওই আর-এক বিচিত্র জুড়ি!"

"মিসেস মেয়ার্স আমাদের জন্যে কিছু নিয়ে আসবেন এখানে।"

"অনেক ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে আসেন উনি। তুমিও কি ওঁর 'সোনার ছেলে' ছিলে?"

"হ্যাঁ, দলের মধ্যে আমিও আছি।"

"তোমরা সবাই ওঁর 'সোনার ছেলে'—'সোনার ছেলে'দের খুব ভালবাসেন উনি। কেমন বৃষ্টি হচ্ছে শুনছ?"

"ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে।"

"তুমি আমাকে বরাবর ভালবাসবে?"

"বাসব।"

"বৃষ্টিতে ভালবাসা ধুয়ে যাবে না তো?"

"না সোনা।"

"ভাল। বৃষ্টিকে আমার ভীষণ ভয় করে।"

"কেন?"

ঘুমে চোখ বুজে আসছে, বাইরে একটানা বৃষ্টি। ও বলছে,

"কী জানি কেন! কিন্তু বরাবরই বৃষ্টিকে ভয় পাই আমি।"

"আমার কিন্তু ভাল লাগে।"

"আমার ভাল লাগে বৃষ্টিতে ভিজতে। কিন্তু মিলনের দিনে বৃষ্টিকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয়।"

"আমি তোমাকে সবসময়ই ভালবাসব।"

"আমিও তোমাকে সবসময় ভালবাসব—ঝড়-তুফানে, তুষারপাতে, শিলা-বৃষ্টিতে—আরও কী-কী দুর্দিন আছে, বলো না গো!"

"জানি না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমিয়ে পড়ো, প্রিয়তম! তোমাকে আমি বরাবর ভালবাসব, যেমনই সময় আসুক না কেন।"

"তুমি কি সত্যিই বৃষ্টিকে ভয় পাও?"

"তোমার কাছে যখন থাকি, তখন পাই না।"

"কেন ভয় করে?"

"জানি না।"

"আমাকে বলো।"

"জোর কোরো না।"

"বলোই না।"

"না।"

"না—বলো।"

"বেশ, বলছি। বৃষ্টিকে কেন ভয় পাই জানো? বৃষ্টির মধ্যে আমার মৃত্যুকে দেখতে পাই আমি।"

"না, না!"

"আবার কখনও কখনও তোমার মৃত্যুও দেখি।"

"সেটা বরং কিছুটা সম্ভব।"

"না, তা নয়, কারণ তোমাকে আমি নিরাপদে রাখতে পারি। কিন্তু নিজেকে কি কেউ আগলাতে পারে?"

"থামো সোনা, এই রাতে পাগলামি কোরো না। আর তো বেশিদিন একসঙ্গে থাকতে পারব না আমরা।"

"নাঃ, মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে—আমি চুপ করছি। যত সব বাজে কথা!"

"সত্যি বাজে কথা।"

"বাজে বাজে, একদম বাজে ভাবনা সব। বৃষ্টিকে আমি ভয় পাই না, মোটেই ভয় করি না বৃষ্টিকে। হে ঈশ্বর, তাই সত্যি হোক, সত্যি যেন ভয় না পাই!" আকুল হয়ে কেঁদে চলে ক্যাথারিন। অনেক সান্ত্বনা দিয়ে থামাই ওকে। বাইরে কিন্তু তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলছে।

একদিন বিকেলে রেসের মাঠে গেলাম আমরা। সঙ্গে ছিল ফার্গুসন আর ক্রোয়েল রজার্স—আমাদের হাসপাতালের সেই সাথীটি, বিস্ফোরকের মুখ খুলতে গিয়ে যে আহত হয়েছিল।

দুপুরে খাওয়ার পরে মেয়েরা গেল সাজগোজ সারতে, আমি আর ক্রোয়েল ততক্ষণ ওর ঘরে বিছানায় বসে রেসের বই থেকে ঘোড়াদের অতীত কার্যকলাপ আর তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে নিলাম। ক্রোয়েলের মাথায় ব্যান্ডেজ, রেসের ব্যাপারে তেমন উৎসাহও নেই ওর। কিন্তু সময় কাটানোর জন্য নিয়মিত রেসের বই পড়ে ও, মাঠের খবরাখবরও রাখে। এখানকার ঘোড়াগুলোর ওপর খুব-একটা আস্থা নেই ওর, কিন্তু এখানে এই-ই সম্বল। বৃদ্ধ মেয়ার্সের ক্রোয়েলকে খুব পছন্দ, তাই ওকে মাঝেমাঝে ঘোড়ার খবর দেয়। মেয়ার্স প্রায় প্রত্যেক রেসেই জেতে, কিন্তু ঘোড়ার খবরাখবর দিতে চায় না সে, কারণ তাতে তার ভাগের টাকায় কম পড়ে যায়। রেস খেলাটা বড় জটিল। যারা অন্য দেশের মাঠে এঁটে উঠতে পারে না তারা সবাই ইতালিতে এসে রেস খেলে। মেয়ার্সের দেওয়া ঘোড়ার খবর খুব কাজে লাগে, কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করতে ভাল লাগে না আমার। অনেক সময় উত্তরই দেয় না, আর যদি দেয়, বেশ বোঝা যায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বলছে। তবু কেন জানি না খবরগুলো ও দেয় আমাদের, বিশেষত ক্রোয়েলকে জানাতে তেমন বিরক্ত হয় না। ক্রোয়েলের চোখ দুটোই বেশি জখম হয়েছিল। আর মেয়ার্সেরও চোখের দোষ, সেইজন্যেই বোধহয় ক্রোয়েলকে পছন্দ করে। মেয়ার্স তার নিজের ঘোড়ার খবর তার স্ত্রীকেও জানায় না কখনও। আর সে-মহিলা জিতুন কিংবা হারুন—অবশ্য বেশির ভাগই হারেন—অনবরত বকবক করেই চলেন।

একটা হুড-খোলা গাড়িতে চেপে আমরা চারজন সান সিরো-য় চললাম। চমৎকার দিন। পার্কের ভেতর দিয়ে, ট্রামলাইনের পাশ দিয়ে, পাকা রাস্তা ধরে শহরের বাইরের ধুলো-ওড়া কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম আমরা। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে লোহার রেলিং-ঘেরা ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির চারধার ঘেরা বিশাল বাগান, মাঝখানে নালা দিয়ে বয়ে চলেছে জল, একপাশে সবজি-খেত, তার পাতায় লেগে আছে পথের ধুলো। মাঠের ওপারে অনেক খামারবাড়ি, তাদের ঘন সবুজ ফসলের খেত, আর জল দেওয়ার খাল। উত্তর দিকে পর্বতমালা চোখে পড়ে। রাস্তা দিয়ে আরও বহু গাড়ি চলেছে রেসের মাঠের দিকে।

সামরিক উর্দির দৌলতে বিনা-কার্ডেই আমরা ঢুকে গেলাম রেসের মাঠে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘোড়দৌড়ের কর্মসূচি কিনে নিলাম। ভেতরে ঢুকে মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে ঘোড়দৌড়ের পথের মসৃণ পুরু ঘাস পেরিয়ে ঘোড়াদের থাকার ঘেরা জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। এখানকার দামি টিকিটের গ্যালারিগুলো কাঠের তৈরি আর

বেশ পুরনো। গ্যালারির নীচে আর আস্তাবলের কাছে সার-দেওয়া টিকিটঘরের চালা। ভেতর-মাঠের বেড়ার গা ঘেঁষে একদল সৈনিকের জটলা। ঘোড়ার জায়গাতেও বেশ কিছু লোকের ভিড়। প্রধান গ্যালারির পেছনে গাছতলায় ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গোল করে হাঁটানো হচ্ছে। অনেক পরিচিতের সঙ্গে দেখা হল। ফার্গুসন আর ক্যাথারিনের জন্যে দুটো চেয়ার জোগাড় করে দিয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখতে লাগলাম। মাথা নিচু করে গোল হয়ে ঘুরছে, সঙ্গে লাগাম ধরে চলেছে তাদের সহিস। একটা ঘোড়ার কালো রঙে কেমন যেন বেগুনি আভা। ক্রোয়েল বলল সে দিব্যি করে বলতে পারে ওটা ঘোড়াটার নিজস্ব রঙ নয়। আমাদেরও তাই মনে হল। ঘণ্টা বাজার একটু আগে বেরিয়ে এসেছে ঘোড়াটা—রেস-সূচিতে নাম দেখলাম জ্যাপালাক। এ-রেসের একটা ঘোড়াও হাজার লিরে জিততে পারেনি। ক্যাথারিনের ধারণা ঘোড়ার রঙটায় কিছু কারচুপি করা হয়েছে, ফার্গুসন সঠিক মতামত দিতে পারল না, আমারও মনে হল রঙটা সন্দেহজনক। আমরা সবাই একমত হয়ে চাঁদা করে ঘোড়াটার ওপর একশো লিরে বাজি ধরলাম। দেখলাম লাভের অঙ্কটা ভালই রয়েছে। জিতলে তিরিশগুণ পাওয়া যাবে। ক্রোয়েল গেল টিকিট কিনতে, আমরা দেখতে লাগলাম জকিরা ঘোড়াগুলোকে আর-এক পাক ঘুরিয়ে গাছতলা দিয়ে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দৌড়পথের দিকে। তারপর ধীর কদমে এগিয়ে গেল বাঁকের মুখে, যেখান থেকে দৌড় শুরু হবে। রেস দেখার জন্যে প্রধান গ্যালারির ওপরে চলে গেলাম। সে-সময় সান সিরোতে ঘোড়দৌড় শুরু করার জন্যে রবারের দড়ির ব্যবস্থা ছিল না। ঘোড়াগুলোকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল—দূরে দৌড়পথের ওপরে ছোট্ট দেখাচ্ছিল তাদের। ঘোড়ার চাবুকের একটা সপাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল। ক্রমশ ঘোড়াগুলো আমাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল—একেবারে সামনে কালো ঘোড়াটা। মোড় ঘুরতেই দূরে দেখা গেল অন্যদের পিছনে ফেলে অনেকটা দূরে চলে গেছে সেটা, আর জকি আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে লাইনে রাখতে। পরের বারে ঘুরে আসতে দেখা গেল, কালো ঘোড়াটা প্রায় পনেরো ঘোড়ার দূরত্ব এগিয়ে রয়েছে এবং দৌড় শেষ হবার পরও না থেমে আর এক পাক ঘুরে গেল ঘোড়াটা। ক্যাথারিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কী মজা, না? আমরা প্রায় তিন হাজার লিরে বেশি পাব। ঘোড়াটা দারুণ!"

ক্রোয়েল বলল, "টাকা পাওয়ার আগেই ওর রঙটা না উঠে যায়।"

ক্যাথারিন বলল, "মিস্টার মেয়ার্সও এইটাই ধরেছে কিনা কে জানে!"

হাঁক দিয়ে মেয়ার্সকে জিজ্ঞেস করলাম,

"জেতা ঘোড়াটার ওপরেই ধরেছিলেন নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন মেয়ার্স।

"আমি কিন্তু ধরিনি।" বললেন মেয়ার্সগিন্নি, "তোমরা কোন্‌টা ধরেছিলে?"

"জ্যাপালাক।"

"সত্যি? ওটাতে তো এক লিরাতে পঁয়ত্রিশ গুণ পাওয়া যাবে!"

"ওর রঙটা আমাদের খুব পছন্দ হয়েছিল।"

"আমার বাপু হয়নি। কেমন যেন নোংরা লাগল আমার। তাছাড়া ওটার ওপরে ধরতে সবাই বারণও করল।"

"তেমন কিছু পাওয়া যাবে না ওটার থেকে।" বললেন মেয়ার্স।

আমি বললাম,

"লেখা আছে এক লিরাতে পঁয়ত্রিশ!"

"শেষ অবধি তেমন বিশেষ-কিছু জুটবে না।" মেয়ার্স বললেন, "প্রচুর টাকা ধরা হয়ে গেছে ওর ওপরে।"

"কারা ধরল?"

"ক্যাম্পটনরা ধরেছে। এখন এক লিরাতে দু' লিরেও পাবে কিনা সন্দেহ!"

ক্যাথারিন বলল, "তা হলে আমরা তিন হাজার লিরে পাব না? এরকম জালিয়াতির ঘোড়দৌড় আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

"দু'শো লিরে পাওয়া যাবে।"

"হুঃ, ওতে কী-ই বা হবে! ভাবলাম হয়তো তিন হাজার লিরে পাব।"

"যত্ত সব প্যাঁচোয়া ব্যাপার!" ফার্গুসন বলল।

"ব্যাপারটা এমন প্যাঁচোয়া না হলে কি আর ওটাকে ধরা হত!" ক্যাথারিন বলল। "তবে তিন হাজার লিরে পেলে বেশ হত।"

ক্রোয়েল বলল, "নীচে যাওয়া যাক। একটু মদও খাওয়া যাবে, আর কত পাব সেটাও দেখা যাবে।"

নম্বর লিখে যেখানে টাঙিয়ে দিয়েছে সেখানে গেলাম। টাকা দেওয়ার ঘণ্টা বাজল। শেষ অবধি জুটল দশ লিরেতে সাড়ে আঠারো লিরে—অর্থাৎ বাজি ধরার টাকাটা বাদ দিলে, পাওয়া গেল তার চেয়ে কম।

প্রধান গ্যালারির নীচের পানশালাটায় গিয়ে একটা করে হুইস্কি আর সোডা দিতে বললাম। সেখানে জনা দুই পরিচিত ইতালিবাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আর দেখা হল ভাইস-কনসাল ম্যাকাডেমের সঙ্গে। আমরা যখন ওপরে মেয়েদের কাছে ফিরে গেলাম, তখন ওরাও এল সঙ্গে।

ইতালিবাসী দু'জন একেবারে কেতাদুরস্তভাবে আলাপ করল ওদের সঙ্গে। ক্যাথারিন আর ম্যাকাডেম গল্প করতে লাগল, আমরা আবার বাজির টিকিট কিনতে নীচে নেমে এলাম। মিস্টার মেয়ার্স কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্রোয়েলকে বললাম,

"জিজ্ঞেস করো না, উনি কীসের ওপর ধরছেন।"

"আপনি কার ওপর ধরেছেন, মিস্টার মেয়ার্স?" ক্রোয়েল জিজ্ঞেস করল। মেয়ার্স নিজের অনুষ্ঠানলিপি বার করে পাঁচ নম্বরেরটা পেন্সিল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ক্রোয়েল বলল,

"আমরাও ওটার ওপর ধরলে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"ধরো, তবে গিন্নিকে বোলো না যেন খবরটা আমার থেকে পেয়েছ।"

আমি বললাম, "একটু মদ চলবে নাকি?"

"না, ধন্যবাদ। আমি মদ খাই না।"

একশো লিরে দিয়ে বাজির টিকিট কিনে আবার এক দফা হুইস্কি-সোডা খেলাম। বেশ ভাল লাগছিল। আরও জনা দুই পরিচিত ইতালিয়ানকে জুটিয়ে ফেললাম, আর প্রত্যেকের সঙ্গেই একবার করে পান করলাম। তারপর ফিরে গেলাম ক্যাথারিন আর ফার্গুসনের কাছে। এবারের ইতালিয়ান দু'জনও আগের দু'জনের মতোই কেতাদুরস্ত। খানিক পরে কারুরই আর বসার জো রইল না। টিকিটটা ক্যাথারিনকে দিলাম। ও বলল, "কোন্ ঘোড়াটা?"

"জানি না, মেয়ার্সের পছন্দ।"

"নামটাও জানো না?"

"না। ওটা অনুষ্ঠানলিপিতে পাবে। পাঁচ নম্বর বোধ হয়।"

"অদ্ভুত ভরসা বটে তোমার!" ও বলল।

পাঁচ নম্বর জিতল ঠিকই, কিন্তু বরাতে কিছুই জুটল না। মিস্টার মেয়ার্স খুব চটে গিয়ে বললেন,

"দু'শো লিরে দিলে তবে কুড়ি লিরে পাবে। দশ লিরেতে বারো লিরে পাওয়া গেল—এ-খেলার কোনও মানে হয় না। গিন্নি তো ওদিকে কুড়ি লিরে হেরেছেন।"

ক্যাথারিন আমাকে বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে নীচে যাব।"

ইতালিয়ানরা উঠে দাঁড়াল। আমরা দু'জনে নীচে নেমে বেড়া-দেওয়া ঘাসজমিটায় গেলাম।

"তোমার ভাল লাগছে?" জানতে চাইল ক্যাথারিন।

"ভালই লাগছে বোধহয়।"

"তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু আমি লোকের ভিড় একদম সইতে পারি না!"

"বেশি লোকের সঙ্গে তো দেখা করছি না।"

"কিন্তু মেয়ার্স-দম্পতি, তারপর ওই ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক আর তার বউ, মেয়ে—"

"ও তো আমার হুন্ডি ভাঙিয়ে দেয়।"

"ও না দিলে অন্য কেউ দিত। আর শেষের ওই চারটে ছেলে একেবারে অসহ্য।"

"আমরা তাহলে এখান থেকেই দাঁড়িয়ে রেস দেখি ।"

"তাহলে বেশ হয়! আর শোনো, এমন একটা ঘোড়ার ওপর ধরি যেটার নামই শুনিনি, আর মিস্টার মেয়ার্স যেটা ধরবেন না কখনও।"

"বেশ, তাই হোক।"

যে-ঘোড়াটার ওপর ধরলাম সেটার নাম 'লাইট ফর মি' —পাঁচ ঘোড়ার রেসে চতুর্থ হল সেটা। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম মাটি কাঁপিয়ে ঘোড়াগুলোর ছোটা। আর দেখছিলাম দূরে আকাশের গায়ে পর্বতমালা—এপাশে ঘন গাছপালা, আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপারে মিলান শহর।

"এখন বেশ হালকা লাগছে।" ক্যাথারিন বলল। দৌড় শেষ করে ঘর্মাক্ত ঘোড়ার দল ফিরে আসছে গেট দিয়ে, তাদের পিঠের ওপর জকিরা। গাছের তলায় গিয়ে থামবে ওরা।

"তুমি একটু মদ খাও না। এখানে বসেই ঘোড়া দেখতে দেখতে খেতে পারবে।" ক্যাথারিন বলল।

"নিয়ে আসি তাহলে।"

"ওদের লোকই নিয়ে আসবে।"

হাতের ইশারায় ডাকল ও। 'প্যাগোডা' পানশালা থেকে বেরিয়ে এল একজন বেয়ারা।

গোল একটা লোহার টেবিল ঘিরে বসলাম আমরা দু'জন।

"শুধু যখন আমরা দু'জন থাকি, তখন তোমার বেশি ভাল লাগে না?"

"লাগে।" আমি বললাম।

"সকলের মধ্যে থাকলে আমার খুব একা মনে হয়।"

"এখানে তো আমরা খুব ভাল আছি।"

"হ্যাঁ, এই ব্যবস্থাটাই খুব ভাল হয়েছে।"

"খুব ভাল।"

"তোমার আনন্দ আমি মাটি করব না। তুমি বললেই আমি আবার ওখানে ফিরে যাব।"

"না, আমরা এখানে বসেই পান করব, তারপর নীচে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে স্টিপল্‌চেজের দৌড় দেখব।"

"সত্যি, আমার জন্যে তুমি যে কত করো!"

খানিকটা সময় দু'জনে একসঙ্গে কাটিয়ে আবার যখন ফিরে গেলাম সকলের মাঝে, তখন যেন নতুন করে আনন্দ পেলাম। সময়টা খুব ভাল কাটল।

সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই ঠান্ডা হয়ে এল রাত। ক্রমে দিনগুলোতেও লাগল শীতের আমেজ। গাছের পাতার সবুজ মিলিয়ে গেল, প্রকৃতির শরীরে গ্রীষ্মের বিদায়-চিহ্ন।

সীমান্তে যুদ্ধের সংবাদ ভাল নয়। সান গাব্রিয়েলি দখল করা যায়নি। বাইনসিৎসার মালভূমির যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সান গাব্রিয়েলির যুদ্ধও শেষ হয়ে এল এমাসের মাঝামাঝি। জায়গাটা দখল হয়নি। এত্তোরে ফিরে গেছে যুদ্ধে। রেসের মাঠে খেলা বন্ধ, ঘোড়াগুলো চলে গেছে রোমে। বিস্ফোরকে আহত আমার সঙ্গী ক্রোয়েল চলে গেছে রোমে, সেখান থেকে ফিরে যাবে আমেরিকায়।

যুদ্ধ-বিরোধী চেতনা জেগেছে মানুষের মনে। শহরে দু'বার এই নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে। তুরিনে তো দাঙ্গা মারাত্মক চেহারা নিয়েছিল।

ক্লাবে এক ব্রিটিশ মেজর বললেন, সান গাব্রিয়েলি আর বাইনসিৎসাতে ইতালিয়ানদের দেড় লক্ষ সৈন্য মারা গেছে। এ ছাড়া কার্সোতে চল্লিশ হাজার। ক্লাবে মেজরের সঙ্গে সুরাপান করতে করতে কথা বলছিলাম। মেজর বললেন, ইতালিয়ানরা তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত দখল করেছে। ফ্লান্ডার্সের যুদ্ধের অবস্থা খারাপের দিকে যাবে। আর হতাহতের সংখ্যা এ-বছরের মতোই থাকলে আর এক বছরের মধ্যেই মিত্রশক্তির বারোটা বেজে যাবে। মেজর বললেন, "আসলে সবারই হাল খারাপ হয়ে এসেছে, শুধু জানতে পারছি না বলে নিশ্চিন্তে আছি। শেষ হয়ে এসেছি, কিন্তু সেটা না বোঝাই ভাল। যে-দেশ সবার শেষে সেটা টের পাবে, তারাই যুদ্ধে জিতবে।"

গেলাস আবার ভরে নিয়ে কথাবার্তা চালাতে লাগালাম। ক্লাবে আর কেউ নেই, বিরাট দুটো চামড়ায়-মোড়া চেয়ারে আরাম করে বসে কথা বলছি দু'জনে। চেয়ারের চামড়া ঝকঝক করছে, মেজরের চমৎকার বুটের চামড়াও পালিশে মসৃণ।

মেজর এই যুদ্ধের জঘন্যতার কথা বললেন, "যুদ্ধবিশারদরা বোঝে শুধু সৈন্যদল আর সৈন্যবল। তারা সব সময়েই সৈন্যদল বাড়ানোর জন্যে ব্যস্ত থাকে, তারপর তারা এলে তাদের শেষ করে দেয়। জার্মানরা যুদ্ধে জিতছে, কারণ ওরা খাঁটি সৈনিক। ওই হুনেরা সত্যিই লড়াই করতে জানে, কিন্তু ওদেরও বারোটা বেজে এসেছে।" রাশিয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। মেজর বললেন, "ওরাও ইতিমধ্যেই খতম হয়ে গেছে।" শিগগিরই নাকি সেটা বোঝা যাবে। তারপর অস্ট্রিয়ানরা। তারাও শেষ হয়ে গেছে। ওরা যদি কিছু জার্মান সৈন্য পেত তাহলে জিততে পারত। জিজ্ঞেস করলাম, "কী মনে হয়, এ-বছরের শীতকালে কি ওরা আক্রমণ করবে?"—"অবশ্যই করবে। ইতালিয়ানরা যে বেহাল হয়ে পড়েছে, সেটা সবাই জানে। জার্মানরা যখন ত্রেন্তিনো দিয়ে নেমে এসে ভিসেন্‌ৎসার রেলপথ বন্ধ করে দেবে, তখন ইতালিয়ানদের হালটা কী হবে?" বললাম, "১৯১৬-তেও ওরা সে-চেষ্টা করেছিল।" "জার্মানদের বেলায়

নয়।” বললাম, “জার্মানদের বেলাতেই।” মেজর বললেন, “এবার বোধ হয় ওরা আরও জটিল কোনও পন্থা খুঁজে বার করবে। আর বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই খতম হবে।” বললাম, “এবার যেতে হবে। হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।” তিনি বললেন, “বিদায়!” তারপর গভীর উচ্ছ্বাসে আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন।

মেজরের মধ্যে দুই বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ দেখা গেল—পৃথিবী সম্পর্কে গভীর নৈরাশ্য আর ব্যক্তিগত জীবনে প্রফুল্লতা।

হাসপাতালে ফেরার পথে নাপিতের দোকানে গিয়ে ক্ষৌরি করে নিলাম। আমার পা প্রায় ভাল হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এতটা সারার কথা নয়। দিন তিনেক আগে পরীক্ষা করিয়েছি। মাগ্‌গিওরে হাসপাতালে চিকিৎসার কিছু বাকি আছে এখনও। রাস্তার ধার দিয়ে না খুঁড়িয়ে চলা অভ্যেস করছি।

বড় থামগুলোর খিলানের নীচে বসে এক বৃদ্ধ কালো কাগজ কেটে কেটে ছবি তৈরি করছিল, তাই দেখতে দাঁড়িয়ে গেলাম। দুটি মেয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে—বৃদ্ধ ওদের দিকে একবার করে তাকাচ্ছে আর দ্রুত হাতে কাগজ কেটে যাচ্ছে। ঘাড়টা তার একপাশে হেলানো, মেয়েদুটি খিলখিল করে হাসছে। ছবিটা শেষ করে কাগজে আঁটার আগে একবার আমাকে দেখিয়ে নিল, তারপর দিয়ে দিল মেয়েদের। নিজেদের ছবি দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা। বেশ চেহারা দু'জনের—ওদের মধ্যে একজন হাসপাতালের সামনে মদের দোকানে কাজ করে।

“মেয়েগুলো সুন্দরী।” বৃদ্ধ বলল, “তোমারটা করব, তেনেন্তে?”

বললাম, “করো।”

“টুপিটা খোলো।”

“না, টুপি শুদ্ধুই হোক।”

“টুপি পরা থাকলে তেমন সুন্দর হবে না।”

তারপর কী ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে, “তা হোক, সামরিক লোক বলে বোঝা যাবে।”

কালো কাগজের ওপর দ্রুত কেটে কেটে তৈরি করল ছবিটা, তারপর একটা সাদা কার্ডের ওপর আটকে আমার হাতে দিল সেটা।

“কত দিতে হবে?”

“ও ঠিক আছে।” হাত নাড়ল বৃদ্ধ, “ও আমি এমনি দিলাম তোমায়।”

কয়েকটা পয়সা বের করলাম পকেট থেকে,

“এই ক'টা নাও, আমার ভাল লাগবে।”

“না না, ওটা শুধু আনন্দের জন্যে করেছি আমি। তোমার প্রেমিকাকে দিয়ো।”

“অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।”

"অবশ্যই হবে।"

হাসপাতালের পথ ধরলাম আবার।

ফিরে এসে দেখি কয়েকটা চিঠি এসেছে আমার নামে। একটা আমাদের অফিস-সংক্রান্ত, বাকিগুলো ব্যক্তিগত। চিকিৎসাশেষে সম্পূর্ণ সুস্থ হবার জন্যে আরও তিন সপ্তাহ ছুটি পাব, তারপর ফিরে যেতে হবে। ভাল ক'রে পড়লাম চিঠিটা। এবার তাহলে ফেরার চিন্তা করতে হবে। আরোগ্য লাভের ছুটি শুরু ৪ঠা অক্টোবর থেকে, অর্থাৎ তখন আমার চিকিৎসা শেষ হবে। আর তিন সপ্তাহ মানে ২১ দিন, আমার ছুটি শেষ হবে ২৫শে। হাসপাতালে বলে গেলাম আমি বেরোচ্ছি। বাইরে গিয়ে একটা রেস্তোরাঁতে বসে রাতের খাওয়া সারলাম, সেই সঙ্গে টেবিলে বসে খবরের কাগজ আর বাকি চিঠিগুলো পড়লাম। একটা চিঠি দাদুর। বাড়ির খবর রয়েছে তাতে—দেশের কাজের প্রেরণাদায়ক বাণী, আর দু'শো ডলারের একটা চেক। আমাদের মেসের পাদ্রি-বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে একটা চিঠি—নিতান্তই একঘেয়ে। পরিচিত এক জন ফরাসিদের সঙ্গে পালাতে গিয়ে একদল জংলির মধ্যে গিয়ে পড়েছে—তার ঘটনা লিখে জানিয়েছে আমায়। ছোট্ট একটা চিঠি রিনাল্‌দির। জানতে চেয়েছে—আর কতদিন মিলানোর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব! সেই সঙ্গে ফরমাশ করেছে গ্রামোফোনের রেকর্ড নিয়ে যাওয়ার। সঙ্গে রেকর্ডের একটা তালিকাও পাঠিয়েছে।

খাবারের সঙ্গে এক বোতল চিয়ান্তি খেলাম। খাওয়ার পর কফির সঙ্গে এক বোতল কগনাক। কাগজ পড়া শেষ করে চিঠিপত্র পকেটে পুরে খবরের কাগজটা আর বিলের জন্য বখশিশ টেবিলের ওপর রেখে হাসপাতালের দিকে পা বাড়ালাম। ঘরে এসে পোশাক পাল্টে বারান্দার দিকের দরজার পর্দাটা টেনে খাটে বসে মিসেস মেয়ার্সের দেওয়া বোস্টনের খবরের কাগজগুলো পড়তে শুরু করলাম। একরাশ কাগজ জড়ো হওয়ার ফলে খবর পড়ার উৎসাহটা নষ্ট হয়ে গেছে। কাগজ পড়ার সময় না হলেও একটু পড়লাম। যত্ত সব পুরনো খবর। ন'টার আগে ক্যাথারিনের আসার কথা নয়। প্রথম যখন ওপরে ও এল তখন ওর পায়ের আওয়াজ পেলাম, তারপর আর একবার হল ঘর দিয়ে যেতে দেখলাম। পর পর অনেকগুলো ঘরে গিয়ে শেষে এল আমার ঘরে।

"দেরি হয়ে গেল সোনা।" ক্যাথারিন বলল, "অনেক কাজ ছিল। কেমন আছ?"

আমার চিঠিপত্রের কথা বললাম ওকে। আমার ছুটির খবরও বললাম।

"বাঃ, দারুণ!" ও বলল, "কোথায় যাবে?"

"কোত্থাও না। এখানেই থাকব।"

"পাগলামি কোরো না। একটা জায়গা ঠিক করো। আমিও যাব।"

"কী করে ব্যবস্থা করবে?"

"সেটা এখন কী করে বলি! তবে ব্যবস্থা একটা করব ঠিক।"

"অপূর্ব! সত্যি তুমি আশ্চর্য!"

"কিচ্ছু না। কিন্তু যখন হারানোর কিছু থাকে না, তখন জীবনকে যে-কোনও দিকে চালিয়ে নেওয়া যায়।"

"মানে?"

"কিছু না। আমি শুধু ভাবছিলাম, একদিন যাকে বিশাল বাধা মনে হত, আজ তা কত তুচ্ছ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমার ধারণা তোমার ছুটির ব্যবস্থা করা কঠিন হবে।"

"কিচ্ছু কঠিন হবে না। দরকার হলে কাজ ছেড়ে দেব। তবে ততদূর গড়াবে না।"

"কোথায় যাব?"

"যেখানে হোক। ওতে আমার কিছু যায়-আসে না। যেখানে তুমি যেতে চাইবে—যেখানে কাউকে চিনি না।"

"কোথায় যাব, সে ব্যাপারে তোমার কোনও মতামত নেই?"

"নাঃ। সব জায়গাই ভাল লাগবে আমার।"

মনে হল ওর মনটা কেমন যেন অসাড় হয়ে আছে।

"কী হয়েছে তোমার, ক্যাথারিন?"

"কই, কিছুই হয়নি তো।"

"নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।"

"না না, সত্যি কিছু হয়নি।"

"আমি জানি, কিছু একটা হয়েছে। আমাকে বলো সোনা! তুমি তো আমাকে সব বলতে পারো।"

'বলছি তো, কিছু হয়নি।"

"বলো!"

"দেখো, আমি বলতে চাই না। ভয় হয়, তাতে তোমাকে অসুখী করব, দুশ্চিন্তায় ফেলে দেব।"

"না, তা হবে না।"

"ঠিক বলছ? আমার তেমন কোনও চিন্তা নেই। শুধু তুমি দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে ভেবে ভয় হয়।"

"তোমার যদি দুশ্চিন্তা না হয়, আমারও হবে না।"

"আমি বলতে চাই না।"

"বলো।"

"বলতেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি মা হতে চলেছি—প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে। তুমি চিন্তা করছ না তো? সোনা আমার, চিন্তা কোরো না, তোমার কোনও ভাবনা নেই।"

"বেশ।"

"ঠিক আছে তো?"

"অবশ্যই।"

"আমি সব রকম চেষ্টা করে দেখলাম, সব রকম ওষুধ খেলাম—কিছুতেই কিছু হল না।"

"আমি কোনও দুশ্চিন্তা করছি না।"

"আমি নিরুপায়, কোনওমতেই ঠেকাতে পারলাম না। তবে মোটেই ভাবছি না আমি। তুমিও ভাববে না কিংবা মন খারাপ করবে না।"

"আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি।"

"তাই তো বলছি, সেটাই তুমি করতে পারবে না। সকলেরই তো সন্তান হয়—এ তো একান্ত সাধারণ ব্যাপার।"

"তুমি সত্যিই অপূর্ব!"

"মোটেই না। কিন্তু তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে তোমায় কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়। শুধু তুমি দুশ্চিন্তা করতে পারবে না। আমি দেখছি তুমি চিন্তা করছ। বন্ধ করো, এক্ষুনি চিন্তা করা বন্ধ করো। বরং একটু মদ খাও, মদ খেলেই তোমার মনটা খুশি থাকে।"

"না না, আমি বেশ খুশিই আছি। থাকব না? তুমি যে কী সুন্দর, কী অপরূপ!"

"না, আমি কিচ্ছু না। কিন্তু তুমি যাওয়ার একটা জায়গা ঠিক করো, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব। অক্টোবর মাসে খুব ভাল হবে, চমৎকার সময় কাটবে আমাদের। তারপর তুমি যখন যুদ্ধে চলে যাবে তখন রোজ চিঠি লিখব তোমাকে। তখন তুমি কোথায় থাকবে?"

"সেটা এখনও ভাবিনি। ভালভাবেই থাকব কোথাও—ও আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব।"

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ করে রইলাম। অপলকে দেখছি ওকে। আমার বিছানায় বসে আছে ও, এত কাছে অথচ কেউ কাউকে স্পর্শ করছি না, তফাত হয়ে বসে আছি, ঘরে কেউ এলে যেভাবে সজাগ হয়ে বসি দু'জনে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা তুলে নিল ও।

"তুমি রাগ করোনি তো?"

"না তো।"

"জালে জড়িয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে না?"

"তা হয়তো একটু হচ্ছে, তবে তোমার জন্যেই যে জড়িয়ে পড়েছি সেটা মনে হচ্ছে না।"

"আমিও তো বলছি না যে আমার জন্যে জড়িয়ে পড়েছ। বোকার মতো কথা বোলো না। এমনিই জড়িয়ে পড়ার কথা বলছি।"

"শরীরের দিক থেকে তো সব সময়েই জড়িয়ে পড়ে আছি বলে মনে হয়।"

ও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, মনে হল যেন কত দূরে সরে গেছে, অথচ একটুও নড়েনি জায়গা থেকে, হাতটাও সরিয়ে নেয়নি। বলল,

" 'সব সময়' কথাটা কিন্তু খুব ভাল নয়।"

"মাপ করো, আর বলব না।"

"ঠিক আছে। কিন্তু জানো তো আমার আগে কখনও বাচ্চা হয়নি কিংবা কারও কাছে সমর্পণও করিনি নিজেকে। তুমি যেভাবে আমাকে চেয়েছ, সেভাবেই তোমার কাছে এসেছি। আর এখন কিনা বলছ 'সব সময়'!"

"আমার জিভটা কেটে ফেলব আমি।"

"ও সোনা!" আবার ফিরে এসেছে দূরের জগৎ থেকে, "আমার কথায় কষ্ট পেয়ো না।"

আবার আমরা এক হয়ে গেছি, আত্মসচেতন ভাবটা কোথায় সরে গেছে। ও বলছে,

"সত্যিই আমরা এক আত্মা, ইচ্ছে করে কেউ কখনও কাউকে ভুল বুঝব না।"

"না, কক্ষনো ভুল বুঝব না।"

"কিন্তু সবাই তাই করে। পরস্পরকে ভালবাসে, তারপর ইচ্ছে করে ভুল বোঝে, ঝগড়া করে আর হঠাৎ একসময় দেখা যায়, তারা আর এক নেই।"

"আমরা ঝগড়া করব না।"

"কক্ষনো না। কারণ পৃথিবীতে একদিকে আমরা দু'জন, অন্যদিকে আর যা-কিছু। আমাদের মধ্যে বিভেদ ঘটলে আমরা শেষ হয়ে যাব, সম্পূর্ণভাবে অন্যদের কবলে গিয়ে পড়ব।"

"আমাদের কেউ আয়ত্তে পাবে না।" আমি বলি, "কারণ, তুমি বীর—সাহসী মানুষদের খারাপ কিছু হয় না।"

"কিন্তু তারা মরে।"

"মাত্র একবার।"

"কী জানি! কিন্তু কথাটা কে বলেছে?"

"কাপুরুষরা সহস্রবার মরে, কিন্তু বীরের মৃত্যু হয় মাত্র একবার—এই কথাটা?"

"হ্যাঁ, ওই কথাটা। কে বলেছে?"

"তা জানি না।"

"সে নিজে নিশ্চয়ই কাপুরুষ ছিল। কাপুরুষের ব্যাপারটা তার ভাল জানা ছিল, কিন্তু বীরের ব্যাপারে সে কিছুই জানত না। বীরের অন্তত দু' হাজার বার মৃত্যু হয়, অবশ্য যদি সে বুদ্ধিমান হয়। তবে এটা সে লোকের কাছে বলে না, এই যা।"

"আমি জানি না—বীরের মাথায় কী আছে বোঝা কঠিন।"

"হ্যাঁ, এভাবেই লোকের কাছে নিজেদের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখে তারা।"

"এ-ব্যাপারে তুমি খুব ভাল জানো দেখছি।"

"ঠিক বলেছ।"

"তুমি সাহসিকা।"

"না, কিন্তু হতে চাই।"

"আমি কিন্তু বীর হতে চাই না, আমি জানি আমার ক্ষমতা কতটা। অনেকটা বেসবল খেলার সাধারণ খেলোয়াড়ের মতো—দু'শো তিরিশবার ব্যাট করার পরেও জানে যে এর চেয়ে ভাল খেলতে কিছুতেই পারবে না সে।"

"সে আবার কী? বেসবল-খেলোয়াড়রা দু'শো তিরিশ বার ব্যাট করে? বেশ মজা তো!"

"মজা কিচ্ছু নয়—তার মানে সে বেসবল খেলায় মাঝারি দরের খেলোয়াড়।"

"তবু খেলোয়াড় তো বটে!"

"বোধ হয় আমরা দু'জনেই অহঙ্কারী—কিন্তু তুমি হচ্ছো বীর।"

"না, বীর নই, কিন্তু হবার আশা রাখি।"

আমি বললাম, "আমরা দু'জনেই বীর, আর মদ খেলে আরও বড় বীর হয়ে উঠি।"

"আমরা খুব চমৎকার মানুষ।" ক্যাথারিন বলল। আলমারি থেকে একটা গেলাস আর এক বোতল কগনাক এনে দিল।

"একটু খাও।"

"আমার দরকার নেই।"

"তা হোকগে, একটু খাও।"

"বেশ।"

গেলাসের এক-তৃতীয়াংশ ভরে খেয়ে নিলাম। ও বলল,

"বেশি খেয়ে ফেলেছ। ব্র্যান্ডি যদিও বীরপুরুষদের জন্যেই, তবু বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।"

"যুদ্ধের পর আমরা কোথায় থাকব?"

"খুব সম্ভবত বৃদ্ধাশ্রমে। গত তিন বছর ধরে বাচ্চাদের মতো স্বপ্ন দেখেছি বড়দিনের

সময় যুদ্ধ শেষ হবে। কিন্তু এখন মনে হয়—আমাদের ছেলে যখন লেফটেন্যান্ট-কম্যান্ডার হবে, তখন শেষ হবে এই যুদ্ধ।"

"জেনারেলও হতে পারে।"

"শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ হলে দুটোই হওয়ার চেষ্টা করবার মতো সময় পাবে ও।"

"তুমি একটু খাবে না?"

"না, তুমি খেলেই খুশি হও, আর আমার ঠিক তার উল্টোটা—খেলে মাথা ঘোরে।"

"তুমি কখনও ব্র্যান্ডি খাওনি?"

"নাঃ। আমি তোমার বড্ড সেকেলে বউ।"

হাত বাড়িয়ে মেঝে থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে আর এক গেলাস ঢাললাম। ক্যাথারিন বলল,

"আমি বরং একবার তোমার স্বদেশীয়দের দেখে আসি।"

উঠে পড়ল ও, "আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়বে বোধ হয়?"

আমি বললাম, "যেতেই হবে?"

ও বলল, "হয় এক্ষুনি, নয়তো পরে।"

"বেশ, তাহলে এক্ষুনি।"

"একটু দেরি হবে ফিরতে।"

"ততক্ষণ কাগজটা পড়ে ফেলি।"

সে-রাতে ভীষণ ঠান্ডা পড়ল, পরের দিন শুরু হল বৃষ্টি। মাগগিওরে থেকে ফেরার সময় প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল, একেবারে কাকভেজা হয়ে ঘরে ফিরলাম। আমার ঘরের বাইরে বারান্দার ওপর তীব্র বেগে জলের ছাট আসছে, ঠান্ডা হাওয়া বারবার বন্ধ দরজার কাচের ওপর ঘা দিচ্ছে। পোশাক বদলে খানিকটা ব্র্যান্ডি খেলাম, কিন্তু স্বাদ পেলাম না। রাতে বমি হল, সকালে জলখাবার পর শুরু হল গা বমি-বমি ভাব।

হাউস সার্জেন বললেন, "কোনও সন্দেহই নেই। ওর চোখের সাদাটার দিকে চেয়ে দেখো; মিস।"

মিস গেগ দেখল, তারপর আমাকে একটা আয়না এনে দিল। চোখের সাদায় হলুদের ছোপ। তার মানে জন্ডিস। দু'সপ্তা অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলাম। আরোগ্য-লাভের ছুটিতে আর একসঙ্গে বেড়ানো হল না। ভেবেছিলাম মাগগিওরে হ্রদের ধারে পালালৎসাতে ঘুরে আসব। ওখানকার দ্বীপগুলোতে চাষিদের ঘরে আর মাছ ধরার নতুন পরিবেশে আমাদের খুবই ভাল লাগত, কিন্তু যাওয়া হল না।

জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে যখন বিছানায় পড়ে আছি, তখন একদিন মিস ভ্যান ক্যাম্পেন

আমার ঘরে ঢুকে আলমারির কাছে গিয়ে পাল্লাটা খুলে ফেলল। খালি বোতলগুলো ছিল ওখানে। আগেই এক রাশ খালি বোতল দারোয়ানকে দিয়ে নীচে পাঠিয়েছি, সেগুলো বাইরে নিয়ে যেতে দেখেই বোধহয় আরও কিছু আবিষ্কার করার জন্য ওপরে উঠে এসেছে ভ্যান ক্যাম্পেন। ওখানে বেশির ভাগই ভার্মুথ, মার্সালা আর কাপ্রির বোতল—কিছু চিয়ান্তির ফ্লাস্ক আর কিছু কগনাকের। দারোয়ান বড়গুলো অর্থাৎ ভার্মুথ আর খড়ে-ঢাকা চিয়ান্তির ফ্লাস্কগুলো নিয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল শুধু ব্র্যান্ডির বোতল। মিস ক্যাম্পেন পেল কয়েকটা ব্র্যান্ডির বোতল, আর ভালুকের মতো দেখতে একটা কুমেলের বোতল। ভালুক-আকৃতির বোতলটা দেখেই যেন বেশি রেগে গেল। উঁচু করে ধরল সেটা—সামনের পা-দুটো তুলে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে আছে ভালুকটা, তার কাচের মাথায় একটা ছিপি আঁটা। আমি হাসলাম।

"ওতে কুমেল ছিল।" আমি বললাম, "এই রকম বোতলে সব চেয়ে ভাল কুমেল আসে—রাশিয়া থেকে আসে ওগুলো।"

"ওগুলো সবই ব্র্যান্ডির বোতল, না?" মিস ক্যাম্পেন জিজ্ঞেস করল।

"সব ক'টাই। দেখতে পাচ্ছি না, তবে তাই হবে মনে হচ্ছে।"

"কতদিন ধরে চলছে এসব?"

"আমি নিজে গিয়ে এগুলো কিনে এনেছি।" উত্তর দিলাম আমি, "আমার সঙ্গে ইতালিয়ান অফিসাররা দেখা করতে আসেন, তাঁদের জন্যে এনেছিলাম।"

"তুমি নিজে খাও না?" জিজ্ঞেস করল ক্যাম্পেন।

"নিজেও খেয়েছি।"

"এগারোখানা খালি ব্র্যান্ডির বোতল, আর ওই ভালুক—"

"কুমেল।"

"এগুলো নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। এগুলোই কি সব?"

"আপাতত।"

"আর তোমার জন্ডিস হয়েছে বলে তোমার ওপর কিনা করুণা হচ্ছিল আমার! তোমাকে করুণা করা মানে করুণার অপচয়।"

"ধন্যবাদ।"

"যুদ্ধে ফিরে যেতে না-চাওয়ার জন্যে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু মদ খেয়ে জন্ডিস বাধানোর চেয়ে বুদ্ধিমানের মতো অন্য কোনও উপায় বার করলে পারতে।"

"কী দিয়ে জন্ডিস বাধিয়েছি?"

"মদ খেয়ে। আশা করি কথাটা শুনতে পেয়েছ।"

কোনও জবাব দিলাম না। ও বলে চলল,

"আরও অন্য কোনও রোগ বাধাতে না পারলে জন্ডিস সারামাত্রই তোমাকে বোধ

হয় যুদ্ধে ফিরে যেতে হবে। ইচ্ছে করে জন্ডিস বাধালে আরোগ্যের পর ছুটি পাওয়া যায়, সেটা বিশ্বাস করি না আমি।"

"বিশ্বাস করো না?"

"না, করি না।"

"তোমার কখনও জন্ডিস হয়েছে, মিস ভ্যান ক্যাম্পেন?"

"হয়নি, কিন্তু আমি অনেক রুগীকে দেখেছি।"

"বোধ হয় লক্ষ্য করেছ রুগীরা এতে কেমন আনন্দ পায়?"

"যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে তো ভাল।"

"মিস ভ্যান ক্যাম্পেন," আমি বললাম, "শরীরের গোপন স্থানে লাথি মেরে নিজেকে অক্ষম করতে দেখেছ কখনও কোনও পুরুষকে?"

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মিস ক্যাম্পেন। এড়িয়ে না গিয়ে উপায়ও ছিল না, নইলে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হত তাকে। কিন্তু বহুদিন ধরেই আমার প্রতি দ্বেষ ছিল এবং এতদিনের জমা রাগ মেটাতে আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বলল,

"এমন অনেক লোককে দেখেছি যারা যুদ্ধ থেকে পালাবার জন্যে নিজেই চোট বানিয়ে নেয়।"

"সেটা কথা নয়। তৈরি-করা জখম আমিও দেখেছি। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—এমন পুরুষ কি দেখেছ, যে নিজের গোপন অঙ্গে লাথি মেরে নিজেকে অক্ষম করে ফেলেছে? কারণ জন্ডিসের কষ্টের সঙ্গে একমাত্র সেই অনুভূতিটারই তুলনা করা যেতে পারে। আর আমার ধারণা খুব কম মহিলারই এ-অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতে পারে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম মিস ক্যাম্পেন, তোমার কখনও জন্ডিস হয়েছে কিনা! কারণ—"

মিস ক্যাম্পেন ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

খানিক পরে মিস গেগ এল,

"মিস্ ক্যাম্পেনকে কী বলেছ? খেপে আগুন হয়ে গেছে!"

"আমরা পরস্পরের অনুভূতির তুলনা করছিলাম। বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি কখনও সন্তান হবার কষ্ট অনুভব করেননি—"

"তুমি একটা আস্ত গাধা।" গেগ বলল, "তোমার মাথার ছাল খুলে নেবে, তা জানো?"

"ইতিমধ্যেই খুলে নিয়ে গেছে। আমার ছুটির আশাটা নষ্ট করে দিয়েছে, এবার হয়তো কোর্ট-মার্শাল করানোর চেষ্টা করবে। একেবারে জঘন্য প্রকৃতি।"

"তোমাকে একেবারে দেখতে পারে না। হয়েছিলটা কী?"

"বলছে—যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে আমি নাকি মদ খেয়ে জন্ডিস বাধিয়েছি।"

"ওঃ! আমি দিব্যি গেলে বলব—কখনও মদ খাওনি তুমি। অন্যরাও তাই বলবে।"

"বোতলগুলো দেখে গেছে।"

"কতবার বলেছি ওগুলো সরিয়ে ফেলো। কোথায় আছে?"

"আলমারিতে।"

"কোনও সুটকেস আছে?"

"না। ওই ঝোলাটার মধ্যে ভরে দাও।"

বোতলগুলো ঝোলায় পুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিস গেগ।

"এগুলো দারোয়ানকে দিয়ে দেব গিয়ে।"

"একটু দাঁড়াও, বোতলগুলো আমিই নিয়ে যাব।" মিস ভ্যান ক্যাম্পেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে দারোয়ান। তাকে সে বলল, "এগুলো নিয়ে চলো তো। রিপোর্ট তৈরি করার সময় ডাক্তারকে দেখাতে হবে।"

হল পেরিয়ে চলে গেল ক্যাম্পেন। দারোয়ানের হাতে ঝোলা। ভেতরে কী আছে তা তারও জানা। তেমন কিছুই ঘটল না, শুধু আমার ছুটিটা নষ্ট হল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার রাতে গাড়িতে জায়গা রাখার জন্য দারোয়ানকে আগেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিলাম। তুরিন থেকে ট্রেন আসে রাত সাড়ে দশটায়, আর মাঝরাতে ছাড়ে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মিলানের স্টেশনে। অথচ জায়গা পেতে হলে আগে থেকে স্টেশনে গিয়ে জায়গা দখল করে নিতে হবে। আমাদের দারোয়ান তার এক বন্ধুকে জুটিয়ে নিল। লোকটি মেশিনগান-চালক, এখন ছুটিতে এসেছে। ওদের কাছে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের টাকা আর আমার জিনিসপত্র দিয়ে দিলাম।

বিকাল পাঁচটায় হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাওয়ার সময় দারোয়ানের সঙ্গে দেখা করে গেলাম। বলে দিলাম রাত বারোটার আগেই স্টেশনে পৌঁছে যাব। ওর বউ আমাকে সিনোরিনো বলে ডাকত। চোখের জল মুছে করমর্দন করে আবার কাঁদতে শুরু করে দিল সে। আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলাম তাকে। তাতে তার কান্না আরও বেড়ে গেল। বেচারা আমার জামাকাপড়ে রিপু করা, বোতাম বসানো এরকম অনেক কাজই করে দিয়েছে। ছোটখাটো, মোটাসোটা মানুষটার গোলগাল মুখে সারাক্ষণই খুশির রেশ লেগে থাকে। আজ মুখটা কান্নায় দুমড়ে যাচ্ছে।

ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে একটা মদের দোকানে অপেক্ষা করছিলাম—জানলার দিকে তাকিয়ে। বাইরে বেশ ঠান্ডা আর কুয়াশা। কপি আর গ্রাপ্পার দাম মিটিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে মানুষের চলাচল দেখছিলাম। ক্যাথারিন আসছিল। জানলার কাচে

টোকা দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল ক্যাথারিন। দোকান থেকে বেরিয়ে ওর কাছে গেলাম। পরনে গাঢ় নীল রঙের কেপ, মাথায় নরম ছোট ফেল্টের টুপি। ওকে নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মদের দোকান পেরিয়ে গেলাম। তারপর বাজারের ভেতর দিয়ে, রাস্তা পেরিয়ে খিলানের পথ ধরে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ার। সামনে অগুনতি ট্রাম চলার পথ, তার পিছনে গির্জা। সাদা গির্জার গায়ে কুয়াশার সিক্ততা। ট্রামরাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেলাম। বাঁদিকে দোকানপাট, আলোকোজ্জ্বল তাদের জানলা, তার পাশেই গালেরিয়ার প্রবেশপথ। চৌমাথার ওপর কুয়াশার আস্তরণ। গির্জার সামনে এসে দেখলাম, কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে, গির্জার সমস্ত পাথরগুলো ভিজে গেছে।

"ভেতরে যাবে?"

"না।" জবাব দিল ক্যাথারিন ।

আবার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। একটা পাথরের মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একজন সৈনিক, সঙ্গে তার প্রেমিকা। মূর্তির গা-ঘেঁষে এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। নিজের কেপটা দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে নিয়েছে সৈনিকটি।

"আমাদের মতোই অবস্থা।" বললাম আমি।

"আমাদের মতো কেউ নেই।" ক্যাথারিনের গলায় আনন্দের কোনও ছোঁয়া নেই।

আমি বললাম, "ওদের কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকলে ভাল হত। সকলেরই যাওয়ার একটা জায়গা থাকা উচিত।"

"কেন, গির্জা তো আছে।" ক্যাথারিন উত্তর দিল।

মূর্তিটার দিকে অনেকটা চলে এসে চৌরাস্তার শেষ মাথাটা পার হয়ে একবার ফিরে তাকালাম—ঘন কুয়াশার মধ্যে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে গির্জাটা। একটা দোকানে ঢুকে পিস্তল আর কার্তুজ কিনলাম। আমারটা অস্থায়ী হাসপাতালে হারিয়ে গেছে। দোকানের মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে পথে নামলাম। রাস্তা পার হয়ে ওপারের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম।

"এখন একটু ভাল লাগছে।" ক্যাথারিন বলল, "যখন আসি, ভীষণ খারাপ লাগছিল।"

"দু'জনে একসঙ্গে থাকলেই আমরা ভাল থাকি।"

"আমরা চিরদিন একসঙ্গে থাকব।"

"শুধু আজ মাঝরাতেই আমাকে চলে যেতে হবে, এই যা।"

"এখন ও-সব কথা বোলো না।"

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। কুয়াশার আস্তরণে বাতিগুলোয় হলুদ আভা।

"তোমার ক্লান্ত লাগছে না?" ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করল।

"তোমার?"

"আমি বেশ আছি। হাঁটতে আমার ভালই লাগে।"

"তাই বলে বেশিক্ষণ হাঁটা চলবে না।"

"তা ঠিক।"

পাশের একটা অন্ধকার রাস্তা ধরলাম। চলতে চলতে একবার দাঁড়িয়ে চুমু খেলাম ক্যাথারিনকে। ওর হাতটা আমার কাঁধের ওপর। পিঠের ওপর দিয়ে আমার কেপটা টেনে নিয়েছে, দু'জনে তার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছি। একটা উঁচু দেয়ালের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে।

"কোথাও একটা যাওয়া যাক।" আমি বললাম।

"সেই ভাল।" ক্যাথারিন বলল। সরু রাস্তা ধরে হেঁটে এসে আর-একটা চওড়া রাস্তায় পড়লাম। রাস্তাটা খালের ধারে, অন্যদিকে উঁচু ইটের দেয়াল আর বড় বড় বাড়ি। সামনে রাস্তার ওধারে ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা ট্রাম যাচ্ছে। বললাম,

"ব্রিজের ওখান থেকে একটা গাড়ি পাওয়া যাবে।"

ব্রিজের ওপর উঠে কুয়াশার মধ্যে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রাম চলে গেল—ঘরমুখো অজস্র লোকের ভিড় সেগুলোতে। একটা গাড়ি এল, কিন্তু তাতে লোক রয়েছে। কুয়াশা থেকে ক্রমশ বৃষ্টি নামার উপক্রম হচ্ছে।

ক্যাথারিন বলল, "চলো, হাঁটা যাক। নয়তো ট্রামেই যাই চলো।"

"এসে যাবে একটা, এখান দিয়েই তো যায়।"

"ওই যে একটা গাড়ি আসছে," ক্যাথারিন বলল। কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে গাড়ি থামাল গাড়োয়ান, মিটারের পতাকাটা নামিয়ে দিল। গাড়ির ছাদটা ঢাকা। গাড়োয়ানের কোটে বৃষ্টির জলের ফোঁটা, জলে ভিজে চকচক করছে তার বার্নিশ-করা টুপিটা। গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসলাম আমরা—ঢাকা ছাদের নীচে অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা।

"কোথায় যেতে বললে ওকে?"

"স্টেশনে। স্টেশনের কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখানেই যাব।"

"এভাবে খালি হাতে যাওয়া যাবে—মালপত্র ছাড়া?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলাম আমি। স্টেশনে যেতে বৃষ্টির মধ্যে অনেকটা পথ যেতে হল। ক্যাথারিন বলল,

"রাতে খেতে হবে না? আমার তো খিদে পেয়ে যাবে।"

"হোটেলের ঘরে খাবার আনিয়ে নেব।"

"আমার তো পরার কিছু নেই, একটা নাইট-গাউন পর্যন্ত না।"

"একটা কিনে নিই চলো।"

গাড়ি ঘুরিয়ে ভিয়া মালজোনিতে গিয়ে গাউন কিনে আবার স্টেশনের পথ ধরলাম। হোটেলের সামনে ক্যাথারিনকে গাড়িতে বসিয়ে ভেতরে গেলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে ঘরের ব্যবস্থা ঠিক করে ভেতরে ঢুকলাম ক্যাথারিনকে নিয়ে। লিফটের সামনে অভিবাদন করে আমাদের ওপরে নিয়ে চলল ম্যানেজার। হোটেলের অল্পবয়সী একটি ভৃত্যের হাতে ক্যাথারিনের নতুন গাউনের মোড়কটা রয়েছে। হোটেলের চারদিকে লাল ভেলভেট আর চকচকে পেতলের সমারোহ। পুরনো কার্পেট-ঢাকা বারান্দা দিয়ে চলেছি, দু'পাশে অনেক দরজা। একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল ম্যানেজার।

"এই দেখুন, চমৎকার ঘর।"

বাচ্চা চাকরটি ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর মোড়কটা রাখল। ঘরের পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে ম্যানেজার বলল,

"বাইরে চমৎকার কুয়াশা রয়েছে।"

চারপাশে লাল ভেলভেটের পর্দা, ঘরের মধ্যে অনেকগুলো আয়না, দুটো চেয়ার আর সাটিনের ঢাকনা-দেওয়া বিশাল একটা খাট। একপাশে বাথরুমের দরজা।

"খাবারের তালিকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।" অভিবাদন করে চলে গেল ম্যানেজার।

জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখলাম একবার, তারপর দড়ি টেনে লাল ভেলভেটের পর্দাটা বন্ধ করে দিলাম। খাটে বসে কাচের ঝাড়লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে ছিল ক্যাথারিন। টুপিটা খুলে ফেলেছে, উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ওর মাথার চুলে। একটা আয়নায় নিজের ছায়া দেখে মাথার চুলে হাত রাখল ও—আরও তিনখানা আয়নায় ওর ছবি ফুটে উঠল। ওকে খুব একটা খুশি দেখাচ্ছিল না, গায়ের কেপটা খসে পড়েছিল বিছানায়।

"কী হল, সোনা?"

"এর আগে নিজেকে কখনও বেশ্যা বলে মনে হয়নি।"

জানলার ধারে ফিরে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে আবার বাইরে তাকালাম। পরিবেশটা এরকম হয়ে উঠতে ভাবতে পারিনি। বললাম, "তুমি বেশ্যা নও।"

"তা জানি। কিন্তু সে-রকম মনে হওয়াটাও খুব সুখকর নয়।" ওর কথা সুরে একটা স্পষ্ট রুক্ষতা।

"আমাদের সাধ্যের মধ্যে এটাই সবচেয়ে ভাল হোটেল।" বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। চৌমাথার ওপারে দেখা যাচ্ছে স্টেশনের আলোকমালা, রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলেছে, পার্কের ভেতরে গাছের সারি। ভিজে ফুটপাথে হোটেলের আলোর ঝলক। মনে হচ্ছে—এখন কি আমরা তর্কাতর্কি করেই কাটিয়ে দেব সময়টুকু?

"এখানে এসো।" ক্যাথারিন ডাকল। ওর কণ্ঠস্বরের নির্লিপ্ত ভাবটা আর নেই।

"এসো, এসো। আমি আবার ভাল মেয়ে হয়ে গেছি।" বিছানার দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি ও হাসছে।

কাছে গিয়ে বিছানায় বসে চুমু খেলাম ওকে,

"তুমি আমার সোনা মেয়ে।"

"আমি তোমারই," ও বলল।

খাওয়ার পরে বেশ ভাল লাগছিল। ক্ষণিকের জন্যে পাওয়া ঘরটাতে বসে মনে হচ্ছে, এই আমাদের সুখের আশ্রয়। হাসপাতালে আমার ঘরটাও ছিল আমাদের সংসার, তেমনি এই ঘরটাও যেন আমাদের নিজেদের গড়ে-তোলা সুখী গৃহকোণ।

খাবার সময় আমার টিউনিকটা নিজের কাঁধের ওপর ফেলে নিয়েছিল ক্যাথারিন। ভীষণ খিদে পেয়েছিল, খাবারটাও ভাল ছিল। সেই সঙ্গে পান করেছিলাম কিছু সুরা। আমিই পান করেছিলাম বেশি। তবে ক্যাথারিনও একটু খেয়েছিল, আর বেশ ভালই বোধ করছিল ও।

"চমৎকার ঘর।" ক্যাথারিন বলল, "খুব সুন্দর ঘর। যতদিন মিলানে আছি, যদি এই ঘরেই থাকতাম।"

"অদ্ভুত ঘরটা, তবে সত্যিই ভাল।"

"পাপের একটা আকর্ষণ আছে। যারা এ-পথে আসে তাদের বেশ রুচিবোধও থাকে দেখছি। লাল ভেলভেটের পর্দাটা কেমন সুন্দর, কী চমৎকার আয়নাগুলো—ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত।"

"তুমি সত্যি চমৎকার।"

"সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘরটাকে কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু এখন এটাকে অপূর্ব মনে হচ্ছে।" একটু থেমে আবার বলল, "সত্যিকারের অন্যায় যদি কিছু করতে পারতাম আমরা, কেমন লাগত কে জানে! আমরা যা করি সবই নিষ্পাপ। খারাপ কিছু আমরা করতে পারি বলে মনে হয় না।"

"তুমি ভীষণ সরল মেয়ে।"

"সত্যিই আমি সরল, কিন্তু শুধু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সেটা বুঝতে পারেনি।"

আমি একপাত্র সুরা ঢেলে বললাম, "তোমাকে যখন প্রথম দেখি তখন একদিন সারা বিকেল ধরে শুধু ভেবেছিলাম—হোটেল কাভুরে একদিন দু'জনে যাব, আর কেমন কাটবে সে-দিনটা।"

"খুব স্পর্ধা হয়েছিল তো তখন? আচ্ছা, এটা তো কাভুর নয়, না?"

"না, ওখানে যাবার অনুমতি আমরা পেতাম না।"

"একদিন পাব। কিন্তু দ্যাখো, এখানেই আমাদের চিন্তার কত ফারাক! আমি কিন্তু এমন কথা কখনও ভাবিনি।"

"কিছুই ভাবো না কখনও?"

"সামান্য কিছু।" ও জবাব দিল।

"ভারী ভাল মেয়ে তুমি।"

এক গ্লাস সুরা ঢাললাম। ক্যাথারিন বলল,

"আমি খুব সাদাসিধে।"

"প্রথমে কিন্তু আমার তা মনে হয়নি। মনে হয়েছিল একটু খ্যাপাটে।"

"খ্যাপা একটু ছিলাম ঠিকই, তবে তাতে কোনও জটিলতা ছিল না।"

"মদ খুব ভাল জিনিস, যা-কিছু খারাপ সব ভুলিয়ে দেয়।" বললাম আমি।

"খুব চমৎকার," উত্তর দিল ক্যাথারিন, "কিন্তু মদ খেয়ে আমার বাবার বাত ধরে গেছে।"

"তোমার বাবা আছেন?"

"হ্যাঁ, তাঁর আবার বাত আছে। তোমার সঙ্গে অবশ্য তাঁর দেখা হবে না। তোমার বাবা নেই?"

"না।" আমি বললাম, "যিনি আছেন, তিনি আমার আপন বাবা নন, সৎ-বাবা।"

"আমার তাঁকে ভাল লাগবে?"

"তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকার হবে না তোমার।"

"কী সুন্দর সময়টা কাটছে আমাদের।" ক্যাথারিন বলল, "অন্য কিছুতেই আকর্ষণ নেই আমার, তোমায় বিয়ে করে আমি ভীষণ সুখী হয়েছি।"

হোটেলের বেয়ারা এসে উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র তুলে নিয়ে গেল। চুপচাপ বসে আছি দু'জনে। বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। নীচের রাস্তা দিয়ে ছুটে-চলা মোটরের হর্ন শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।—

"আমার পিছনে নিয়তই শুনি আমি
সময়ের ডানাওলা রথ দ্রুত ধাবমান।"

আস্তে আস্তে বললাম আমি।

ক্যাথারিন বলল, "কবিতাটা আমি জানি, মার্ভেল-এর লেখা, কিন্তু এখন ও-কবিতা থাক।"

আমার মাথাটা খুব ঠান্ডা লাগছিল, চিন্তাগুলো স্বচ্ছ। দরকারি কথাগুলো সেরে নিতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম,

"বাচ্চা হওয়ার সময় কোথায় থাকরে তুমি?"

"এখনও ভাবিনি। সব চেয়ে ভাল জায়গা যা ব্যবস্থা করতে পারব, সেখানেই থাকব।"

"কীভাবে ব্যবস্থা করবে?"

"আমি আমার সাধ্যমতো ভাল ব্যবস্থা করব। তুমি ও-সব নিয়ে ভেবো না তো। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মধ্যে আরও অনেক সন্তান হবে আমাদের।"

"যাবার সময় হয়ে এল যে।"

"জানি। তুমি ইচ্ছে করলে এখনই যেতে পারো।"

"না, না।"

"তা হলে আর দুশ্চিন্তা কোরো না। দিব্যি ছিলে এতক্ষণ, এখন আবার দুশ্চিন্তা শুরু করলে!"

"আর করব না। ক'দিন অন্তর চিঠি লিখবে আমাকে?"

"রোজ। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা চিঠি পড়ে?"

"ক্ষতি করার মতো ইংরিজি ওদের জানা নেই।"

"ভাষাটা তাহলে বেশ ঘোরালো করে দেব।"

"বেশি ঘোরালো কোরো না যেন।"

"না না, সামান্যই করব।"

"এবার আমাদের যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে।"

"চলো।"

"আমাদের এমন সুন্দর ঘরটা ছেড়ে যেতে ভীষণ খারাপ লাগছে।"

"আমারও।"

"তবু যেতেই হবে।"

"বেশ, কিন্তু আমরা কখনোই আমাদের সংসারে বেশিদিন থাকতে পাই না।" ক্যাথারিনের গলাটা করুণ শোনাল।

"একদিন ঠিকই পাব।" ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

"তুমি ফিরে এসে দেখবে তোমার জন্যে কী সুন্দর সংসার সাজিয়ে রেখেছি।"

"হয়তো এখনই আবার ফিরে আসতে পারি।"

"হয়তো তোমার পায়ের পাতায় একটু চোট লাগবে।"

"কিংবা কানে।"

"না না, তোমার কানটা যেমন আছে, ঠিক তেমনি থাকা চাই।"

"আর পা?"

"পা তো আগেই জখম হয়েছে একবার।"

"এবারে সত্যিই যেতে হবে, সোনা।"

"বেশ চলো, তুমি আগে যাও।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে হোটেলের পাওনা চুকিয়ে বেয়ারাকে একটা গাড়ি আনতে বললাম। ক্যাথারিনের মোড়কটা হাতে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি দু'জনে। দেখতে পাচ্ছি গাড়ি আসছে—হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল, বৃষ্টিতে মাথা নিচু করে আছে ঘোড়াটা। ছাতা খুলে গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢুকল বেয়ারাটি। তারই ছাতার নীচে মাথা গুঁজে ভিজে রাস্তা ধরে গাড়ি পর্যন্ত গেলাম আমরা। রাস্তার ধারের নালা দিয়ে তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছে বৃষ্টির জল।

"আপনার মোড়কটা গাড়ির মধ্যে আছে।" ভৃত্যটি বলল। আমরা ততক্ষণে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ভৃত্যটি দাঁড়িয়ে আছে ছাতার নীচে। ওর হাতে বখশিশ দিলাম। ও ধন্যবাদ জানাল, শুভেচ্ছা জানাল আনন্দময় যাত্রাপথের জন্য। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে গাড়োয়ান। গাড়ি চলতে শুরু করল। ভৃত্যটি ফিরে চলল হোটেলের দিকে।

ডানদিকে-বাঁদিকে মোড় নিয়ে ভিজে রাস্তা দিয়ে স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়িটা। স্টেশনের বাতির নীচে বৃষ্টি থেকে শরীর বাঁচিয়ে দু'জন বন্দুকধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে, তাদের মাথার টুপিতে বৈদ্যুতিক আলোর ঝল্‌কানি। বাতির সামনে ওপর থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে —বৈদ্যুতিক আলোয় জলের ধারা কাচের মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। স্টেশনের ছাউনির তলা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একজন কুলি—বৃষ্টির মধ্যে কাঁধদুটো উঁচু করে তার আড়ালে মাথা লুকিয়ে। আমার কুলি চাই না জানাতে বেচারা আবার ফিরে গিয়ে ছাউনির নীচে আশ্রয় নিল।

ক্যাথারিনের দিকে ফিরে তাকালাম—গাড়ির ভেতর অন্ধকারের আড়ালে রয়েছে ওর মুখটা। বললাম,

"আমি এখানেই বিদায় জানাব তোমায়।"

"ভেতরে যেতে পারব না?"

"না। বিদায় সোনা।"

"হাসপাতালের রাস্তাটা গাড়োয়ানকে বলে দাও।"

"হ্যাঁ, দিচ্ছি।"

ড্রাইভারকে রাস্তা বলে দিলাম। সে ঘাড় নাড়ল।

"বিদায় ক্যাথারিন!" আমি বললাম, "সাবধানে থেকো আর আমার ছোট্ট ক্যাথারিনকেও সাবধানে রেখো।"

"বিদায়, প্রিয়তম।"

"বিদায়।"

বৃষ্টির ভেতর নেমে দাঁড়ালাম, গাড়ি চলতে শুরু করল। জানলার বাইরে ঝুঁকে আছে ক্যাথারিন, স্টেশনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওর মুখটা। একটু হেসে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। এগিয়ে গেল গাড়িটা। ক্যাথারিন স্টেশনের খিলানের দিকে ইশারা করল আঙুল দিয়ে। ফিরে তাকালাম—পাহারাওয়ালাদুটি ছাড়া কেউ নেই সেখানে। বুঝলাম বৃষ্টিতে না ভিজে ভেতরে যেতে বলছে। খিলানের তলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম—দূরে চলে যাচ্ছে গাড়িটা, মোড়ের মাথায় গিয়ে ঘুরল—আর দেখা গেল না। স্টেশনের ভেতর দিয়ে এগোলাম ট্রেনের দিকে।

হাসপাতালের দারোয়ানটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওর পেছনে পেছনে গাড়ির ভর্তি কামরাগুলোর পাশ দিয়ে লোকের ভিড় ঠেলে আমার কামরায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে দারোয়ানের বন্ধু মেশিনগান-চালকটি ভিড়ের মধ্যে এক কোণে একটা জায়গা দখল করে বসে আছে। আমার জিনিসপত্র সব ওপরের তাকে রাখা। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে কামরার গলিপথে। আমাকে যেতে দেখে সবাই তাকাল আমার দিকে। কামরায় তেমন জায়গা নেই, সুতরাং প্রত্যেকের চোখেই একটা বিদ্রোহী ভাব। মেশিনগান-চালকটি উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জায়গা ছেড়ে দিল। পেছন থেকে কে-যেন আমার পিঠে টোকা দিল। ফিরে তাকিয়ে দেখি গোলন্দাজ-বাহিনীর বিশালদেহী ক্যাপ্টেন একজন, চোয়ালের ওপর একটা লম্বা কাটা দাগ। লোকটি গলিপথ থেকে কাচের জানলা দিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে ভেতরে চলে এসেছে।

"কিছু বলছেন?" আমি বললাম।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। লোকটা আমার চেয়ে লম্বা, টুপির নীচে পাতলা মুখ, তার ওপরে নতুন ক্ষতচিহ্নটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সমস্ত লোক চেয়ে আছে আমার দিকে।

"আপনি এটা করতে পারেন না।" ক্যাপ্টেন বলল, "কোনও সৈনিককে দিয়ে নিজের জন্যে জায়গা দখল করিয়ে রাখতে পারেন না আপনি।"

"কিন্তু রেখেছি তো।"

ঢোঁক গিলল ক্যাপ্টেন—ওর কণ্ঠনালীর ওঠানামা দেখতে পাচ্ছি। আসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেশিনগান-চালকটি। বাইরে জানলার কাচ ভেদ করে অন্যদের দৃষ্টি আমার দিকে। কামরায় কারও মুখে কোনও কথা নেই।

"এভাবে জায়গা দখল করার কোনও অধিকার নেই আপনার। আমি আপনার থেকে দু'ঘণ্টা আগে এসেছি।"

"তো আপনি কী চান?"

"জায়গাটা।"

"সেটা তো আমিও চাই।"

ওর মুখের ভাবটা লক্ষ্য করছি, আর বুঝতে পারছি কামরার সব লোকই আমার

বিরুদ্ধে। তাদের দোষ দেওয়ার কিছু নেই, ক্যাপ্টেনের দাবি যুক্তিসম্মত—কিন্তু আমিও যে বসতে চাই। কেউ কোনও কথা বলল না। নরক-যন্ত্রণা মনে হল আমার। বললাম,

"বসুন, সিনর ক্যাপিতানো।"

মেশিনগান-চালকটি পথ ছেড়ে দিল। ক্যাপ্টেন সিটে বসে আমার দিকে একবার তাকাল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মনে আঘাত পেয়েছে, কিন্তু তবু বসেছে।

"আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এসো।"

মেশিনগান-চালককে বললাম। কামরার পাশে গলিপথ ধরে এগিয়ে চললাম। সব কামরাই ভর্তি, জায়গা পাওয়ার কোনও আশাই নেই। দারোয়ানকে আর তার বন্ধুকে দশ লিরে করে দিলাম। কামরাগুলোর মধ্যে দেখতে দেখতে গলিপথ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল ওরা—কোথাও কোনও জায়গা নেই।

"ব্রেসিয়াতে হয়তো কেউ কেউ নামবে।" দারোয়ান বলল।

সৈনিকটি বলল, "আবার নতুন লোক উঠবেও।"

ওদের বিদায় জানালাম। করমর্দন করে চলে গেল ওরা—ওদের দু'জনেরই মনটা খারাপ হয়ে গেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। ট্রেনের গলিপথে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। গাড়ির গতির সঙ্গে সরে সরে যাওয়া স্টেশনের বাতিগুলোর দিকে দেখছি জানলা দিয়ে। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবিরাম বৃষ্টির ফোঁটায় জানলার কাচ ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল—বাইরের দৃশ্য আর দেখা যাচ্ছে না।

গলিপথের মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম। বুক-পকেটের টাকাপয়সা কাগজপত্র বার করে ঢুকিয়ে দিলাম শার্ট আর প্যান্টের ভেতর—ব্রিচেসের পায়ের মধ্যে ব্যাগটা রইল। সারা রাত ঘুমোলাম। শুধু অনেক লোকের ওঠা-নামার শব্দে ব্রেসিয়াতে আর ভেরোনাতে একবার করে ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু তখনই আবার ঘুমিয়েও পড়েছি। জিনিসপত্রের ঝোলাগুলোর একটা মাথায় দিয়ে আর একটাকে জড়িয়ে ধরে অঘোরে ঘুমিয়েছি। আমার শরীরের ওপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে চলে গেলেও আপত্তি নেই, শুধু না মাড়ালেই হল। অনেক লোক আমার মতোই গলিপথে ঘুমিয়ে পড়েছে, অনেকে জানলার শিক ধরে কিংবা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। এ-ট্রেনে সারাক্ষণই ভিড়।

তৃতীয় অধ্যায়

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

দু'ধারের গাছের ডালে-ডালে আর সামনের ধূসরবর্ণ মাঠে বর্ষশেষের রিক্ততা। কাদায় পিচ্ছিল পথ। বিশাল ভারী একটা ট্রাকে চড়ে উডিনে থেকে গোরিজিয়ায় চলেছি, পাশ দিয়ে আরও অনেক যানবাহনের চলাচল। রাস্তায় প্রচুর ঝরাপাতা জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে জড়ো-করা ভাঙা খোয়া। তাই দিয়ে শ্রমিকরা চাকার চাপে ক্ষয়ে-যাওয়া পথের গর্তগুলো মেরামত করছে।

সামনে দেখা যাচ্ছে কুয়াশায় ঘেরা শহরটা। সে-কুয়াশায় পেছনের পাহাড়টাও ঢেকে গেছে। নদী পার হলাম—তীব্র বেগে বয়ে চলেছে ভরা নদী। পাহাড়ের ওপারে বৃষ্টি হচ্ছে। শহরে এসে পড়েছি। কারখানাগুলোর পাশ দিয়ে, ঘরবাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমার ট্রাক। এখানে-ওখানে বাড়িগুলোর ওপর বোমার আঘাতের চিহ্ন। সরু একটা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা ব্রিটিশ রেড-ক্রস অ্যাম্বুল্যান্সের পাশ কাটিয়ে গেলাম। ড্রাইভারের মাথায় টুপি, রোদে-পোড়া পাতলা মুখটা অপরিচিত।

শহর-রক্ষী মেজরের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলাম। মালপত্র নামিয়ে দিল ড্রাইভার, জিনিসপত্র কিছু হাতে আর কিছু কাঁধে ঝুলিয়ে ভিলার ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু কেন যেন ঘরে ফেরার ভাবটা কিছুতেই অনুভব করলাম না।

নুড়ি-বিছোনো ভিজে পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়িটা। জানলাগুলো সব বন্ধ, কিন্তু দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে মেজরকে দেখতে পেলাম। শূন্য ঘরের মাঝখানে টেবিলের পাশে বসে আছেন—দেওয়াল জোড়া ম্যাপ আর টাইপ-করা কাগজ।

"কী, কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর। কিছুটা যেন রুক্ষ দেখাচ্ছে ওঁকে, বয়েসটাও যেন আরও বেড়ে গেছে। বললাম,

"ভাল আছি। এখানকার খবর কী?"

"এখানে সব শেষ হয়ে গেছে।" জবাব দিলেন মেজর, "ঝোলাঝুলি নামিয়ে বোসো।"

জিনিসপত্র মেঝেতে রেখে, টুপিটা মাথা থেকে খুলে, দেয়ালের কাছ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

"এবারের গ্রীষ্মকালটা খুব খারাপ গেছে।" মেজর বললেন, "শরীরে জোর পাচ্ছ তো?"

"পাচ্ছি।"

"তোমার মেডেল পেয়েছ?"

“হ্যাঁ। ভারী সুন্দর, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।”

“দেখি।”

কাঁধের ওপর থেকে কেপটা খুলে নিলাম—মেডেল-ঝোলানো ফিতে দুটো দেখানোর জন্যে।

“মেডেলের বাক্স পেয়েছ?”

“না, কাগজে মোড়া ছিল।”

“পরে আসবে। বাক্স আসতে একটু সময় লাগে।”

“এখন আমায় কী করতে হবে?”

“গাড়িগুলো তো সব দূরে রয়েছে। ছ'টা রয়েছে উত্তর দিকে কাপোরেত্তোতে। কাপোরেত্তো জানো তো?”

“জানি।” উত্তর দিলাম আমি। চারিদিক পাহাড়ে-ঘেরা ছোট্ট ছিমছাম শহর এই কাপোরেত্তো। তার মাঝখানে একটা ঘণ্টা-ঘর, চৌমাথার মোড়ে ফোয়ারা।

“ওখান থেকেই এখন কাজ হচ্ছে। রুগীর সংখ্যা প্রচুর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।”

“বাকি অ্যাম্বুল্যান্সগুলো কোথায়?”

“দুটো আছে পাহাড়ের ওপর, চারটে এখনও বাইনসিৎসাতে। বাকি দু' দল অ্যাম্বুল্যান্স আছে কার্সোতে, তৃতীয় বাহিনীর সঙ্গে।”

“আমাকে তাহলে এখন কী করতে হবে?”

“ইচ্ছে করলে বাইনসিৎসায় গিয়ে ওখানকার অ্যাম্বুল্যান্স চারটের দায়িত্ব নিতে পারো। জিনো অনেকদিন ধরে ওখানে আছে। ওখানে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তুমি তো তখন ছিলে না, তাই না?”

“না।”

“খুবই খারাপ অবস্থা হয়েছিল। তিনখানা গাড়ি হারিয়েছি আমরা।”

“শুনেছিলাম।”

“হ্যাঁ, রিনাল্‌দি লিখেছিল, তাই তো?”

“রিনাল্‌দি কোথায়?”

“এখানেই আছে—হাসপাতালে। গোটা গ্রীষ্ম আর শরৎ জুড়ে ঝক্কিটা ওর ওপর দিয়েই তো গেছে!”

“তাই তো।”

“খুব ভয়ংকর অবস্থা গেছে।” মেজর বললেন, “এখন যেন বিশ্বাসই করতে পারি না যে, সেই ভয়ংকর অবস্থাটা ঘটেছিল। তখন প্রায়ই মনে হত, তোমার বরাত ভাল বলে শুরুতেই জখম হয়ে পড়েছিলে।”

“আমারও তাই মনে হয়।”

"সামনের বছর অবস্থা আরও খারাপ হবে।" মেজর বললেন, "হয়তো ওরা এখনই আক্রমণ করবে। শুনি তো ওরা এখনই আক্রমণ করবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। নদীর রূপটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, এরই মধ্যে অনেকটা বেড়ে গেছে।"

"বর্ষা শুরু হয়ে গেছে, এর মধ্যে ওরা আক্রমণ করবে বলে আমার মনে হয় না। কয়েকদিনের মধ্যেই বরফ পড়তে শুরু করবে। তোমার দেশের কী খবর? তুমি ছাড়া আর কোনও আমেরিকান আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে নাকি?"

"দশ লক্ষ লোককে যুদ্ধের তালিম দেওয়া হচ্ছে।"

"আশা করি তাদের মধ্যে কিছুজনকে আমরাও পাব। তবে ফরাসিরাই নিয়ে নেবে সব, আমাদের এখানে হয়তো আর কিছুই পৌঁছবে না। শোনো, তুমি আজ রাতটা এখানেই থাকো, কাল ভোরে গিয়ে জিনোকে পাঠিয়ে দিয়ো। তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার লোক দিয়ে দেব। বাকি সব কথা জিনো বলে দেবে। এখনও মাঝেমধ্যে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বাইনসিৎসা দেখতে তোমারও ইচ্ছে করবে।"

"বাইনসিৎসায় যেতে পারলে আমি খুবই খুশি হব। আপনাদের কাছে আবার ফিরে আসতে পেরে খুব খুশি হয়েছি, সিনর মাগ্‌গিওরে।"

একটু হাসলেন মেজর,

"শুনে সুখী হলাম, তুমি আমাদের ভালবাসো। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যদি তোমার মতো একবার চলে যেতে পারতাম, তাহলে আবার ফিরে আসতাম বলে মনে হয় না।"

"এ-রকম অবস্থা?"

"অবস্থাটা আরও খারাপ। যাও, সাফসুতরো হয়ে নাও, তারপর তোমার বন্ধু রিনাল্‌দিকে খুঁজে বের করো।"

জিনিসপত্র নিয়ে ওপরে চলে গেলাম। রিনাল্‌দি ঘরে নেই, তবে ওর জিনিসপত্র সব রয়েছে। পায়ের পট্টি আর ডান পায়ের জুতোটা খুলে বিছানার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত লাগছে, ডান পায়ে একটু ব্যথাও অনুভব করছি, কিন্তু এক পায়ে জুতো পরে বোকার মতো শুয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। উঠে ফিতে খুলে বাঁ পায়ের জুতোটাও মাটিতে ফেলে দিয়ে কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লাম। জানলা বন্ধ বলে ঘরটাতে কেমন যেন দমচাপা ভাব। কিন্তু ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, উঠে যে জানলা খুলব এমন শক্তিও নেই। বাইরে একটু একটু করে অন্ধকার নেমে আসছে, বিছানায় শুয়ে ক্যাথারিনের কথা ভাবছি আর রিনাল্‌দির ফেরার জন্য অপেক্ষা করছি। ঠিক করে রেখেছিলাম রাতে বিছানায় শোবার আগে ক্যাথারিনের কথা আর ভাবব না।

কিন্তু এখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, কাজও কিছু নেই, তাই ওর কথাই ভাবছি। এমন সময় রিনালদি এল। দেখতে ঠিক আগের মতোই আছে, শুধু একটু রোগা হয়েছে।

"তুমি এলে তাহলে।" রিনাল্দি বলল।

বিছানায় উঠে বসলাম। কাছে এসে বিছানায় বসে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রিনাল্দি বলল, "লক্ষ্মী ছেলে।"

আমি দু'হাতে ওর হাত দুটো ধরে আছি। পিঠে কয়েকটা চাপড় মেরে আদর জানাল রিনাল্দি। তারপর বলল,

"হাঁটুটা দেখি।"

"ব্রিচেস খুলতে হবে।"

"খোলো না, এখানে তো শুধু আমরাই আছি। ওরা তোমার হাঁটুতে কী কেরামতি করেছে সেটা একবার দেখি!"

উঠে দাঁড়িয়ে ব্রিচেস খুলে হাঁটু-বাঁধা পট্টিটাও খুলে ফেললাম। রিনাল্দি মেঝেয় বসে নানাভাবে পা-টা নাড়াচাড়া করে আমার হাঁটু পরীক্ষা করতে লাগল,

"এর বেশি আর নাড়াতে পারো না?"

"না।"

"এ-অবস্থায় তোমাকে ফেরত পাঠানোটা অন্যায় হয়েছে। সম্পূর্ণ নাড়াতে পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

"আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে। আগে তো কাঠের মতো শক্ত হয়ে থাকত।"

হাঁটুটা আরও বাঁকিয়ে ধরল রিনাল্দি। আমি ওর হাতটা দেখছি—দক্ষ শল্যচিকিৎসকের হাত। চোখ তুলে ওর মাথার দিকে তাকালাম—মসৃণ চকচকে চুল, সিঁথি কেটে সুন্দর করে আঁচড়ানো। হাঁটুটা বড় বেশি বাঁকিয়ে ধরেছে, কাত্রে উঠলাম।

"তোমার পায়ের আরও অনেক যান্ত্রিক চিকিৎসার দরকার ছিল," রিনাল্দি বলল।

"আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এ-ব্যাপারে অন্তত তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি।"

বিছানায় উঠে বসল। হাঁটু-প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। বলল,

"এবার তোমার খবর-টবর বলো তো শুনি।"

বললাম, "বলার মতো কিছুই নেই, নিরিবিলিতে কাটিয়ে এলাম একটু।"

"বিয়ে-করা সংসারী লোকেদের মতো ভাব যে তোমার। বলি ব্যাপারটা কী?"

"কিচ্ছুই না। তোমার খবর কী?"

"এ-যুদ্ধ আর সহ্য করতে পারছি না, বড় ক্লান্ত লাগছে।" রিনাল্দি বলল, হাতদুটো রাখল নিজের হাঁটুর উপর।

"ও!" আমি বললাম।

"কেন, আমার কি মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলোও থাকতে নেই?"

"ওসব বাদ দাও—বেশ ভালই সময় কেটেছে দেখছি। বলো কী খবর?"

"পুরো গ্রীষ্ম আর হেমন্তটা আমার কেটেছে অপারেশন করে। দিনরাত কাজ করেছি, প্রত্যেকের কাজ আমায় করতে হয়েছে—সমস্ত কঠিন কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত ওরা। তবে আজকাল আমি খুব ভাল শল্যচিকিৎসক হয়ে উঠেছি, বুঝলে।"

"এই তো বেশ ভাল লাগছে শুনতে।"

"ভাবনাচিন্তা সব বাদ দিয়ে শুধু অপারেশন আর অপারেশন।"

"সেটাই তো ভাল।"

"কিন্তু এখন? ও-পাট মিটে গেছে, অপারেশন আর করতে হয় না। হাতে কোনও কাজ নেই, মনে হয় যেন নরকে বাস করছি। এ বড় ভয়ংকর যুদ্ধ। এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। এবার তুমি এলে, তোমায় নিয়ে আনন্দ করা যাবে, গ্রামোফোন-রেকর্ড এনেছ তো?"

"এনেছি।"

আমার ব্যাগের মধ্যে কাগজে জড়ানো কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেকর্ডগুলো রয়েছে, কিন্তু উঠে গিয়ে বার করতে হচ্ছে না—এত ক্লান্তি।

"ভাল লাগছে না তোমার?" রিনাল্‌দি জিজ্ঞেস করল।

"নাহ্। বিশ্রী লাগছে।"

"যুদ্ধটা বড় ভয়ংকর।" রিনাল্‌দি বলল, "বেশ করে মদ খাওয়া যাক বরং। নেশা হলেই মনটা খুশি হবে, বিশ্রী চিন্তাগুলো সরে যাবে।"

"জন্ডিসে ভুগে উঠলাম, বেশি মদ খাওয়া ঠিক হবে না।" উত্তর দিলাম আমি।

"এ কী হয়ে ফিরে এলে হে? অনেক গম্ভীর হয়ে গেছ, আবার একটা পচা লিভার নিয়ে এসেছ। বলছি না, যুদ্ধটা একটা বিশ্রী ব্যাপার—কেন যে এটা বাধালাম আমরা!"

"এসো, একটু মদ খাওয়াই যাক। নেশা হওয়ার মতো খাব না, সামান্য একটু।"

দুটো গেলাস আর কগনাকের বোতল নিয়ে এল রিনাল্‌দি।

"অস্ট্রিয়ান কগনাক, সাত তারা মার্কা। সান গাব্রিয়েলি দখল করে এটুকুই লাভ হয়েছে।"

"তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি?"

"না, আমি কোথাওই যাইনি। সারাক্ষণ এখানেই থেকেছি আর অপারেশন করেছি। ওই দেখো তোমার দাঁত মাজার আয়নাটা। ওটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি—তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কিনা!"

"কী স্মরণ করায়—নিজের দাঁত মাজার কথা?"

"না গো, আমার নিজের আয়নাটা তো আছেই। ওটা দেখলেই মনে পড়ে যায়, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার ঘষে ঘষে দাঁত থেকে ভিলা রসা-র ছোপ তোলা, গালমন্দ করা, অ্যাস্পিরিন খাওয়া আর মেয়েছেলেদের গালাগাল দেওয়া। আয়নাটা মনে করিয়ে দেয দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে তোমার বিবেক পরিষ্কার করার চেষ্টার কথা।"

আমার বিছানায় এসে বসে বলল,

"একটা চুমু খাও দেখি আমায়। গম্ভীর ভাব করে থেকো না আর।"

"আমি কোনওদিন চুমু খাই না তোমায়—বনমানুষ কোথাকার।"

"জানি হে জানি, সুমার্জিত অ্যাংলো-স্যাক্সন ছেলে তুমি। আমিও দেখব সেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ছেলেটাই দাঁত মেজে আবার আগের রাতের ময়লা তোলার কসরত করছে।"

"গেলাসে একটু কগনাক দাও।"

গেলাসে গেলাসে ঠেকিয়ে পান করলাম দু'জনে। রিনাল্‌দি হেসে বলল,

"মদ গিলিয়ে মাতাল করে দেব তোমাকে, তারপর পেটের পচা লিভারটা বদলে একটা তরতাজা ইতালিয়ান লিভার পুরে তোমাকে আবার পুরুষমানুষ করে তুলব।"

আরও একটু কগনাকের জন্যে গেলাসটা এগিয়ে দিলাম। তারপর গেলাসটা হাতে নিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টি থেমে এসেছে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। গাছের মাথায় একটু একটু কুয়াশা জমেছে। রিনাল্‌দি বলল,

"জানলা গলিয়ে কগনাকটা ফেলে দিয়ো না যেন। না খেলে আমাকে দিয়ে দাও।"

বললাম, "মদের পিপেয় ডুবে মরোগে যাও।" আবার রিনাল্‌দিকে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। দু' বছর ধরে আমার সঙ্গে কত মজা করেছে ও, কত খুঁচিয়েছে, তবু বরাবরই সেটা ভাল লেগেছে আমার। দু'জনের মনের খবর পরস্পরের কাছে সবটুকুই জানা ছিল।

"বিয়ে করেছ?" বিছানায় শুয়ে জিজ্ঞেস করল রিনাল্‌দি।

জানলার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে বললাম, "এখনও করিনি।"

"ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই ইংরেজ মেয়েটিকে?"

"হ্যাঁ।"

"বেচারা! মেয়েটা ভাল? তোমাকে সুখী করতে পেরেছে?"

"হুঁ।"

"আমি মনের কথা বলছি না।"

"থামো, থামো।"

"বেশ, বেশ। তুমি দেখবে আমি খুব ভদ্র প্রকৃতির মানুষ। আচ্ছা, মেয়েটি কি—"

আমি বলে উঠলাম, "দয়া করে চুপ করো, রিনিন। আমার বন্ধু হতে চাইলে চুপ করো।"

"বন্ধু হতে চাইব কেন, তোমার বন্ধু তো আমি আছিই।"

"তা হলে প্রসঙ্গটা বন্ধ করো।"

"বেশ বাপু, বেশ।"

বিছানায় গিয়ে রিনাল্‌দির পাশে বসলাম। গেলাসটা হাতে নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

"ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ, রিনিন?"

"পারছি। আমি সারা জীবন পবিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে তর্ক করে এসেছি, অবশ্য তোমার সঙ্গে সে-তর্ক কমই হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে তোমারও কিছু পবিত্র সম্বল হয়েছে।" মেঝের দিকেই তাকিয়ে রইল রিনাল্‌দি।

বললাম, "তোমার নেই?"

"না।"

"একটাও না?"

"না।"

"তোমার মা আর বোন?"

"আর তোমার বোনও।" দ্রুত জবাব দিল রিনাল্‌দি। দু'জনেই হেসে ফেললাম।

"অতিমানব!" আমি বললাম।

"আমার বোধহয় একটু ঈর্ষা হচ্ছে।" ও বলল।

"কিছুই হচ্ছে না তোমার।"

"ঠিক তা নয়, আমি অন্য কথা বলতে চাইছি। তোমার কোনও বিবাহিত বন্ধু আছে?"

"আছে।"

"আমার নেই, অন্তত স্বামী-স্ত্রীতে ভালবাসা আছে এমন কেউ নেই। তারা আমায় দেখতে পারে না।"

"কেন?"

"আমি যে সাপ। সাপের মতো যুক্তির ছোবল মারি।"

"সব জট পাকিয়ে ফেলছ। তুলনাটা ঠিক হল না—আদম-ইভের জীবনে যুক্তিটা সাপ ছিল না, ছিল আপেল।"

"না না, সাপই ছিল।" এখন অনেকটা ফুর্তির ভাব এসেছে ওর মধ্যে।

"তুমি কিন্তু চিন্তা না করলেই ভাল থাকো।"

"এই জন্যেই তোমায় এত ভালবাসি। যখনই আমি ইতালিয়ান দার্শনিক হয়ে পড়ি, তখনই তুমি চিমটি কেটে আমাকে জাগিয়ে দাও, আমার চিন্তার ফানুসটা ফাটিয়ে দাও। কিন্তু আমি অনেক কিছু জানি যা বলতে পারি না—তোমার চেয়ে বেশিই জানি।"

"তা অবশ্য জানো।"

"তবু তোমার জীবন আমার চেয়ে ভাল কাটবে। অনুতাপ নিয়েও ভালই থাকবে তুমি।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"হ্যাঁ, সেটাই সত্যি। আমি একমাত্র কাজে ডুবে থাকলেই আনন্দ পাই।" আবার মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল রিনাল্‌দি।

"ওসব ঠিক হয়ে যাবে।" আমি বললাম।

"আর ঠিক হবে না। আরও দুটো জিনিসও আমি ভালবাসি—একটা আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর, অন্যটা আধ ঘণ্টা কিংবা পনেরো মিনিটেই শেষ, কখনও আরও কম। কিন্তু আমার কাজ ছাড়া ওই দুটো জিনিসই আমার সম্বল।"

"বাকি সবকিছুও পাবে তুমি।"

"না, আমরা কখনও কিছু পাই না। আমরা যা নিয়ে জন্মাই তার থেকে বেশি কিছু আর শেখা হয় না। আমাদের শুরুই হয় শেষের মধ্যে দিয়ে। যাকগে, তুমি যে ল্যাটিন নও তার জন্যে তোমার খুশিই হওয়া উচিত।"

"ল্যাটিন বলে কোনও জাত আছে নাকি? আছে শুধু একটা চিন্তাপ্রণালী। নিজের ভুলগুলো এরকম নির্লজ্জ ভাবে বলে বেড়ানো!"

আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল রিনাল্‌দি।

"প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়া যাক। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।"

যখন রিনাল্‌দি ফিরে এসেছিল তখন ওকে সত্যিই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

ও আবার বলল, "খাবার সময় হয়ে গেছে, চলো। তুমি যে আবার ফিরে এসেছ, তাতে খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু, সংগ্রামের ভাই।"

"সংগ্রামের ভাইরা কখন খায়?" আমি বললাম।

"এক্ষুনি। তোমার লিভারের জন্যে আর একবার পান করব আমরা।"

"সেন্ট পলের মতো।"

"কথাটা ঠিক হল না। সেটা ছিল দ্রাক্ষারস আর পাকস্থলী। তুমি তোমার পাকস্থলীর নামে একটু দ্রাক্ষারসই খাও।"

"বোতলে যা আছে তাই ঢালো। যার নামে বলবে তারই নামে খাব।"

"তোমার প্রেমিকার নামে।" গেলাসটা উঁচু করে ধরে রিনাল্‌দি বলল।

"তাই সই।"

"ওর সম্বন্ধে আর কখনও খারাপ কথা বলব না।"

"বেশি কষ্ট করতে হবে না।"

কগনাকটুকু খেয়ে নিয়ে বলল, "দেখো, আমার মনটা পবিত্রই আছে—মনে মনে আমি তোমারই মতো। আমিও একটা ইংরেজ মেয়ে খুঁজে নেব। আর সত্যি বলতে কী, তোমারটির সঙ্গে আমারই তো প্রথম পরিচয়। তবে আমার পক্ষে মেয়েটি একটু বেশি লম্বা। লম্বা মেয়েরা আমার বোন হয়।"

"খুব পরিচ্ছন্ন মন তোমার।"

"তাই না? সেই জন্যই সবাই আমাকে রিনাল্‌দো পিউরিসিমো বলে।"

"রিনাল্‌দো স্পোরচিসিমো।"

"চলো, চলো, মনটা পবিত্র থাকতে থাকতে নীচে গিয়ে খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।"

মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে নীচে গেলাম। রিনাল্‌দির একটু নেশা হয়েছে। খাবার ঘরে তখনও সব তৈরি হয়নি।

"ওপরে গিয়ে বোতলটা নিয়ে আসি বরং।"

আমি খাবার টেবিলে বসে রইলাম। ও ওপরে গিয়ে কগনাকের বোতলটা নিয়ে এল। আধ গ্লাস করে ঢালল। গ্লাসটা আলোর দিকে উঁচু করে ধরে বললাম,

"বেশি দিয়ে ফেলেছ।"

"খালি পেটের পক্ষে বেশি নয়। পেটে গেলেই একেবারে জ্বালিয়ে দেবে—দারুণ জিনিস। তোমার পক্ষে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।"

"তবে তাই হোক।"

"ধীরে ধীরে আত্মধ্বংসের ব্যবস্থা। পেটের বারোটা বাজবে, হাত কাঁপবে—শল্যচিকিৎসকের পক্ষে এর চেয়ে ভাল দাওয়াই আর কী আছে?"

"আর তুমি খেতে বলছ?"

"সানন্দে বলছি। আমি তো আর অন্য কোনও জিনিস ব্যবহারই করি না। খাও খাও, খেয়ে ফেলো, আর চেষ্টা করো কত তাড়াতাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো।"

অর্ধেকটা খাওয়ার পরই শুনতে পেলাম রান্নাঘরে বেয়ারা হাঁকছে, "সুপ তৈরি।"

মেজর এসে ঢুকলেন। আমাদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। খুব ছোট দেখাচ্ছে তাঁকে।

"আমরা এই ক'জনই নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর। পরিচারক সুপের পাত্র এনে রাখতে হাতা দিয়ে এক প্লেট তুলে নিলেন তিনি।

রিনাল্‌দি বলল, "আমরা এই ক'জনই, এক যদি পাদ্রি আসে। ফেডারিকো এসেছে জানলে সে ঠিক আসত।"

"সে কোথায়?" আমি জানতে চাইলাম।

"ও এখন ৩০৭ নম্বরে থাকে," সুপ খেতে খেতে মেজর বললেন। সুপ খাওয়া শেষ করে পাকানো গোঁফটা বাঁচিয়ে সাবধানে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "আসবে বোধহয়। আমি ওদের ওখানে গিয়েছিলাম, খবর দিয়ে এসেছি।"

আমি বললাম, "আমাদের মেসের সেই হইচই আর নেই, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।"

"হ্যাঁ, সব চুপচাপ হয়ে গেছে।" মেজর উত্তর দিলেন।

"আমিই হইচই করব।" রিনাল্‌দি বলল।

মেজর বললেন, "এনরিকো, একটু দ্রাক্ষারসের সুরা খাও।"

আমার গেলাসটা ভরে দিলেন মেজর। ইতিমধ্যে স্প্যাগেত্তি এল, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমরা। স্প্যাগেত্তি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখনই এল পাদ্রি। ঠিক যেমন ছিল তেমনটিই আছে—আগের মতোই ছোটখাটো তামাটে রঙের মানুষটি, শান্ত, চুপচাপ। উঠে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম। সে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "খবর পেয়েই চলে এসেছি।"

মেজর বললেন, "বসে পড়ো, বসে পড়ো—অনেক দেরি করে ফেলেছ।"

"শুভ সন্ধ্যা, পাদ্রি।" ইংরেজিতে বলল রিনাল্‌দি। এসব ওরা শিখেছিল সেই ক্যাপ্টেনটির কাছ থেকে যিনি পাদ্রিকে প্রতিদিন উত্যক্ত করতেন। ক্যাপ্টেনটি কিছু কিছু ইংরেজি জানতেন।

"শুভ সন্ধ্যা, রিনাল্‌দি।" পাদ্রি বলল। ইতিমধ্যে সুপ এসে গেছে পাদ্রির সামনে। পাদ্রি সেটা খেল না, বলল সে স্প্যাগেত্তি থেকে শুরু করবে।

"কেমন আছ?" পাদ্রি বলল।

"খুব ভাল। এখানে তোমরা সব কেমন ছিলে?"

"একটু মদ খাও না পাদ্রি—আঙুররস তো!" রিনাল্‌দি বলল, "তোমার পেটের খাতিরেই না হয় একটু খাও। সেন্ট পলের গল্পটা মনে আছে তো?"

"হ্যাঁ, জানি।" নম্র গলায় পাদ্রি বলল।

ওর গেলাসটা ভরে দিতে দিতে রিনাল্‌দি বলল, "এই সেন্ট পলই যত নষ্টের গোড়া।"

আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল পাদ্রি। রিনাল্‌দির খোঁচাটা ওর গায়ে লাগেনি। রিনাল্‌দি বলে চলল,

"সেন্ট পল ছিল এক নম্বর হুজুগে আর সন্ধানী লোক, বুঝলে। তারপর যখন

নিজের রক্তের তেজ কমে গেল, তখন বলল, এসব খারাপ কাজ। নিজের তেজ যখন চলে গেছে, তখন আইন বানিয়ে দিল আমাদের জন্যে, যাদের পুরো তেজ রয়ে গেছে। তাই না ফেডারিকো?”

মেজর সামান্য হাসলেন। আমরা তখন মাংসের স্টু খাচ্ছি। বললাম, “অন্ধকার হয়ে গেলে মহাপুরুষদের নিয়ে আর আলোচনা করি না আমি।”

স্টু-এর প্লেট থেকে মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসল পাদ্রি।

রিনাল্‌দি বলল, “এই রে, এটাও পাদ্রির দলে ভিড়েছে। কোথায় গেল সেই পাদ্রি-খ্যাপানোর দল? কোথায় কাবালকান্তি, কোথায় ব্রুন্দি, কোথায় গেল সিজারো? আমাকে একাই কি শেষ পর্যন্ত পাদ্রিকে খোঁচাতে হবে, আর কেউ এগিয়ে আসবে না আমায় সাহায্য করতে?”

“কিন্তু ও তো খুব ভাল পাদ্রি।” মেজর বললেন।

“হ্যাঁ, ভাল ঠিকই, তবু তো পাদ্রি! আমি চাই মেসটা আবার আগের মতো জমজমাট হয়ে উঠুক—আমি চাই ফেডারিকোকে ফুর্তিতে রাখতে। তুমি গোল্লায় যাও, পাদ্রি।”

মেজর বুঝলেন রিনাল্‌দির নেশা হয়েছে, পাতলা মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ফর্সা কপালের ওপর চুলের কালো আরও গভীর হয়ে গেছে।

পাদ্রি বলল, “ঠিক আছে রিনাল্‌দি। সব ঠিক আছে।”

“চুলোর দোরে যাও তুমি,” রিনাল্‌দি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, “জাহান্নমে যাক পুরো যুদ্ধব্যবস্থাটা।” চেয়ারে এলিয়ে পড়ল রিনাল্‌দি।

মেজর আমাকে বললেন, “ওর ভীষণ খাটুনি যাচ্ছে, তাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।” মাংস খাওয়া শেষ করে বাকি ঝোলটা একটা রুটি দিয়ে মুছে নিলেন মেজর।

“আমি কোনও কিছুর পরোয়া করি না।” টেবিলের দিকে মুখ করে চিৎকার করছে রিনাল্‌দি, “জাহান্নামে যাক সব।” উদ্ধত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে ও। চোখ দুটো বসে গেছে, মুখটা ফ্যাকাশে।

আমি বললাম, “বেশ বেশ, সবকিছুই জাহান্নামে যাক।”

রিনাল্‌দি বলল, “না না, তুমি সেটা পারবে না। তুমি শুকিয়ে গেছ, ফুরিয়ে গেছ, আর কিচ্ছু নেই তোমার। আমি জানি—যখনই আমি কাজ বন্ধ করি, তখনই এমনি করে সব ফাঁকা হয়ে যায়।”

পাদ্রি মাথা নাড়ল। বেয়ারা স্টু-র পাত্র উঠিয়ে নিল।

পাদ্রির দিকে তাকিয়ে রিনাল্‌দি বলল, “মাংস খাচ্ছ কেন? আজ শুক্রবার না?”

“আজ ব্রেস্পতিবার।” পাদ্রি উত্তর দিল।

“বাজে কথা, আজ শুক্রবার। প্রভু যিশুর মাংস খাচ্ছ তুমি, ঈশ্বরের মাংস—আমি জানি। মৃত-অস্ট্রিয়ানের মাংস খাচ্ছ তুমি।”

"অফিসারদের মাংস সাদা হয়।" পুরনো একটা ঠাট্টার জের টেনে বললাম আমি।

হেসে ফেলল রিনাল্‌দি। গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না, মাথাটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে।"

"তোমার একবার ছুটি নেওয়া দরকার," পাদ্রি বলল।

মেজর ইশারা করে মাথা নাড়লেন পাদ্রির দিকে। পাদ্রির দিকে তাকিয়ে রিনাল্‌দি বলল, "তোমার মনে হয় আমার ছুটি নেওয়া দরকার?"

পেছন থেকে পাদ্রিকে আবার ইশারা করে মাথা নাড়লেন মেজর।

পাদ্রি বলল, "তোমার যা ইচ্ছে। দরকার না থাকলে ছুটি নেবে কেন?"

"জাহান্নমে যাও তুমি," রিনালদি বলল, "সবাই আমাকে তাড়াতে চায়। আমার কাছ থেকে নিস্তার পাবার জন্য রোজ রাতে ওরা অস্থির হয়ে ওঠে। আমিও ঠেকাই ওদের। যা-খুশি থাকুক না আমার, তাতে কার কী? সবারই আছে, দুনিয়াশুদ্ধু লোকের আছে।"

তারপরে বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে আবার শুরু করল, "প্রথমে ছোট্ট একটা ফুসকুড়ি। তারপর দেখা যায় চারপাশ দিয়ে দানা দানা বেরিয়েছে। শেষে আর কিছুই দেখা যায় না। পারার ওপর বিশ্বাস করে বসে থাকি আমরা।"

"কিংবা সালভার্সন।" নিচু গলায় মেজর বললেন।

"পারা থেকে তৈরি", বলল রিনাল্‌দি। উচ্ছ্বাসভরে বলে চলল, "সালভার্সনের দ্বিগুণ কাজ হয় এমন ওষুধ আমি জানি। পাদ্রি আমাদের খুব ভাল, তোমার কখনও হবে না। ফেডারিকোর হবে। এটা এই যান্ত্রিক যুগের দুর্ঘটনা, আর কিছু নয়।"

বেয়ারা মিষ্টি আর কফি নিয়ে এল, পুডিং নিয়ে এল। বাতি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, চিমনির ওপরে কালো হয়ে ধোঁয়া জমেছে।

মেজর বেয়ারাকে বললেন, "ওই আলোটা সরিয়ে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসো।"

বেয়ারা দুটো রেকাবের ওপর দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, অন্য বাতিটা নিভিয়ে সরিয়ে নিল। রিনাল্‌দি এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে ওকে। স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছি সবাই। কফি খাওয়া শেষ হতে সবাই উঠে হলঘরে এলাম।

রিনাল্‌দি বলল, "তুমি তো এখন পাদ্রির সঙ্গে গল্প করবে। আমাকে একটু শহরে যেতে হবে। শুভরাত্রি, পাদ্রি।"

"শুভরাত্রি, রিনাল্‌দি।" পাদ্রি বলল।

"ঘুরে আসছি, ফ্রেডি।" রিনাল্‌দি আমাকে বলল।

"তাড়াতাড়ি ফিরো।" জবাব দিলাম আমি।

আমার দিকে চেয়ে মুখভঙ্গি করে বেরিয়ে গেল ও।

মেজর আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "প্রচণ্ড খাটুনি যাচ্ছে ওর। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর ধারণা ওর সিফিলিস হয়েছে। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না, তবে হতেও পারে। নিজেই নিজের চিকিৎসা করছে। আচ্ছা, শুভরাত্রি। তুমি তো কাল অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যাবে, তাই না এনরিকো?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়। পেদুৎসি তোমাকে জাগিয়ে দেবে, সঙ্গেও যাবে।"

"বিদায়, সিনর মাগগিওরে।"

"বিদায়। ওরা বলছে বটে অস্ট্রিয়ানরা আক্রমণ করতে পারে, তবে আমার বিশ্বাস হয় না। আশা করি কিছু হবে না। অন্তত এখানে কিছু হবে না। জিনোর কাছে সব খবর পাবে। টেলিফোনটা এখন ভালই আছে।"

"আমি নিয়মিত ফোন করব।"

"কোরো কিন্তু ঠিক। শুভরাত্রি। রিনাল্‌দিকে বেশি ব্র্যান্ডি খেতে দিয়ো না।"

"চেষ্টা করব।"

"শুভরাত্রি, পাদ্রি।"

"শুভরাত্রি, সিনর মাগগিওরে।"

নিজের অফিসে চলে গেলেন মেজর।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। কুয়াশায় ছেয়ে গেছে বাইরেটা। পাদ্রিকে জিজ্ঞেস করলাম,

"ওপরে গিয়ে বসবে না?"

"বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু।"

"আচ্ছা, চলো তো।"

ওপরে উঠে আমার ঘরে ঢুকলাম। রিনাল্‌দির বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম, পাদ্রি বসল আমার খাটে। মেসের বেয়ারা ইতিমধ্যে এসে আমার বিছানাটা পেতে দিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার।

পাদ্রি বলল, "কেমন আছ বলো?"

"এমনি ভালই আছি, কিন্তু আজ রাতে ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।"

"আমারও খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, তবে তার কোনও কারণ নেই।"

"যুদ্ধের কী অবস্থা?"

"আমার ধারণা শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে। কারণ বলতে পারব না, তবে মনে হচ্ছে।"

"কেন বলো তো?"

"তোমাদের মেজরকে দেখলে তো? কেমন শান্ত হয়ে গেছেন না? অনেকেরই এখন এরকম অবস্থা।"

"আমার নিজেরও ঠিক তাই হয়েছে।" আমি বললাম।

"এ বছরের গ্রীষ্মটা বড় ভয়ানক কেটেছে," পাদ্রি বলল। আমি যাওয়ার সময় ওকে যেমন দেখে গেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস এসে গেছে ওর মধ্যে।

ও বলল, "কী যে হয়েছিল তা তুমি ভাবতেও পারবে না। যুদ্ধ যে কী জিনিস সেটা এই গ্রীষ্মে মানুষ কিছুটা বুঝেছে। যেসব অফিসাররা জীবনে কখনও যুদ্ধের আসল চেহারা বা তার সর্বনাশা পরিণতির কথা বুঝতে পারবে না ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তারাও বদলে গেছে।"

"শেষ পর্যন্ত কী হবে?"

"তা জানি না, কিন্তু এভাবে আর বেশিদিন চলতে পারে বলে মনে হয় না।"

"কী হবে?"

"ওরা যুদ্ধ বন্ধ করবে।"

"কারা?"

"দু' পক্ষই।"

"প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়।"

"তুমি বিশ্বাস করো না?"

"দু'পক্ষই একসঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করবে—এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"আমিও ঠিক করি না—সেটা খুব বেশি আশা করা হয়ে যায়। কিন্তু সবার মধ্যে যখন পরিবর্তন চোখে পড়ে, তখন মনে হয় আর চলবে না এ-যুদ্ধ।"

"এই গ্রীষ্মে কারা জিতল?"

"কেউই না।"

"না, অস্ট্রিয়ানরা জিতেছে।" আমি বললাম, "সান গাব্রিয়েলি দখল করতে দেয়নি ওরা। তার মানেই জিতেছে। ওরা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে না।"

"আমরা যেমনটা অনুভব করছি, ওরাও যদি তাই করে তাহলেও ওরা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। ওদেরও তো একই রকম অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে!"

"যারা জেতে তারা কখনও থামে?"

"তুমি আমাকে হতাশ করে দিচ্ছ।"

"না, তবে আমার যা মনে হচ্ছে সেটাই বলছি।"

"তাহলে তুমি কি মনে করো এরকম চলতেই থাকবে, কিছুই ঘটবে না কখনও?"

"তা জানি না। আমি শুধু মনে করি অস্ট্রিয়ানরা যখন একবার জিতেছে তখন তারা যুদ্ধ থামাবে না। পরাজিত হলেই আমরা খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে পড়ি কিনা।"

"অস্ট্রিয়ানরাও তো খ্রিস্টান। তবে বস্‌নিয়ানরা নয়।"

"না না, আমি সে-অর্থে বলছি না। আমি বলছি আমাদের প্রভু যিশুর মতো ক্ষমাশীল হয়ে পড়ার কথা।"

পাদ্রি উত্তর দিল না। আমি বললাম,

"এখন আমরা সবাই শান্ত, কারণ আমরা পরাজিত। পিটার যদি প্রভুকে বাগান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারতেন, তাহলে তাঁর অবস্থা কেমন হত কে জানে!"

"তাহলেও তিনি যা ছিলেন তাই-ই থাকতেন।"

"আমার অবশ্য তা মনে হয় না," বললাম আমি।

"তুমি আমাকে হতাশ করে দিচ্ছ। কিন্তু আমার ধারণা একটা কিছু হবেই— প্রার্থনাও করি তাই যেন হয়। আমি সারা মনপ্রাণ দিয়ে এমনি একটা পরিসমাপ্তি অনুভব করছি।"

"হয়তো কিছু হবে," আমি বললাম, "কিন্তু তা শুধু আমাদের তরফেই হবে। ওরাও যদি আমাদের মতো অনুভব করে তাহলে তো ভালই। কিন্তু ওরা যে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, ফলে ওদের অনুভূতি অন্যরকম হবে।"

"অনেক সাধারণ সৈনিক অনেক দিন থেকেই এটা অনুভব করে আসছে, আর সেটা হেরে যাওয়ার ফলে নয়।"

"তারা যে গোড়াতেই মার খেয়েছে। নিজেদের চাষবাস থেকে সরিয়ে এনে যখনই ওদের সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হল তখনই ওদের পরাজয় হয়েছে। তাই তারা আজ এত অভিজ্ঞ। ওদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেখো, ওরা কত বিচক্ষণতা দেখায়।"

পাদ্রি কোনও উত্তর দিল না, চুপচাপ চিন্তা করতে লাগল।

"আজ নিজেই এখন হতাশ হয়ে পড়েছি," আমি বলে চলি, "তাই এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। কাজেই এসব আলোচনায় আমি যা বলি সেটা শুধু আমার অনুভূতিমাত্র, চিন্তা- ভাবনার ফল নয়।"

"আমি কিন্তু কিছু একটা আশা করেছিলাম।"

"পরাজয়?"

"না, অন্য কিছু।"

"এর আর অন্য কিছু নেই, শুধু জয় ছাড়া। এখন হয়তো পরাজয়ের চেয়েও খারাপ কিছু ঘটবে।"

"আমি অনেকদিন পর্যন্ত জয়ের আশা করেছিলাম।"

"আমিও।"

"কিন্তু এখন কী যে হবে কে জানে।"

"হয় এসপার, নয় ওসপার।"

"কিন্তু জেতার আশা আর করি না।"

"আমিও না। তবে পরাজয় হবে বলেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। তার চেয়ে ভাল কিছু হতেও পারে।"

"সেটা কী?"

"ঘুম।" আমি বললাম।

পাদ্রি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, "সত্যি, কতক্ষণ ধরে বসে আছি বলো তো! আমি সত্যি খুব দুঃখিত। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে এত ভাল লাগে!"

"ঘুমের কথাটা আমি এমনিই বলেছি, কিছু ভেবে বলিনি। আবার তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেরে কী ভাল যে লাগছে!"

উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে করমর্দন করলাম দু'জনে।

"আমি এখন ৩০৭ নম্বরে থাকি," ও বলল।

"আমি কাল খুব ভোরেই ঘাঁটিতে চলে যাচ্ছি।"

"তুমি ফিরে এলে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

"চলো, গল্প করতে করতে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।" দোরগোড়া পর্যন্ত গেলাম ওর সঙ্গে।

"না, নীচে যেয়ো না।" পাদ্রি বলল, "তুমি যে ফিরে এসেছ, ভীষণ ভাল লাগছে—যদিও তোমার পক্ষে সেটা খুব একটা ভাল হয়নি।" আমার কাঁধে হাত রাখল ও।

"না, আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। আচ্ছা, শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি, চিয়াও।"

"চিয়াও।" আমি বললাম। ঘুমে চোখ যেন জড়িয়ে আসছে।

রিনাল্‌দি ঘরে আসার পর একবার ঘুম ভেঙেছিল, কিন্তু কোনও কথা না বলে তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে উঠে অন্ধকার থাকতে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েছি। রিনাল্‌দি তখনও ঘুমোচ্ছে।

এর আগে আমি কখনও বাইনসিজ্জায় যাইনি। মনের মধ্যে একটা বিচিত্র উত্তেজনাময় অনুভূতি জাগছে। যে-জায়গাটায় একসময় অস্ট্রিয়ানরা ছিল, যেখানে একদিন আমি জখম হয়ে পড়ে ছিলাম, ঢাল বেয়ে নদী পার হয়ে সেখানকার ওপর দিয়ে চলেছি। একটা নতুন খাড়া রাস্তা উঠে গেছে, পথ দিয়ে আরও অনেক যানবাহন চলছে। ওপাশে গিয়ে রাস্তাটা আবার সমান হয়ে গেছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ছে জঙ্গল আর খাড়া পাহাড়। জঙ্গলগুলো দখল করতে তেমন সমস্যা হয়নি, ফলে সেগুলো বেশির ভাগই অক্ষত

অবস্থায় রয়ে গেছে। ওপাশে রাস্তাটার যে-সব জায়গায় পাহাড়ের আড়াল নেই সেখানে বুনোট-পাটির বেড়া আর ছাউনি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। একটা বিধ্বস্ত গ্রামের প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। তারই পেছনে অন্যদিকে আমাদের ঘাঁটি। চারপাশ ঘিরে অসংখ্য কামান, বাড়িগুলো প্রায় সবই বিধ্বস্ত। তবে বন্দোবস্ত ভালই করা হয়েছে। চারপাশে প্রচুর সাইনবোর্ড লাগানো। জিনো-র সঙ্গে দেখা হল। সে আমাদের কফি খাওয়াল। তারপর তার সঙ্গে গিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আর ঘাঁটিগুলো পরিদর্শন করে এলাম। জিনো বলল, ব্রিটিশ গাড়িগুলো বাইনসিজ্জায় কাজ করছে। ব্রিটিশদের ওপর খুব শ্রদ্ধা ওর। ও বলল, এখনও কিছু গোলাগুলি চলছে, তবে আহতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, এবার রুগীর সংখ্যা খুব বাড়বে। জিনোর ধারণা অস্ট্রিয়ানদের আক্রমণের খবরটা নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদেরও নাকি আক্রমণ করার কথা, কিন্তু এখনও উপযুক্ত সৈন্যসমাবেশ হয়নি বা অন্য কোনও তোড়জোড়ও নেই, কাজেই সেটাও ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। খাবারের অভাব খুবই—জিনো জানাল। এতদিনে সে গোরিজিয়ায় গিয়ে পেট ভরে খেয়ে বাঁচবে। গোরিজিয়ায় গত রাতে কেমন খাওয়াদাওয়া হল, জানতে চাইল সে। খাবারের তালিকা শুনে খুব খুশি, বিশেষত 'দোলচে'র নাম শুনে। 'দোলচে' যে আসলে বড় গোছের রুটির পুডিং সেটা আর খুলে বললাম না ওকে, নাম শুনেই ভেবে নিল দারুণ কিছু হবে।

ও জানতে চাইল ওকে কোথায় যেতে হবে সেটা আমি জানি কি না। বললাম, সেটা আমার জানা নেই, তবে অন্য গাড়িগুলোর মধ্যে কয়েকটা এখন কাপোরেত্তো-তে আছে। ও বলল, ওখানে যেতে পারলে ও খুশিই হবে। সুন্দর ছোট্ট একটা জায়গা, চারপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়। জিনো বেশ চমৎকার ছেলে, সকলেই ওকে পছন্দ করে। ও বলল—সব থেকে বিশ্রী অবস্থা হয়েছিল সান গাব্রিয়েলিতে আর লোম-এর ওপারে আক্রমণটাও খুব খারাপ হয়েছিল। ও আরও বলল—অস্ট্রিয়ানরা তেরলোভা পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলে অনেক কামান বসিয়েছিল, আর যাতায়াতের পথগুলোকে গোলাবর্ষণে সারারাত অগম্য করে রাখত। নৌবাহিনীর কয়েকটা কামান ব্যবহার করেছিল ওরা,তার শব্দে নাকি জিনোর স্নায়বিক রোগ দেখা দিয়েছে। কামান দাগার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কাছেই হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা যেত, প্রায়ই পরপর দুটো কামান একসঙ্গে ছোঁড়া হত—গোলার টুকরাগুলো ছিল বিরাট বিরাট।

"হয়তো ওগুলো তেমন ক্ষতি করে না", জিনো বলল, "কিন্তু আমার ভীষণ ভয় করে। এমন অদ্ভুত আওয়াজ, মনে হয় যেন সোজা আমার দিকেই ধেয়ে আসছে। ভয়েই যদি আধমরা হয়ে পড়ি, তাহলে আহত না হয়ে লাভটা কী?"

আস্তানায় ফিরে এলাম। অস্ট্রিয়ানদের যুদ্ধ প্রতিরোধ ও আক্রমণ নিয়ে নানান আলোচনা হল, খানিকটা তর্কাতর্কিও হয়ে গেল।

জিনো বলল, "পার্বত্য সীমান্ত হলে আপনি কীভাবে যুদ্ধ করতেন?"

আমি বললাম, "সে-ব্যাপারে এখনও ছক তৈরি করা হয়নি।" দু'জনেই হাসলাম। বললাম,

"কিন্তু সেকালে অস্ট্রিয়ানরা বরাবরই ভেরোনায় চারদিক থেকে মার খেয়েছে। ওদের সমতলে নামিয়ে এনে তারপর শেষ করা হত।'

জিনো বলল, "ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তখন ওদের শত্রু ছিল ফরাসিরা। আর অন্য দেশের মাটিতে চিরদিনই হিসেব কষে যুদ্ধ করা চলে।"

"তা ঠিক," কথাটা স্বীকার করে নিলাম, "নিজের দেশে হলে পদ্ধতিগুলো ততটা বিজ্ঞানসম্মত করা যায় না।"

"রুশরা কিন্তু নেপোলিয়নকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নির্ভুল পথ বেছে নিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, তবে ওদের প্রচুর জায়গা ছিল। এখানে ইতালিতে যদি পিছিয়ে গিয়ে নেপোলিয়নকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে হয় তাহলে সেই ব্রিন্‌দিসি পর্যন্ত পিছু হঠতে হবে।"

" ব্রিন্‌দিসি ভয়ংকর জায়গা।" জিনো বলল, "আপনি কখনও গেছেন?"

"গেছি, তবে কখনও থাকিনি।"

জিনো বলল, "দেশভক্ত হয়েও আমি কখনও ব্রিনদিসি কিংবা তারান্তোকে ভালবাসতে পারলাম না।"

"বাইনসিজ্জাকে ভালবাস তুমি?" জিজ্ঞেস করি।

"এখানকার মাটি পবিত্র। তবে আলুর ফলনটা আর একটু বেশি হলে ভাল হত। আমরা যখন প্রথম এখানে আসি, তখন অস্ট্রিয়ানদের তৈরি অনেক আলুর খেত আমাদের হাতে আসে।"

"খাবার কি সত্যিই কম পড়ত?"

"আমি একদিনও পেট ভরে খেতে পাইনি। অবশ্য আমি একটু বেশি খাইয়ে লোক। তবে ঠিক না-খেয়ে থাকতে হয়নি কখনও। মেসের খাওয়াটা মোটামুটি। প্রথম সারির সৈন্যরা খুবই ভাল খাবার পায়, কিন্তু পেছনে যারা সাহায্যের জন্য রয়েছে, তারা উপযুক্ত খাদ্য পায় না—এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গলদ আছে। খাবার কিন্তু প্রচুর থাকা উচিত।"

"খাবারদাবার বিক্রি করে দেয় আর কি!"

"হ্যাঁ। সামনের সারির সৈন্যরা পুরো খাবার পায়, কিন্তু পেছনের যোদ্ধারা পায় ভীষণ কম। বেচারারা জঙ্গলের মধ্যে বসে সমস্ত অস্ট্রিয়ান আলু আর বাদাম খেয়ে টিকে থেকেছে। আরও ভাল খাবার পাওয়া উচিত ছিল ওদের। খাদ্যের অভাবে সৈন্যদের কষ্ট পাওয়া ভীষণ অন্যায়। ওরা খাইয়ে লোক, আর খাবার যে যথেষ্ট আছে সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমাদের এ-ধরনের ভাবনার পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, এতে যুদ্ধে জেতা যাবে না, শুধু হারার রাস্তাটা পরিষ্কার হবে।" আমি বললাম।

"হারার ব্যাপারে আলোচনা করব না, ও নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। এই গ্রীষ্মে যা-কিছু করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হবে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। বরাবরই 'পবিত্র', 'গৌরবময়', 'ত্যাগ', 'পরিণাম' —এ-ধরনের বাহারি কথা শুনলে লজ্জা পাই আমি। জীবনে এসব কথা বিস্তর শুনেছি। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে যেমন বাক্যের বাণী হারিয়ে যায়, শুধু তার শব্দটাই কানের পর্দায় অর্থহীন আঘাত করে চলে, পথ চলার গতিতে যেমন পথের দু'ধারের প্রাচীরপত্রের কথাগুলো চোখে পড়ে এবং মানেটা বুঝে ওঠার আগেই চোখের আড়ালে চলে যায়—তেমনি এসব কথাও কানের পর্দায় অর্থহীন আঘাতই শুধু করে গেছে, মনের পর্দায় তার কোনও প্রতিচ্ছবি পড়েনি। পবিত্র কিছুই চোখে পড়ল না আজ পর্যন্ত, গৌরবোজ্জ্বল বস্তুর গৌরব কোথায় হারিয়ে গেছে, ত্যাগ আজ ত্যক্ত বস্তুর আবর্জনায় মুখ লুকিয়েছে। সামরিক জীবনে আমাদের স্মৃতির সম্বল বলতে শুধু কতকগুলো নির্জীব গ্রাম, রাস্তা আর নদীর নাম এবং তার সঙ্গে বাহিনীর নাম, সংখ্যা আর তারিখ। এ-সবের সঙ্গে যশ-গৌরব-সাহসিকতা- পবিত্রতা জাতীয় ফাঁকা কথাগুলো জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। অবশ্য জিনোর কথা আলাদা, সে দেশপ্রেমিক। ফলে দু'জনের মধ্যে অনেক মতের ফারাক ঘটছে, তবু ছেলেটি বড় ভাল। আর ওর দেশপ্রেমে আমার সহানুভূতিরও কোনও অভাব নেই।

পেদুৎসির সঙ্গে গাড়িতে গোরিজিয়ায় ফিরে গেল জিনো।

সারাদিন দামাল বাতাসের দাপাদাপি, ঝড় আর বৃষ্টি। জল-কাদায় ভরে গেছে চারদিক। ভাঙা বাড়িগুলোর পলেস্তারা ভিজে গেছে জলে। বেলা পড়তে বৃষ্টি বন্ধ হল। আমাদের দু'নম্বর ঘাঁটিতে বসে দেখতে পেলাম হেমন্তের বৃষ্টিভেজা গ্রামখানা—চারপাশের পাহাড়গুলোর ওপরে মেঘ জমেছে, সামরিক রাস্তায় বেড়ার গা বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে। সন্ধ্যা নামার আগে সূর্য একবার মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল করে তুলল পাহাড়ের পিছনে রিক্ত অরণ্যকে, তারপর ধীরে ধীরে ডুব দিল অস্তাচলের পথ বেয়ে অন্ধকারের গুহায়। অরণ্যের মধ্যে অনেক অস্ট্রিয়ান কামান রয়েছে, কিন্তু তার মাত্র কয়েকটা থেকেই গোলাবর্ষণ হচ্ছে। যুদ্ধ লাইনের পাশে, ভাঙা খামারবাড়ির মাথার ওপরে আকাশের গায়ে অকস্মাৎ দেখা গেল কামানের মুখ থেকে ছিটকে-যাওয়া নরম একটা ধোঁয়ার গোলা, তার বুকে হলদেটে সাদা আগুনের ঝলক। ঝল্‌কে ওঠে অগ্নিবাণ, তারপরে শোনা যায় বিস্ফোরণের শব্দ,তারও পরে ধীরে ধীরে আকাশের বুকে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার গোলক। বাড়িগুলোর চারধারে আর রাস্তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য গোলার টুকরো, কিন্তু আমাদের ঘাঁটি অবধি কোনও গোলাই এসে পৌঁছয়নি সেদিন। দু'গাড়ি বোঝাই আহতদের নিয়ে বেড়া-ঢাকা রাস্তা দিয়ে চলেছি, বুনোট-পাটির

বেড়ার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে পড়ন্ত সূর্যের অন্তিম আলোর রশ্মি। বেড়ার আড়াল পার হয়ে খোলা রাস্তায় এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্য ডুবে গেল দূর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দিগন্তের আড়ালে। খোলা রাস্তাটা মোড় ঘুরে আবার একটা বুনোট-পাটির সুড়ঙ্গে ঢুকে গেছে, সেই পথ দিয়ে আমাদের অ্যাম্বুল্যান্সগুলো চলল, আর তখনই বৃষ্টি নামল।

রাতে ঝড় উঠল, আর ভোর তিনটে থেকে তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হল বোমাবর্ষণ। পাহাড়তলি পেরিয়ে বনের ফাঁকে ফাঁকে ক্রোয়েশিয়ানরা এসে পড়েছে যুদ্ধ লাইনের সামনে। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনের আচমকা ভয়-পাওয়া সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হল। বৃষ্টির মধ্যেই প্রচুর গোলাবর্ষণ হয়ে গেল, অসংখ্য হাউই মেঘে-ভরা আকাশে তারার বাতি জ্বালাল, কামান আর রাইফেলের আগুন বৃষ্টিরাতের অন্ধকারকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিল। ক্রোয়েশিয়ানরা আর ফিরে আসেনি। আবার শান্ত হয়ে গেছে যুদ্ধসীমান্ত—ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপির মাঝে কখনও-কখনও শুধু ভেসে আসছে সুদূর উত্তরপ্রান্তে গোলাবর্ষণের শব্দ।

ঘাঁটিতে আহতদের আসা শুরু হয়ে গেছে। পায়ে হেঁটে, স্ট্রেচারে শুয়ে অথবা সঙ্গীদের পিঠে চেপে আসছে তারা। ওদিকের মাঠ পেরিয়ে আসছে ওরা। ভিজে জাব হয়ে গেছে সবাই, মন চুপসে গেছে ভয়ে। স্ট্রেচারের রুগীরা আসামাত্রই দুটো গাড়িতে তাদের তুলে ফেললাম, আর ওদের গাড়িতে তোলামাত্রই বুঝতে পারলাম মুখের ওপর বৃষ্টির ঝাপ্‌টাগুলো ক্রমশ তুষারকণায় পরিণত হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জমাট হয়ে নেমে আসছে তুষারপুঞ্জ।

দিনের আলো ফুটতে তুষারপাত বন্ধ হল, ঝড় তখনও বয়ে চলেছে আর শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সকাল হওয়ার পর আরও একবার আক্রমণ করল ওরা, কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হল। সারাদিন ধরে আবার একটা আক্রমণের অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সূর্যাস্তের আগে আর কিছু ঘটল না। তারপর দক্ষিণেরপাহাড়তলির বনে জড়ো-করা অস্ট্রিয়ানদের অসংখ্য কামান থেকে শুরু হল গোলাবর্ষণ। মনে হচ্ছিল গোলার পাল্লা আমাদের ঘাঁটি পর্যন্ত আসবে, কিন্তু তা এল না। অন্ধকার হয়ে এল। গ্রামের পেছনের মাঠ থেকে কামানের গোলার দূরে ছুটে যাওয়ার শব্দে যেন স্বস্তির স্বাদ।

খবর পেলাম দক্ষিণের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। সে-রাতে আর আক্রমণ করল না ওরা। কিন্তু আবার খবর পাওয়া গেল, উত্তর দিকের সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ওরা। রাতে খবর এল পিছু হঠার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। ঘাঁটির ক্যাপ্টেনের কাছে পেলাম খবরটা। তিনি আবার সেটা পেয়েছেন ব্রিগেডের কাছ থেকে। খানিকক্ষণ পরে টেলিফোন ছেড়ে উঠে এসে ক্যাপ্টেন জানালেন—খবরটা ভুয়ো। ব্রিগেডে নির্দেশ এসেছে যে-ভাবেই হোক বাইনসিজ্জার ঘাঁটি রক্ষা করতেই হবে। উত্তরদিকের খবর জানতে চাইলাম, ক্যাপ্টেন

বললেন ব্রিগেডে খবর এসেছে—সাতাশ নম্বর বাহিনী ভেদ করে কাপোরেত্তোর দিকে এগিয়ে গেছে অস্ট্রিয়ানরা। উত্তর সীমান্তে সারাদিন তুমুল যুদ্ধ হয়েছে।

"শালারা একবার ঢুকতে পারলে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দেবে।" বললেন ক্যাপ্টেন।

"জার্মানরা আক্রমণ করছে," একজন ডাক্তার বলল। জার্মান কথাটার মধ্যে কেমন যেন ভীতিপ্রদ অস্বস্তি। জার্মানদের সংস্পর্শে আসতে আমাদের বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই। ডাক্তারটি আবার বলল,

"পনেরোটা জার্মান বাহিনী রয়েছে উত্তর সীমান্তে, আমাদের লাইন ভেঙে তারা ইতিমধ্যে ঢুকেও পড়েছে। এবার আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো সব চুরমার হয়ে যাবে।"

"ব্রিগেডে ওরা বলছে—যেভাবেই হোক ঘাঁটি আমাদের আগলাতেই হবে। শত্রুরা উত্তর দিকের প্রতিরোধ ভেদ করলেও পরিস্থিতিটা এখনও খুব হতাশাজনক নয়—আর মন্তে মাগ্‌গিওরে বরাবর পাহাড়সারি ধরে ভালভাবেই নতুন প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে।"

"খবরটা ওরা কোথায় পেল?"

"ডিভিশন থেকে।"

"আমাদের পিছু হঠার খবরটাও তো ডিভিশন থেকেই এসেছিল।"

"আমরা আর্মি কর্পসের অধীনে কাজ করি," আমি ক্যাপ্টেনকে বললাম, "কিন্তু এখানে আমি আপনার হুকুমের অধীন। সুতরাং আপনি যেতে বললেই যাব। তবু আগে নির্দেশটা সরাসরি জেনে নিন।"

"নির্দেশ হচ্ছে—আমাদের এখানে থাকতে হবে। তোমাকে আহতদের এখান থেকে নিয়ে ঘাঁটিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে শুশ্রূষা-কেন্দ্রে পাঠানোর জন্যে।"

"অনেক সময় আবার শুশ্রূষা-কেন্দ্র থেকে অস্থায়ী হাসপাতালগুলোতে পৌঁছে দিতে হয়।" আমি বললাম, "আমি কখনও পিছু-হঠা দেখিনি—তখন সমস্ত আহতদের কীভাবে সরানো হয়?"

"সবাইকে কি আর সরানো যায়? যে-ক'জনকে পারে নিয়ে যায়, বাকিদের ফেলে রেখে যায়।"

"আমার গাড়িগুলোতে কী নিয়ে যাব?"

"হাসপাতালের জিনিসপত্র।"

"ঠিক আছে।"

পরের রাতে পিছু হঠা শুরু হল। খবর পেলাম অস্ট্রিয়ান আর জার্মানরা আমাদের সীমানা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে—পাহাড়ের উপত্যকা বেয়ে সিভিদালে আর উনিনের

দিকে নেমে আসছে ওরা। ভেজা, গম্ভীর মানুষগুলো সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হঠে গেল। অন্ধকার রাতে অঝোর বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফিরে চলেছি সবাই। জনাকীর্ণ পথে বিশাল মিছিল চলেছে মানুষ আর খচ্চরের, মোটর ট্রাক আর কামানের। আক্রমণের সময় যেমন সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা, আজও ঠিক তেমনি সুশৃঙ্খল ভাবে ফিরে চলেছে। সেই রাত আর তার পরের পুরো দিনটা কেটে গেল বৃষ্টির মধ্যে অস্থায়ী হাসপাতালগুলো খালি করতে। একটানা বৃষ্টির মধ্যেই বাইনসিজ্জার সমস্ত সৈন্যবাহিনী একে একে ফিরে এল তাদের গত বছরের বিজিত এলাকাগুলোর ওপর দিয়ে।

পরের দিন দুপুর নাগাদ গোরিজিয়ায় ফিরে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, শহরও প্রায় খালি। সৈনিক্‌দের জন্য নির্দিষ্ট গণিকালয় থেকে লরি বোঝাই করে মেয়েদের সরানোর তোড়জোড় চলছে। সাতজন মেয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—মাথায় টুপি, গায়ে কোট, হাতে ছোট সুটকেস। তাদের মধ্যে দু'জনের চোখে জল। আর একজনের অদম্য উৎসাহ—সে আমাদের দিকে চেয়ে একটু অভব্য ইশারা করল, তার চোখ দুটো কালো আর ঠোঁটটা পুরু। ওদের পরিচালিকার কাছ থেকে জানলাম অফিসারদের গণিকালয়টি সকালেই খালি করা হয়ে গেছে। কনেগ্লিয়ানোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সবাইকে। ওদের নিয়ে চলে গেল ট্রাকটা। পরিচালিকা হাত নেড়ে বিদায় জানাল, সেই মেয়ে দুটি তখনও কাঁদছে, অন্যজন আবার অভব্য ইঙ্গিত করল, অন্যদের উৎসুক দৃষ্টি শহরের চারদিকে।

আমার ড্রাইভার বোনেলো বলল, "ওদের সঙ্গে যেতে পারলে হত। দারুণ জমত যাত্রাটা।"

"আমাদের যাত্রাটাও ভালই জমবে," আমি বললাম।

"আমাদেরটা হবে অযাত্রা।"

"আমিও তো তাই-ই বলছি।"

ততক্ষণে আমাদের মেসবাড়ির দরজায় এসে ড্রাইভারকে গাড়ির তেলজল বদলে, পেট্রল ভরে, একটু ঘুমিয়ে নিতে বলে মেসবাড়িতে ঢুকলাম আমি। খালি পড়ে আছে বাড়িটা। রিনাল্‌দি হাসপাতালের সঙ্গে চলে গেছে। মেজর হাসপাতালের কর্মীদের নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে গেছেন। আমার জন্যে জানলায় একটা ছোট চিঠিতে নির্দেশ রয়েছে—জিনিসপত্র সব হলঘরে জমা করে রাখা আছে, সেগুলো গাড়িতে তুলে পের্দিনোনের দিকে যাত্রা করতে হবে।

গাড়ির মিস্ত্রিরা সবাই আগে চলে গেছে। আমি আবার গ্যারাজে গেলাম। ততক্ষণে অন্য গাড়ি দুটোও এসে পড়ল, আর আবার শুরু হল বৃষ্টি।

ড্রাইভার পিয়ানি বলল, "আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে! প্লাভা থেকে আসার রাস্তায় বার তিনেক ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন আমাদের কী করতে হবে, তেনেন্তে?"

"তেল বদলাব, গ্রিজ দিয়ে নেব, তারপর পেট্রল ভরে গাড়িগুলোকে বাড়ির সামনের দিকে নিয়ে ওদের ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্র তুলব।"

"তারপর রওনা হতে হবে?"

"না, আগে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেব।"

"ভগবান দয়াময়, একটু ঘুমিয়ে বাঁচব!" বোনেলো বলল, "গাড়ি চালানোর সময় আর জেগে থাকতে পারছি না।"

"তোমার গাড়ির কী খবর, আইমো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ঠিকই আছে।"

"চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে হাত লাগাই।" আমি বললাম, "তেলটা বদলে ফেলি।"

আইমো বাধা দিল, "না না, আপনাকে ওসব করতে হবে না, আপনি বরং ওপরে গিয়ে আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।"

"জিনিসপত্র আমার গোছানোই আছে। আমি হলের ভেতরের মালপত্র বাইরে আনার ব্যবস্থা করছি। গাড়ির কাজ শেষ হলেই ওগুলোকে সামনের দিকে নিয়ে এসো।"

সব মালপত্র তিনটে গাড়িতে তুলে, বৃষ্টির মধ্যে গাছের নীচে রাস্তায় সেগুলোকে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে ভেতরে চলে গেলাম আমরা।

ওদের বললাম, "রান্নাঘরে গিয়ে আগুন জ্বেলে নিজেদের জামাকাপড়গুলো শুকিয়ে নাও।"

"জামাকাপড় শুকোনোর দরকার নেই, আমি এখন একটু ঘুমোতে পারলে বাঁচি।" পিয়ানি বলল।

বোনেলো বলল, "আমি মেজরের বিছানায় শোব।"

পিয়ানি বলল, "যেখানেই হোক একটু শুতে পেলেই বাঁচি।"

দরজাটা খুলে দিয়ে আমি বললাম, "এ-ঘরে দুটো বিছানা আছে, দু'জনেই শুয়ে পড়ো, আমি তোমাদের জাগিয়ে দেব।"

বোনেলো বলল, "আর তেনেন্তে, আপনি যদি বেশিক্ষণ ঘুমোন তাহলে অস্ট্রিয়ানরাই এসে জাগাবে আমাদের।"

"না না, আমি বেশি ঘুমোব না। আইমো কোথায় গেল?"

"রান্নাঘরে গেছে।" কাদামাখা বুট পরেই চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল পিয়ানি।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখি আগুন জ্বেলে উনুনের ওপর একটা কেটলি চড়িয়েছে আইমো। বলল, "একটু খাবার তৈরি করে রাখি, ঘুম ভাঙলে খিদে পাবে।"

"তোমার ঘুম পাচ্ছে না?"

"বেশি নয়। এটা ফুটে উঠলেই চলে যাব।"

"তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। ঠান্ডা মাংসই চিজ দিয়ে খেয়ে নেব আমরা।" আমি বললাম।

ও বলল, "না, এই ভাল। একটু গরম খাবার পেলে গুন্ডা দুটোর পক্ষে ভাল হবে। আপনি শুতে যান, তেনেন্তে।"

"মেজরের ঘরে একটা বিছানা আছে।"

"আপনি ওখানে শুয়ে পড়ুন।"

"না, আমি ওপরে গিয়ে নিজের ঘরেই শোব। তোমার কোনও পানীয় চাই?"

"সে যাবার সময় দেখা যাবে। এখন খেয়ে লাভ নেই।"

"তুমি যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে জাগো আর দেখো আমি তখনও ঘুমোচ্ছি, তাহলে ডেকে দিয়ো, বুঝলে?"

"আমার তো ঘড়ি নেই, তেনেন্তে!"

"মেজরের ঘরে একটা দেয়ালঘড়ি আছে।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের পুরনো ঘরে ঢুকলাম। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, গাছের নীচে সার দেওয়া গাড়ি তিনটে, গাছের ওপর বৃষ্টির ধারা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে, ঠান্ডা, বৃষ্টির জল ফোঁটা হয়ে দুলছে গাছের পাতায় পাতায়। জানলা থেকে সরে এসে রিনাল্‌দির বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম এসে দখল করুক আমাকে।

রওনা হওয়ার আগে সবাই রান্নাঘরে জড়ো হয়ে খাওয়া সেরে নিলাম। আইমো আমাদের জন্যে এক গামলা স্প্যাগেত্তি করেছে, তার ওপর টিনের মাংস আর পেঁয়াজকুচি ছড়ানো। টেবিল ঘিরে গোল হয়ে বসলাম সবাই, সঙ্গে দু' বোতল মদ—যাওয়ার সময় আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছিল ওরা। বাইরে অন্ধকার, সঙ্গে বৃষ্টি। পিয়ানি টেবিলে বসেও ঝিমোচ্ছে।

"আক্রমণের চেয়ে পিছু হঠাই ভাল", বোনেলো বলল, "পিছু হঠার সময় দিব্যি বারবেরা মদ খেতে পাওয়া যায়।"

"এখন পাচ্ছ, কাল হয়তো শুধু বৃষ্টির জলই জুটবে।" আইমো বলল।

"কাল তো আমরা উডিনে থাকব, তখন শ্যাম্পেন মিলবে। ওটা তো অলসদের আড্ডা। অ্যাই পিয়ানি, জাগো, কাল উডিনে গিয়ে শ্যাম্পেন খাব।"

"জেগেই তো আছি," জবাব দিল পিয়ানি। প্লেটে মাংস আর স্প্যাগেত্তি ঢেলে নিয়ে বলল, "একটু টম্যাটো সস্ জোগাড় হল না, বার্তো?"

"ছিল না ভাই," আইমো উত্তর দিল।

"তাহলে উডিনে গিয়ে শ্যাম্পেন খাব," বোনেলো বলল। গেলাসটা ভরে নিয়েছে গাঢ় লাল স্বচ্ছ বারবেরায়।

"পেট ভরেছে, তেনেন্তে?" আইমো জিজ্ঞেস করল।

"বিলকুল! বোতলটা দাও তো বার্তোলোমিও।"

"একটা পুরো বোতল গাড়িতে নেবার জন্যে সরিয়ে রেখেছি।" আইমো বলল।

"একটুও ঘুমোওনি?"

"আমার বেশি ঘুমের দরকার হয় না। একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়েছি।"

"কাল আমরা রাজার বিছানায় শোব।" বোনেলো বলল। তারপর সকলের দিকে একবার তাকাল, রসিকতাটা কেমন হয়েছে বোঝার জন্যে।

"অ্যাই, মুখ বন্ধ করো।" বললাম আমি, "এক ফোঁটা পেটে পড়লেই উল্টোপাল্টা বকা শুরু হয়ে যায়।"

উঠে পড়ে বললাম, "এবার রওনা হওয়া যাক।"

বোনেলো বলল, "আপনি কার গাড়িতে থাকবেন, তেনেন্তে?"

"আইমোর গাড়িতে। তারপর তুমি থাকবে, একেবারে শেষে পিয়ানি। আমরা সোজা করমোনের দিকে চলব।"

"আমার খালি ভয় করছে ঘুমিয়ে না পড়ি," পিয়ানি বলল।

"ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার সঙ্গেই থাকব। তারপর বোনেলো, শেষে আইমো।"

"সেই ভাল।" পিয়ানি বলল, "আমার যা' ঘুম!"

"আমি খানিক চালাব, তুমি সেই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো।"

"তার দরকার হবে না। যতক্ষণ জানি জাগাবার লোক আছে, ততক্ষণ ঠিক চালিয়ে যেতে পারব।"

"জাগিয়ে দেব। আইমো, আলোগুলো নিভিয়ে দাও।"

আইমো বলল, "ওসব ফেলে গেলেই বা কী হবে? এ-জায়গা আর আমাদের কাজে লাগবে না।"

পিয়ানিকে বললাম, "আমার ঘরে ছোট্ট একটা ট্রাঙ্ক আছে, নামাতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে একটু ধরবে, পিয়ানি?"

পিয়ানি বলল, "আমরাই নামিয়ে আনছি। চলো তো।" বোনেলোকে নিয়ে হলের ভেতরে চলে গেল পিয়ানি। শুনতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে ওরা।

আইমো বলল, "এ-জায়গাটা দারুণ ছিল।" দু'বোতল মদ আর আধখানা চিজ ব্যাগে পুরে নিয়ে আবার বলল, "এমন একটা জায়গা আর কখনও পাওয়া যাবে না। ওরা কতদূর পিছু হঠে যাবে, তেনেন্তে?"

"বলছে তো তাগলিয়ামেন্তো পেরিয়ে ওপারে। হাসপাতাল আর অ্যাম্বুল্যান্সঘাঁটি থাকবে পর্দেনোনে।"

"পর্দেনোনোর চেয়ে এ-জায়গাটা অনেক ভাল।"

"পর্দেনোনোর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, ওখানে যাইনি কখনও—শুধু যাওয়া-আসার পথে দু'-একবার পড়েছে।"

"ওটা আবার একটা জায়গা নাকি!" আইমো বলল।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জনহীন অন্ধকার শহরটার মধ্যে দিয়ে চলেছি। রাস্তা দিয়ে চলেছে শুধু অসংখ্য সেনাদলের সারি আর কামানের বহর। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়লাম। পিছু-হঠা বিশাল সেনাবাহিনী, আর তার সঙ্গে মোটর ট্রাক, ঘোড়ায় টানা গাড়ি আর কামান, সার বেঁধে ধীরে ধীরে চলেছে। আমরাও সেই স্রোতে যোগ দিলাম। অবিরাম বৃষ্টি, কাদায় পিচ্ছিল পথ। একটা গাড়ির সামনেটা গিয়ে ঠেকেছে অন্য গাড়ির পিছনে—এমনি ঠেসাঠেসি করে চলা। মাঝে মাঝে সামনের সারি দাঁড়িয়ে পড়ে, অমনি পিছনের দলও অচল হয়ে পড়ে। দু'-এক পা এগিয়ে আবার সেই বিশাল প্রবাহ থেমে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে চললাম। সামনে দাঁড়ানো অজস্র ট্রাক আর গাড়ির মধ্যে দিয়ে, ভিজে ঘোড়ার গলার ফাঁক দিয়ে, মাইল খানেক হেঁটেও সেই আটকে যাওয়ার উৎসটা খুঁজে পেলাম না—হয়তো সেটা একেবারে উডিনেই গিয়ে ঠেকেছে। আবার নিজেদের গাড়িগুলোর কাছে ফিরে এলাম। স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে পিয়ানি। ওর পাশে বসে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রাকগুলোতে গিয়ার দেবার শব্দে ঘুম ভাঙল। পিয়ানিকে জাগিয়ে আমরাও গাড়ি চালু করলাম। খানিকটা এগিয়ে একবার থামল, তারপর আবার অঝোর বৃষ্টি ভেদ করে এগিয়ে চলল পিছু-হঠা সেনাবাহিনী।

রাতের দিকে গাড়ির সারি আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সারা রাতে আর জট ছাড়ল না। গাড়ি থেকে নেমে আইমো আর বোনেলোকে দেখতে পেছন দিকে গেলাম। বোনেলোর গাড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দু'জন সার্জেন্ট বসে ছিল, আমাকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল তারা।

বোনেলো বলল, "ওদের একটা ব্রিজের ওপর কী-সব যেন করতে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু এখন ওরা আর নিজেদের দলকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই আমি ওদের তুলে নিয়েছি।"

"লেফটেন্যান্ট হুকুম দিলে অবশ্য।" একজন বলল।

আমি বললাম, "ঠিক অছে।"

বোনেলো বললে, "আমাদের লেফটেন্যান্ট আমেরিকান—উনি সবাইকেই গাড়িতে চড়তে দেবেন।"

একজন সার্জেন্ট হাসল, অন্যজন বোনেলোকে প্রশ্ন করল আমি দক্ষিণ বা উত্তর আমেরিকাবাসী ইতালিয়ান কি না।

"উনি ইতালিয়ান নন, উত্তর আমেরিকার ইংরেজ।"

সার্জেন্ট দুটি খুবই ভদ্র, কিন্তু কথাটা তারা ঠিক বিশ্বাস করল না। ওদের রেখে আইমোকে দেখার জন্য পিছনের দিকে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সে দুটো মেয়েকে নিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে বসে মহানন্দে ধূমপান করছে। অবাক হয়ে বললাম, "আইমো, এ কী ব্যাপার?"

বেপরোয়া হেসে সে বলল, "ওদের সঙ্গে কথা বলুন তেনেন্তে, আমি তো ওদের ভাষা বুঝতেই পারছি না।" তারপর খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে একটি মেয়ের উরুতে টিপুনি দিয়ে বলল, "এই, আমাদের তেনেন্তাকে তোমাদের নামধাম আর এখানে কী করতে এসেছ সব বলো।"

মেয়েটি আইমোর হাতটা ঠেলে দিয়ে গায়ের চাদরটা ভাল ভাবে জড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। অন্যজন চোখ নিচু করে রইল। রক্তচক্ষু মেয়েটি গ্রাম্য ভাষায় কী-সব বলল যার কিছুই আমার বোধগম্য হল না। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী ষোড়শী মেয়েটি। অন্য মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সোরেল্লা?"

মাথা নাড়ল সে, মুখে সামান্য হাসি।

"বেশ, বেশ।" ওর হাঁটুতে চাপড় দিলাম। আমার ছোঁয়া লাগতেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল মেয়েটি। বোনটি একবারও চোখ তুলে তাকায়নি—বয়সে ওর চেয়ে বছর খানেকের ছোট হবে সে।

আইমো যতই আশ্বাস দেয় ওরা তার একবর্ণও বুঝতে পারে না, ভরসা পায় না। নীরব চোখে অগ্নিবর্ষণ করে শুধু কোণের দিকে সরে যায়—যেন ঝড়ে উড়ে-আসা দুটো বন্য পাখি। দু'জনকে দু' টুকরো চিজ দিয়ে অবশেষে কিছুটা পোষ মানাল আইমো।

ওদের রেখে আমি আবার ফিরে এলাম পিয়ানির কাছে।

গাড়ির সারি এতটুকুও নড়ছে না। পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে ফৌজিদল। বৃষ্টির এতটুকুও বিরাম নেই। সামনের দিকে বোধহয় কোনও গাড়ির ব্যাটারি জলে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে, তার ফলেই পিছন সারিতে আটকে গেছে সব। কিংবা হয়তো কোনও গাড়ির ড্রাইভার বা ঘোড়া একটানা পথ চলার ধকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘোড়ার গাড়ি আর মোটর দু'রকম গাড়িই রয়েছে তো সারিতে। তবে শহরের মাঝখানে প্রত্যেকে সজাগ থাকা সত্ত্বেও তো যানবাহন আটকে যায়।

চমৎকার মেয়ে দুটো জুটেছে আইমোর সঙ্গে। এই পশ্চাদপসরণের সময় কুমারী মেয়েদের স্থান কোথায়? এরা কিন্তু সত্যিই কুমারী, সম্ভবত খুব নিষ্ঠাবতী। আজ এই যুদ্ধ না থাকলে এই প্রচণ্ড বর্ষায় আমরা সবাই এখন বিছানায় শুয়ে থাকতাম। বিছানায় শুয়ে মাথাটা আরামে এলিয়ে দিই আমি, শরীরটা লম্বাভাবে বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। ক্যাথারিন এখন নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে আছে, দু'খানা পাতলা চাদরে নিজেকে ঢেকে

নিয়েছে। কোন্ পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে ও? হয়তো ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে আমার কথাই ভাবছে। ওগো পশ্চিমা বাতাস, জোরে বও, আরও জোরে, বয়ে নিয়ে এসো আমার পাশে আমার প্রিয়তমাকে। পশ্চিমা বাতাস সঙ্গে নিয়ে এসেছে বর্ষার অঝোর ধারাকে। তা হোক, তার সঙ্গেই ঝরে পড়ছে আমার প্রিয়া। আমার ক্যাথারিনকে পেয়েছি আমার বাহুবন্ধনে, আমার বিছানায়। "শুভরাত্রি, ক্যাথারিন"—নিজের মনে বলে উঠি—"ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা। এপাশে কষ্ট হলে ওপাশ ফিরে শোও। খানিক পরেই সকাল হবে, তখন আর এত কষ্ট থাকবে না। তোমার খুব কষ্ট, না? একটু চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়ো, সোনা।" ক্যাথারিন বলল, "আমি তো ঘুমিয়েই আছি, তুমি শুধু ঘুমের মধ্যে কথা বলছ। ভাল আছ তো?" "সত্যি তুমি এখানে?"—"নিশ্চয়ই। আমি তো তোমার কাছেই আছি। কক্ষনো চলে যাব না, এর জন্যে আমাদের মধ্যে কোনও পরিবর্তনই আসতে পারে না।" "আমার মিষ্টি সোনা, আমার রানি! রাত্তিরে আর চলে যাবে না তো?"—"না না—সারাক্ষণই এখানে আছি আমি, ডাকলেই চলে আসি।"...

"আবার চলতে শুরু করেছে ওরা।" পিয়ানির গলাটা শুনতে পেলাম।

"একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।" আমি বললাম। পিছনের আসন থেকে এক বোতল বারবেরা বের করে আনলাম।

পিয়ানি বলল, "আপনি ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলেন।"

উত্তর দিলাম, "ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখছিলাম।"

বৃষ্টি একটু কমেছে, তার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গাড়ির সারি। সকাল হবার আগেই আবার সব দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়েছে একটা চড়াইয়ের ওপর। দিনের আলো ফুটতেই সেখান থেকে চোখে পড়ল সামনের দিকে সুদূরপ্রসারী পশ্চাদপসরণের পালা। যানবাহনের বিশাল সারি নিশ্চল হয়ে আছে, পাশ দিয়ে শুধু এগিয়ে চলেছে পদাতিক-বাহিনী। আবার শুরু হল আমাদের চলা। কিন্তু চলার গতি দেখে বুঝতে পারছি, বড় রাস্তা ছেড়ে পাশ কাটিয়ে কোনও রকমে গ্রামের রাস্তা ধরতে না-পারলে উডিনে পৌঁছনোর আশা নিতান্তই দুরাশা।

চারপাশের গ্রাম থেকে অনেক পরিবার এসে রাতে এই দলে যোগ দিয়েছে। তাদের ঠেলাগাড়িতে গৃহস্থালীর নানান জিনিসপত্র—মাদুর, আয়না, হাঁস, মুরগি। সামনের গাড়িটায় রয়েছে একটা সেলাইকল। কোনও কোনও ঠেলার মধ্যে মেয়েরা জড়ো হয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। কেউ কেউ গাড়ির পাশে পাশে হেঁটেই চলেছে। দলে কুকুরও আছে, গাড়ির নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। কাদাভরা পথ, পথের পাশের নালাগুলো জলে ভর্তি আর পাশের বিস্তীর্ণ মাঠ জলে-কাদায় দুরতিক্রম্য।

গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম—পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো উপযুক্ত একটা রাস্তা খুঁজছি। বড় রাস্তার ধারে ধারে অনেক ছোট পথ রয়েছে। কিন্তু ঠিক কোনটা

যে কাজে লাগবে বুঝছি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছি এখানে এভাবে পড়ে থাকলে অস্ট্রিয়ানরা যেখানেই থাকুক না কেন বৃষ্টি থামলেই এক ঝাঁক বিমান পাঠিয়ে আমাদের খতম করে দেবে। কয়েকটা লরি খারাপ হয়ে গেলে কিংবা গোটাকতক ঘোড়া মরে পড়ে থাকলেই গোটা সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি থমকে যাবে।

কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট রাস্তা দেখতে পেলাম। পথের দু'পাশে ঘন বীথি—দুটো খেতের মাঝখান দিয়ে পথটা উত্তর দিকে সোজা চলে গেছে। এই পথটাই বেছে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম আমার গাড়িগুলোর কাছে। পিয়ানিকে বললাম গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। তারপর গেলাম বোনেলো আর আইমোর কাছে।

"এ-রাস্তাটা ভুল হলে আবার ফিরে আসা যাবে।" আমি বললাম।

বোনেলো জানতে চাইল তার দুই সার্জেন্ট সাথীর কী ব্যবস্থা হবে। এই ভোরে তাদের দাড়ি-গোঁফ কামানো না থাকলেও চেহারায় একটা সামরিক ছাপ আছে। বললাম,

"সঙ্গে নিয়ে নাও, গাড়ি ঠেলতে কাজে লাগবে।"

আইমোর গাড়িতে মেয়ে দুটি ঘুমোচ্ছিল। আইমো বলল, "আমার এই কুমারী পরিবারটিকে নিয়ে কী করব?"

আমি বললাম, "ওরা কোনও কাজেই লাগবে না। এমন কাউকে নেওয়া উচিত ছিল যে গাড়ি ঠেলার কাজে লাগত।"

আইমো বলল, "কিন্তু ওরা তো গাড়ির পেছনেই পড়ে থাকবে। জায়গা তো যথেষ্ট আছে।"

"বেশ, তোমার যখন ছাড়ার ইচ্ছে নেই, তখন থাক। কিন্তু গাড়ি ঠেলতে পারবে, এমন কাউকে যোগাড় করে নিয়ো।"

"কেমন লাগছে, তেনেন্তে?"

"চমৎকার। তোমার?"

"ভালই, তবে খুব খিদে পেয়েছে।"

"ওই রাস্তায় কোথাও কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে, দাঁড়িয়ে খেয়ে নেব'খন।"

"পায়ের অবস্থা কেমন, তেনেন্তে?"

"চমৎকার।"

ওখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি, পিয়ানির গাড়িটা পাশের সরু রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তার পিছনে বোনেলোর গাড়ি। ওদের অ্যাম্বুল্যান্স দুটোর পিছু পিছু আমরাও সরু রাস্তাটা ধরে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা খামারবাড়ির সামনে। পিয়ানি আর বোনেলোর গাড়ি দুটোকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমরাও গাড়ি থামালাম। লম্বা নিচু চালের বাড়ি, দরজার ওপর আঙুরলতার ঝোপ। বাড়ির উঠোনের কুয়ো থেকে জল তুলছে পিয়ানি—ওর গাড়িতে

ঢালবে। উঁচু জমির ওপর বাড়িটাতে কোনও মানুষজন নেই। সেখান থেকে দূরে পিছু-হঠে-যাওয়া আমাদের সৈন্যদের চোখে পড়ছে। মেয়ে দুটি এতক্ষণে জেগে উঠেছে। সার্জেন্ট দুটির মধ্যে একজন বাড়ির ভেতর থেকে একটা ঘড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল। তাকে কড়া বকুনি দিয়ে সেটা ফেরত পাঠালাম। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির ভেতর থেকে কিছু মদ, চিজ আর আপেল পাওয়া গেল। তাই দিয়ে মন্দ হল না জলযোগটা। মেয়ে দুটি নামল না। খালি বাড়িতে ঢোকার সাহস তাদের নেই। তারা গাড়িতে বসেই খেল। সার্জেন্ট দু'জনের যাওয়ার তাড়া বেশি।

টকটকে লাল মদ, চমৎকার খেতে। বাকি চিজটুকু সঙ্গে নিয়ে নিলাম। আমাদের পানীয়ের জলপাত্রগুলোও ভরে নিলাম।

বাড়িটার পিছন দিয়ে আবার সেই কাদাভরা পিছল সরু পথ ধরে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে চলা শুরু হল।

দুপুরের দিকে কাদায় আটকে গেল আইমোর গাড়িটা। অসংখ্য গলি-ঘুঁজি, এ-পথ সে-পথ ঘুরে যখন উডিনের দশ কিলোমিটারের কাছাকাছি এসে পড়েছি, তখনই এই ঝঞ্ঝাট। বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে। দূর থেকে বিমানের আনাগোনা দেখেছি আর শব্দ শুনেছি। দূরে বড় রাস্তার ওপর আওয়াজ পেয়েছি বোমাবর্ষণের। একটা বদ্ধ গলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পিছু হঠতে গিয়ে আইমোর গাড়িটা কাদায় পড়ে এবং উঠে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে কাদার মধ্যে আরও গেঁথে যায়।

কেমন করে গাড়িটাকে কাদা থেকে বার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় সার্জেন্ট দু'জন নেমে এসে গাড়ির নীচটা ভাল করে পরীক্ষা করে চুপচাপ হাঁটতে শুরু করে দিল। পিছনে পিছনে গিয়ে ওদের নির্দেশ দিলাম, ফিরে গিয়ে গাড়িটা তুলতে সাহায্য করতে। ওরা রাজি হল না—ফিরে যাওয়ার জন্যে খুবই ব্যস্ত ওরা। আমার নির্দেশ অমান্য করে বলল,

"খানিক পরেই সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের ফিরে যেতেই হবে। তা ছাড়া আপনি আমাদের নির্দেশ দেওয়ার কে ? আপনি তো আর আমাদের অফিসার নন।"

আমি আবার বললাম, "আমি নির্দেশ দিচ্ছি, ফিরে এসো।"

ওরা শুনল না, রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল। আবার ডাকলাম—ওরা আরও জোরে হাঁটতে লাগল। কোমর থেকে পিস্তল বার করে ওদের দিকে চালালাম। গুলি গায়ে লাগল না, কিন্তু ওরা ছুটতে শুরু করল। পরপর তিনবার গুলি চালিয়ে একজনকে ফেলে দিলাম, অন্যজন ছুটে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

বোনেলো আমার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে অর্ধমৃত সার্জেন্টটিকে শেষ করে দিল, তারপর পা ধরে টেনে ঝোপের আড়ালে ফেলে দিল তাকে।

আরও কিছুক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা করেও আইমোর গাড়িটাকে যখন নড়াতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়ে সেটাকে সেখানেই ফেলে রেখে, তার ভেতর থেকে খাবার, মদ আর সঙ্গে মেয়ে দুটিকে নিয়ে অন্য গাড়ি দুটোতে উঠে পড়লাম সবাই।

গ্রামের ভেতর দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে একটা মাঠের সামনে পৌঁছলাম আমরা। মাঠটা পার হতে হবে—ওপারে আবার রাস্তা আছে। তবে তার আগে আমি নেমে দেখতে গেলাম ও-রাস্তায় গাড়ি চলবে কিনা। কিন্তু চলার উপায় সত্যিই আর নেই। নরম এঁটেল কাদা, গাড়ি চলা অসম্ভব। একটু পরেই গাড়ি দুটো কাদায় পুরোপুরি আটকে গেল। অগত্যা পায়ে হেঁটেই উডিনের পথ ধরলাম আমরা।

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে মেয়ে দুটিকে রাস্তা দেখিয়ে বললাম, "ওই রাস্তা দিয়ে চলে যাও—লোকজন, আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেয়ে যাবে।"

দু'জনের হাতে দশ লিরের দুটো নোট দিলাম। ওরা আমার কথা কিছুই বুঝল না, কিন্তু নোটটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করল। যেতে যেতে বারবার ফিরে তাকাল—চোখে একটা ভয়ের ভাব, যদি নোটদুটো কেড়ে নিই। ড্রাইভার তিনজন হাসাহাসি করতে লাগল।

বোনেলো বলল, "তেনেন্তে, আমিও যদি ওদিকে চলে যেতে চাই, আপনি আমায় কত দেবেন?"

"একা একা আমাদের সঙ্গে ধরা পড়ার চেয়ে অনেক লোকের মধ্যে ধরা পড়লে ওদের বিপদ কম হবে।"

"আমাকে দু'শো লিরে দিন, আমি সিধে হেঁটে অস্ট্রিয়ায় চলে যাব।"

"টাকাটা ওরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।" পিয়ানি বলল।

"তার আগেই যুদ্ধ থেমে যাবে।" উত্তর দিল বোনেলো।

"কয়েকটা সাইকেল থাকলে এখন কাজে লাগত।" আমি বললাম।

"আমেরিকায় লোকে সাইকেল চড়ে, তেনেন্তে?"

"অবশ্যই।"

"সত্যি, সাইকেল পেলে বেঁচে যেতাম," বোনেলো বলল, "আমি একেবারে হাঁটতে পারি না।"

আমি বললাম, "বন্দুকের শব্দ হল না?"

ওরা কান পেতে শুনল।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, বন্দুকেরই শব্দ। দূরে ছোঁড়া হচ্ছে।"

এইরকম নানান আলোচনা করতে করতে হাঁটছি আমরা। সার্জেন্টটিকে মেরে বোনেলোর জীবনের একটা নাকি সাধ পূর্ণ হয়েছে।

আইমো বলল, "গির্জায় স্বীকারোক্তিতে কী বলবে?"

উত্তর দিল, "বলব—হে পিতা, আমাকে আশীর্বাদ করুন, কেননা আমি একটি সার্জেন্টকে খতম করিয়াছি।" ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলাম।

পিয়ানি বলল, "ও একজন বিপ্লবী, গির্জায় যায় না কখনও।"

বোনেলো বলল, "পিয়ানি-ও তাই।"

"সত্যি নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না তেনেন্তে, আমরা সমাজতন্ত্রী। আমরা ইমোলার লোক।"

"তোমরা সকলেই?"

"সকলেই।"

"তোমরা সমাজতন্ত্রী হলে কী ক'রে?"

"আমরা সবাই, প্রত্যেকেই সমাজতন্ত্রী—বরাবরই।"

"আপনাকেও আমরা সমাজতন্ত্রী করে নেব, তেনেন্তে।"

বাঁদিকে মোড় ঘুরতেই একটা ছোট্ট পাহাড়—তার পাশে পাথরের দেয়ালের পেছনে একটা আপেলের বাগান। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে সবাই চুপ করে গেছি—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে আমাদের পথচলা।

চলতে চলতে পথের শেষে একটা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। সারা রাস্তায় অগুনতি পরিত্যক্ত লরি আর গাড়ির সারি একেবারে নদীর ওপরে সেতুর মুখ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই। সেতুর মাঝখানটা বোমায় উড়ে গেছে, পাথরের খিলান ভেঙে পড়েছে নদীর ওপর। তীরবেগে বয়ে চলেছে নদীর স্রোত।

নদী পেরোবার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম। জানতাম একটা রেলের সেতু আছে। কোনও সৈন্য চোখে পড়ল না, শুধু লরি আর মালপত্র পড়ে আছে। অবশেষে সেতুটার দেখা পেলাম।

"কী চমৎকার সেতু!" আইমো বলল।

আমি বললাম, "চটপট পার হয়ে নাও। এটাও উড়িয়ে দিলে খুব মুশকিল হবে।"

"কে ওড়াবে? এখানে কেউ নেই।" পিয়ানি বলল।

বোনেলো বলল, "মাইন পোঁতা থাকতে পারে। আপনি আগে যান, তেনেন্তে।"

আইমো বলল, "সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীর কথা শুনেছেন? ওকেই আগে পাঠান।"

আমি বললাম, "আমিই যাব। একটা লোক নিয়ে সেতু ওড়ানোর জন্যে কেউ মাইন পোঁতে না!"

"দেখলে?" পিয়ানি বলল, "একেই বলে মাথা! বলি ওহে সন্ত্রাসবাদী, তোমাদের মগজে ঘিলু নেই কেন বলো তো?"

"থাকলে কি আর এখানে আসতাম?" বোনেলো বলল।

আবার মেঘ করে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে।

একজন-একজন করে সেতু পার হলাম। প্রথমে আমি। চারপাশ ভাল করে দেখতে দেখতে পার হলাম সেতুটা। নীচে তীরবেগে ছুটে চলেছে নদীর ঘোলা জল। দূরে গ্রামের ওপারে চোখে পড়ছে বৃষ্টিতে ঝাপ্‌সা উডিন।

নদীর ওধারে আর একটা সেতু আছে। পার হয়ে সেদিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি তার ওপর দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল হলুদ রঙের কাদামাখা একটা মোটর। ভাল দেখা গেল না, তবে আরোহীদের মাথার টুপি দেখতে পেলাম—জার্মান শিরস্ত্রাণ। পরিত্যক্ত গাড়ির সারির পাশ দিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। হাত নেড়ে আইমোকে ডাকলাম—সে তখন সেতুর মাঝপথে। অন্যদেরও ডেকে নিলাম।

ঢালু পাড় বেয়ে নেমে গেলাম নীচের দিকে। আইমো সঙ্গে এল। ওকে বললাম,

"গাড়িটা দেখতে পেলে?"

"না, আমরা আপনাকে দেখছিলাম।"

"ওধারের সেতু দিয়ে একটা জার্মান অফিসারের গাড়ি চলে গেল।"

"অফিসারের গাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"হায় ঈশ্বর!"

ততক্ষণে অন্যরাও এসে পড়েছে। উঁচু পাড়ের পিছনে কাদায় বসে, মাথা নিচু করে সেতুর দিকে তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে আছি গাছের ফাঁকে ফাঁকে, নালার ধারে ধারে—

"আমরা কি তাহলে আমাদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম, তেনেন্তে?"

"তা জানি না। শুধু জানি এই রাস্তা দিয়ে একটা জার্মান অফিসারের গাড়ি গেল।"

"কেমন যেন মজা হচ্ছে না, তেনেন্তে? মাথার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে না?"

"কী পাগলামি করছ, বোনেলো!"

"আচ্ছা, একটু মদ খেলে কেমন হয়?" পিয়ানি বলল, "সকলের সঙ্গে যোগাযোগ যখন হারিয়েই গেল, তখন একটু মদই না-হয় খাওয়া যাক।" নিজের সুরাপাত্রের মুখটা খুলে ফেলল ও।

হঠাৎ সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে আইমো বলল,

"ওই যে, ওই দেখুন।"

পাথুরে-সেতুর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সারি সারি জার্মান শিরস্ত্রাণ। সামনের দিকে ঝুঁকে শ্লথভাবে এগিয়ে চলেছে টুপিগুলো। কেমন যেন অমানুষিক পরিবেশ। সেতু পেরিয়ে নদীর পাড়ের ওপর আসতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওদের। সাইকেল-বাহিনী। প্রথম দু'জনের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলাম—উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান মুখ। কপালের ওপর দিয়ে মুখের অনেকখানি ঢেকে নেমে এসেছে মাথার টুপি। সাইকেলের গায়ে বন্দুক আটকানো, কোমরের বেল্টে ঝুলছে স্ট্রিক বোমা। টুপি আর ছাইরঙা উর্দি, বৃষ্টিতে ভেজা। চারপাশে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে ওরা। প্রথমে দু'জনে, তারপর চারজন, তারপর আরও দু'জন, তারপর প্রায় বারোজন, আবার একসঙ্গে বারোজন, সবশেষে একা একজন। ওদের কারও মুখে কথা নেই। বললেও অবশ্য নদীর তরঙ্গধ্বনি পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছত না। গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল সাইকেল-বাহিনী।

"হায় ভগবান!" আর্তনাদ করে উঠল আইমো।

পিয়ানি বলল, "ওরা জার্মান, অস্ট্রিয়ান নয় তো?"

"কেউ ওদের বাধা দিচ্ছে না কেন?" আমি বললাম, "সেতুটা উড়িয়ে দেয়নি কেন? পাড়ের ধার দিয়ে মেশিনগান বসায়নি কেন?"

"আপনিই বলুন, তেনেন্তে," বোনেলো বলল।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে আমার।

"যত সব উদ্ভট কারবার। ওধারে একটা ছোট্ট সেতু উড়িয়েছে, এদিকে বড় রাস্তার ওপরে এত বড় সেতুটা আস্ত রেখে গেছে। গেল কোথায় সব? এদের রুখতে চেষ্টা করছে না কেন?"

"আপনিই বলুন, তেনেন্তে।" বোনেলো আবার বলল।

আমি চুপ করে গেলাম। এ-ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা আমার কাজ নয়। তিনখানা অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে পোর্দিনোনে যাবার কথা আমার। নিজের কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি। এখন আমার একমাত্র কাজ পোর্দিনোনে পৌঁছনো, কিন্তু বোধ হয় উডিনেই পৌঁছতে পারব না। এখন ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যেন গুলি খেয়ে না মরি কিংবা ধরা না পড়ি।

পিয়ানিকে বললাম, "মদের পাত্রটা খুলেছিলে না?"

পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে নিলাম।

"এবার বোধহয় আমরা আবার রওনা হতে পারি।" আমি বললাম, "তাড়া নেই তেমন। কিছু খেয়ে নেবে নাকি?"

"এখানে দেরি করা ঠিক হবে না," বোনেলো বলল।

"তাহলে চলো।"

"পাড়ের নীচে দিয়ে হাঁটব? তাহলে ওপাশ দিয়ে পাড়ের আড়াল থাকবে।"

"ওপর দিয়েই হাঁটা ভাল। ওরা সেতুর ওপর দিয়েও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আগেই আমরা দেখতে পাব, নইলে হঠাৎ কেউ আক্রমণ করলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

রেললাইন ধরে চলা শুরু হল। দু'পাশে বৃষ্টিতে ভেজা বিস্তীর্ণ সমভূমি, আর সেই সমভূমির ওপারে উডিনের পাহাড়। পাহাড়ের ওপরের দুর্গের ছাদগুলো পড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে ঘড়িঘর আর কাম্পানাইল। কিছুটা দূরে রেললাইনের খানিকটা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

"নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন!" চিৎকার করে উঠল আইমো।

লাফ দিয়ে ঢালু পাহাড়ের নীচে নেমে পড়লাম আমরা। আর একদল সাইকেল-বাহিনী পার হয়ে গেল। উঁকি মেরে তাদের দেখতে পেলাম।

"ওরা আমাদের দেখেছে, কিন্তু কিছু না করে চলে গেল কেন?" আইমো বলল।

"ওখান দিয়ে গেলে নির্ঘাত মরতে হবে, তেনেন্তে।" বোনেলো বলল।

"ওরা আমাদের নিয়ে ভাবছে না, আরও বড় কিছু লক্ষ্য আছে ওদের। ওরা অজান্তে হঠাৎ আক্রমণ করলেই আরও বিপদ হবে আমাদের।"

"আমি বরং এই পাড়ের আড়াল দিয়েই চলি।"

"ঠিক আছে, তাই চলো, রেলপথ দিয়েই যাওয়া যাক।"

"আমরা পেরিয়ে যেতে পারব বলে মনে হয়, তেনেন্তে?" আইমো জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়ই পারব। এখনও বেশি শত্রু আসেনি। আমরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যাব।"

"অফিসারের গাড়িটা কী করছিল এখানে?"

"ভগবান জানেন।"

আবার রেলপথ ধরে চলতে লাগলাম। বোনেলো পাড়ের নীচে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে আবার আমাদের সঙ্গেই চলছে। উতরাই ছেড়ে রেলপথটা দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে। সামনেই একটা খালের ওপরে ছোট সেতু। বোমায় উড়ে গেছে, তবুও তার কাঠামোর যতটুকু টিকে আছে তার ওপর দিয়ে পেরিয়ে এলাম আমরা। সামনে থেকে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ।

খাল পেরিয়ে আবার রেলপথ, নিচু মাঠের ওপর দিয়ে সোজা শহরের দিকে চলে গেছে। উত্তর দিকে বড় রাস্তা, যে-পথে সাইকেল-বাহিনীকে যেতে দেখেছিলাম।

দক্ষিণে চলে গেছে ছোট একটা শাখা পথ, ঘন গাছপালায় ঢাকা। সেই পথ ধরেই শহরের পাশ দিয়ে আবার গ্রামাঞ্চল পেরিয়ে তাগ্লিয়ামেন্তোর দিকে যাওয়া যাবে, আর সেক্ষেত্রে পিছু-হঠা প্রধান বাহিনীকেও পাশ কাটানো যাবে।

ওদের ডেকে বললাম, দক্ষিণের শাখাপথটা ধরতে হবে। বাঁধের নীচে নেমে সবাই হাঁটতে শুরু করলাম কাদার মধ্যে দিয়ে। পাশের সেই সরু পথ থেকে আমাদের দিকে একটা বন্দুক ছুটল, গুলিটা এসে ঢুকে গেল পাড়ের কাদার মধ্যে।—"সবাই পিছিয়ে যাও!" চিৎকার করে উঠলাম আমি। পিচ্ছিল মাটি বেয়ে বাঁধের ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সামনে আমার ড্রাইভারেরা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাঁধের ওপর উঠে পড়লাম। ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে আবার দুটো গুলি ছিটকে এল। রেললাইন পার হচ্ছিল আইমো, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটির ওপর। টেনে নামিয়ে চিত করে শোয়ালাম তাকে।

"মাথাটা উঁচু করা দরকার," বললাম আমি।

পিয়ানি ওকে ঘুরিয়ে দিল। বাঁধের পাশে কাদার ওপর পড়ে আছে আইমো—পা দুটো ঝুলে পড়েছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝলক ঝলক রক্ত উঠছে। বৃষ্টির মধ্যে আমরা তিনজন বসে আছি ওকে ঘিরে। চোটটা লেগেছে ঘাড়ের নীচে পেছন দিকে, সেখান থেকে ডান চোখের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। ক্ষতস্থান দুটো বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতেই মারা গেল ও। পিয়ানি এক টুকরো ব্যান্ডেজের কাপড় দিয়ে ওর মুখটা মুছিয়ে আস্তে আস্তে ওর মাথাটা নামিয়ে রাখল। তারপর সরে এল।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বেজন্মার দল!"

আমি বললাম, "ওরা কিন্তু জার্মান নয়। ওখানে কোনও জার্মান থাকা সম্ভব নয়।"

"'ইতালিয়ান," বলল পিয়ানি। 'ইতালিয়ান' শব্দটার ওপর একটু বেশি জোর দিয়ে বলল।

বোনেলো কোনও কথাও বলছে না, চুপচাপ বসে আছে আইমোর পাশে, কিন্তু ওর দিকে তাকাচ্ছে না। আইমোর টুপিটা বাঁধের নীচে গড়িয়ে পড়েছিল, পিয়ানি সেটা কুড়িয়ে এনে ওর মুখটা ঢাকা দিয়ে দিল। নিজের মদের পাত্রটা নিয়ে বোনেলোর হাতে দিয়ে বলল, "একটু খাবে নাকি?"

বোনেলো বলল, "না।" তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "আমরা যখন রেলপথ ধরে হাঁটছিলাম, তখনও আমাদের এই দশা হতে পারত?"

আমি বললাম, "না, মাঠ পার হতে গেছলাম বলেই এটা ঘটল।"

বোনেলো মাথা নাড়ল, "আইমো গেল, এবার কার পালা, তেনেন্তে? এখন আমরা কোথায় যাব?"

"যারা গুলি চালিয়েছে তারা ইতালিয়ান—জার্মান নয়।"

বোনেলো বলল, "জার্মান হলে আমাদের সবাইকেই মেরে ফেলত।"

আমি বললাম, "জার্মানদের চেয়ে এখন ইতালিয়ানদের থেকেই আমাদের বিপদের ভয় বেশি। পেছনে পাহারাদার সৈন্যরা এখন সব কিছুতেই আতঙ্কের ছায়া দেখছে। কিন্তু জার্মানদের লক্ষ্যবস্তু ঠিক আছে।"

"ভেবেচিন্তে যা-হোক কিছু সিদ্ধান্ত নিন আপনি।" বোনেলো বলল।

"এবার কোথায় যাব?" জিজ্ঞেস করল পিয়ানি।

"অন্ধকার না-হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ কোথাও শুয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়। দক্ষিণ দিকে পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা থাকবে না।"

বোনেলো বলল, "আমি আর ও-রাস্তায় যাব না। এবার গেলে ওরা নিজেদের প্রথমবারের কাজটা জোরদার করার জন্যে আমাদের সবাইকেই গুলি করবে।"

"উডিনের কাছাকাছি কোনও-একটা জায়গায় আমরা শুয়ে থাকব, তারপর অন্ধকার হলেই চলতে শুরু করে ঠিকঠাক পৌঁছে যাব।"

বোনেলো বলল, "বেশ, তাহলে তাই করা যাক।"

বাঁধের উত্তর দিক দিয়ে নেমে গেলাম আমরা। যেতে যেতে মাঝে মাঝে ফিরে তাকালাম—নীচেই বাঁধের কাদার ওপর শুয়ে আছে আইমো। ছোট্ট দেখাচ্ছে ওকে, হাত দুটো অসহায়ভাবে দু'পাশে ছড়ানো, পট্টি আর কাদামাখা বুটসমেত পা দুটো দেখা যাচ্ছে, আর মুখে চাপা দেওয়া মাথার টুপিটা। নিষ্প্রাণ পড়ে আছে আইমো। ওদিকে বৃষ্টি পড়ছে একটানা। আইমোকে আমার খুব ভাল লাগত। ওর কাগজপত্র পকেট থেকে বার করে নিয়েছি—বাড়িতে খবর দিতে হবে।

মাঠের শেষে ওপারে একটা খামারবাড়ি, তার চারপাশে বড় বড় গাছ। খুব সতর্কভাবে চারদিকে নজর রেখে বাড়িটার দিকে এগোলাম। ভয় হচ্ছিল হঠাৎ হয়তো ভেতর থেকে একটা গুলি ছিটকে আসবে। আমিই প্রথমে ভেতরে ঢুকলাম, আমার পিছনে বোনেলো আর পিয়ানি। চারদিক আঁতিপাঁতি করে খুঁজে কোথাও এতটুকুও খাবার পাওয়া গেল না।

ঠিক করলাম গোলাঘরের ওপরে গিয়ে শোব আমরা, কারণ সেখান থেকে বাইরেটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। কেউ আক্রমণ করলে আগেভাগে সতর্ক হয়ে পালানোর ব্যবস্থা করতে সুবিধে হবে।

আমি বললাম, "গোলাঘরে শোওয়াই ভাল। তুমি কি খাবার কিছু জোগাড় করতে পারলে, পিয়ানি?"

পিয়ানি বলল, "দেখি খুঁজে-পেতে।"

বোনেলো বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাই চলো।"

আমি বললাম, "বেশ, আমি তাহলে তবে ওপরে গিয়ে নজর রাখি।"

আস্তাবলের মাঝখান দিয়ে গোলাঘরে ওঠার সিঁড়ি। এত বৃষ্টির মধ্যেও বেশ শুকনো. পরিবেশ। আস্তাবলে কোনও গরু-ঘোড়া নেই। হয়তো বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ওদের তাড়িয়ে বার করে দিয়ে গেছে বাড়ির লোকেরা।

গোলাটা বিশাল। প্রয়োজন হলে অনায়াসে এর খড়ের গাদায় লুকিয়ে থাকা যাবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি—কত কথা মনে আসছে।

ওরা আমাদের এভাবে গুলি না করলে অনায়াসেই দক্ষিণের দিকে বেরিয়ে যেতে পারতাম আমরা। ওখানে জার্মানদের থাকা অসম্ভব, কারণ ওরা উত্তর দিক দিয়ে সিভিদের থেকে আসছে, সেক্ষেত্রে দক্ষিণ দিকেও ওরা থাকবে কী করে? এরা নিশ্চয়ই ইতালিয়ান। এ-অবস্থায় ইতালিয়ান সৈন্য হলেই বিপদের ভয় বেশি। ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা, যাকে পাচ্ছে তাকেই গুলি করছে। গত রাতে পিছু-হঠার সময় কানাঘুষো শুনেছিলাম যে উত্তর দিকের পিছু-হঠা বাহিনীর মধ্যে ইতালিয়ান উর্দিধারী প্রচুর জার্মান সৈন্য রয়েছে। তবে আমি সেটা বিশ্বাস করি না। যুদ্ধের সময় এরকম অনেক গুজব শোনা যায়। হয়তো এমন ঘটনা কোথাও ঘটেছে, কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। তা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের পশ্চাদসরণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর কোনও প্রয়োজনই নেই জার্মানদের। আমাদের নিজেদের বাহিনীর বিশালতা আর পথের স্বল্পতাই বিশৃঙ্খলা ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই গুলি করার নির্দেশ কেউ দেয়নি, জার্মানরা তো নয়ই। তবু ওরা আমাদের জার্মান মনে করে গুলি করবে। আইমোকে গুলি করে মেরেছে ওরা। এখন আর ফেরার পথ নেই। সামনে যদি না এগোই, কী হবে তাহলে? মিলানে আর ফিরে যেতে পারব না! আর যদি মিলানে ফিরে যাওয়া যেত...! উডিনের উত্তর দিক থেকে ভেসে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ, মেসিনগানের গর্জন, কিন্তু কামানের গোলার কোনও শব্দ নেই। এর মানে কী? হয়তো পথের মাঝে কোনও বাহিনীকে আটক করেছে ওরা।

আবছা আলোয় নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ানি। ওর হাতে একটা লম্বা সসেজ, একটা বয়াম আর বগলে দুটো মদের বোতল। বললাম, "উঠে এসো, সিঁড়িটা ওপাশে।" তারপর মনে হল একা অতগুলো জিনিস হাতে নিয়ে আসবে কেমন করে! নেমে গিয়ে ওকে সাহায্য করলাম। খড়ের গাদায় শুয়ে মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা লাগছে—প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পিয়ানিকে জিজ্ঞেস করলাম,

"বোনেলো কোথায়?"

"বলছি।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে জিনিসগুলো খড়ের গাদার ওপর সাজিয়ে রাখা হল। পিয়ানি পকেট থেকে ছুরি বার করে একটা বোতলের ছিপি খুলল।

"গালা দিয়ে এঁটে রেখেছে মুখটা। জিনিসটা ভালই হবে।" আমার দিকে চেয়ে হাসল পিয়ানি।

"বোনেলো কোথায়?" আবার জিজ্ঞেস করলাম।

মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল পিয়ানি, তারপর ধীরে ধীরে বলল,

"চলে গেছে তেনেন্তে—ও ধরা দেবে।"

কোনও উত্তর দিলাম না আমি। ও আবার বলল,

"ওর ভয় হয়েছিল আমরা সবাই বোধহয় মারা পড়ব।"

কোনও উত্তর না দিয়ে মদের বোতলটা তুলে নিলাম। পিয়ানি বলে চলল,

"দেখছেন তো, যুদ্ধে আমাদের কোনও বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই।"

"তুমিও চলে গেলে না কেন?"

"আপনাকে ছেড়ে আমি যেতে চাই না।"

"বোনেলো কোথায় গেল?"

"জানি না তেনেন্তে। বেরিয়ে গেল।"

"বেশ করেছে। সসেজটা কাটবে তুমি?"

আলো-আঁধারের মাঝে পিয়ানি আমার মুখের দিকে তাকাল একবার, তারপর বলল,

"কথা বলতে বলতেই কাটা হয়ে গেছে।"

খড়ের গাদায় বসে দু'জনে সসেজ আর মদ খেলাম। আলাদা আলাদা বোতল থেকে খাচ্ছিলাম। আমার বোতলটা নিয়ে ওধারে জানলার কাছে খড়ের ওপর শুয়ে পড়লাম। পিয়ানিকে বললাম,

"তুমি এই জানলাটা দিয়ে নজর রাখো, আমি ওদিকটা দেখছি।"

জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বর্ষণসিক্ত গ্রামটার দিকে—কী যে দেখবার আশা করছি কে জানে। এখন শুধু দেখছি পাতাহীন মালবেরি গাছ, জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর বৃষ্টির অবিরাম ধারা।

দ্রুত অন্ধকার নেমে এল গ্রামের বুকে। ঘন অন্ধকার ভেদ করে নজর চলে না এতটুকু, কাজেই আর লক্ষ্য রাখার কিছু নেই। পিয়ানি জানলা ছেড়ে শরীর এলিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম ওর পাশে। কিছুক্ষণ পরে ওকে ডেকে তুলে আবার রওনা হলাম আমরা।

সে রাতের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। মনে মনে ঠিক কী আশঙ্কা করছিলাম জানি না—হয়তো মৃত্যু, হয়তো বন্দুকের গুলি কিংবা প্রাণ হাতে পালিয়ে বেড়ানোর। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। বড় রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা জার্মান বাহিনীর নজর এড়াতে পথের পাশে ট্রেঞ্চে শুয়ে পড়তে হল। শহরের উত্তর দিক পেরিয়ে

চলে গেলাম। রাস্তায় কোনও ইতালিয়ানের দেখা পাইনি। খানিকটা পরেই পিছু-হঠা প্রধান বাহিনীর কাছে এসে পড়লাম, তারপর সেই দলের সঙ্গেই সারা রাত তাগ্লিয়ামেন্তোর দিকে হেঁটে চললাম। এর আগে এই পশ্চাদসরণের বিশালতা ঠিক অনুভব করতে পারিনি। শুধু সৈন্যবাহিনীই নয়, সারা দেশটাই পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। সারা রাত হেঁটে চললাম, তাতে গাড়ির চেয়ে তাড়াতাড়িই যাওয়া গেল।

আমার পায়ে ভীষণ ব্যথা, তবু সময় নষ্ট করিনি এতটুকুও। মনে হচ্ছে বোনেলোর ওভাবে ধরা দিতে ছুটে যাওয়াটা নেহাতই বোকামি হয়েছে। আমরা কোনও বিপদের মুখে পড়িনি। দুটো সৈন্যবাহিনীর পাশ কাটিয়েছি, কিন্তু কোনও দুর্ঘটনাও ঘটেনি। শুধু আইমো যদি মারা না পড়ত, তাহলে আমাদের এই অভিযানে কোনও দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত থাকত বলে মনে হয় না। রেলপথের ওপর দিয়ে সকলের সামনে দিয়ে যখন হেঁটেছি, কেউই তখন আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হঠাৎ কোথা থেকে এই যুক্তিহীন মৃত্যু ছুটে এসে আইমোকে কেড়ে নিল। বোনেলো এখন কোথায় কে জানে! সৈন্য আর যানবাহনে ভরা রাস্তার একপাশ দিয়ে চলেছি দু'জনে। পিয়ানি বলল, "কেমন লাগছে, তেনেন্তে?"

"দারুণ।"

"আমি হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"কিন্তু হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় তো নেই, কাজেই ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।"

"বোনেলোটা একটা মাথামোটা।"

"সত্যিই তাই।"

"ওর ব্যাপারে আপনি কী করবেন, তেনেন্তে?"

"ঠিক জানি না।"

"শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে বলে দিতে পারেন না?"

"জানি না।"

"তা না হলে যুদ্ধ এভাবে চলতে থাকলে ওর পরিবারকে ওর জন্যে বিপদে পড়তে হবে।"

"যুদ্ধ আর চলবে না," আমাদের কথার মধ্যে একজন ফৌজি জওয়ান বলে উঠল, "আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে সায় দিল,

"আমরা প্রত্যেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

"সবাই বাড়ি যাচ্ছি।"

পিয়ানি বললে, "চলে আসুন তেনেন্তে।" কোনওমতে এই লোকগুলোর পাশ কাটাতে চায় সে।

"তেনেন্তে, কে তেনেন্তে? জাহান্নামে যাক এই অফিসারগুলো।"

পিয়ানি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বলল,

"আমি বরং আপনাকে নাম ধরেই ডাকি, নইলে ওরা হয়তো ঝামেলা করতে পারে। ইতিমধ্যে দু'জন অফিসারকে ওরা গুলি করে মেরেছে।"

তাড়াতাড়ি হেঁটে ওদের পেরিয়ে গেলাম আমরা । আগের কথার জের টেনে আবার শুরু করলাম,

"আমি এমন কোনও খবর দেব না, যার জন্যে ওর পরিবারকে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

"যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে অবশ্য আর কোনও অসুবিধে হবে না। তবে আমার বিশ্বাস হয় না যুদ্ধ থেমে গেছে—এত ভাল বরাত হতে পারে না আমাদের।" পিয়ানি বলল।

"সেটা শিগগিরই জানা যাবে।" আমি বললাম।

"আমি বিশ্বাস করি না যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা তাই ভাবছে বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

"শান্তির জয় হোক!" চিৎকার করে উঠল একজন সৈনিক, "বাড়ি ফিরে যাচ্ছি আমরা।"

পিয়ানি বলল, "বাড়ি ফিরে যেতে পারলে কী ভালই না হত। আপনি ফিরে যেতে চান না?"

"অবশ্যই চাই।"

"কিন্তু কোনওদিনই যাওয়া হবে না। আমি বিশ্বাসই করি না যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে।"

"আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।" চিৎকার করে উঠল আর একজন সৈনিক।

পিয়ানি বলল, "ওরা রাইফেল ফেলে দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে।"

"রাইফেল সঙ্গে রাখা উচিত ওদের।" আমি বললাম।

"ওরা ভাবছে রাইফেল সঙ্গে না থাকলে যুদ্ধ করতে আর বাধ্য করবে না কেউ।"

পথের ধার দিয়ে যেতে যেতে সেই বৃষ্টি আর অন্ধকারেও দেখতে পেলাম সবাই রাইফেল ফেলে দেয়নি—তাদের কাঁধের বর্ষাতির ভেতর দিয়ে উঁচু হয়ে রয়েছে রাইফেলের নল।

"তোমরা কোন্ ব্রিগেড?" একজন অফিসার জিজ্ঞেস করলে।

"ব্রিগাডা দি পাশে—শান্ত ব্রিগেড," চিৎকার করে উঠল একজন। অফিসারটি কোনও উত্তর দিল না।

"কী বলল—অফিসারটা কী বলছে?"

"চুলোয় যাক অফিসার। এভিভা লা পাসে—শান্তি দীর্ঘজীবী হোক।"

"চলে আসুন।" পিয়ানি বলল।

গাড়ির সারির মধ্যে পরিত্যক্ত দুটো ব্রিটিশ অ্যাম্বুল্যান্সের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা।

"ওরা গোরিজিয়া থেকে আসছে।" পিয়ানি বলল, "গাড়িগুলো চেনা।"

"ওরা আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছে।"

"ওরা যে আগেই রওনা হয়েছিল।"

"ড্রাইভার কোথায় গেল বলো তো?"

"সামনের দিকে আছে কোথাও।"

"জার্মানরা এসে উডিনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে এরা সবাই নদী পেরিয়ে যেতে পারবে।"

পিয়ানি বলল, "তাই তো বলছি যুদ্ধ থামবে না।"

"কিন্তু জার্মানরা তো এসে পড়তে পারত, কেন যে আসছে না কে জানে!"

"কী জানি। এ-ধরনের যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমার।"

"জার্মানদের হয়তো যানবাহনের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে!"

"কে জানে!" পিয়ানি বলল।

একা থাকলে পিয়ানি খুব শান্ত আর ভদ্র থাকে, কিন্তু দলে পড়লেই ওর মুখ আলগা হয়ে যায়।

আমি বললাম , "তুমি বিয়ে করেছ, লুইগি?"

"আপনি তো জানেন আমি বিয়ে করেছি।"

"তাই জন্যেই কি ধরা পড়তে চাও না?"

"সেটাও একটা কারণ বটে। আপনি বিয়ে করেছেন, তেনেন্তে?"

"না।"

"বোনেলোও করেনি।"

"বিয়ে করা দিয়ে মানুষের গতিবিধি বিচার করা যায় না। তবে বিবাহিত লোকেরা সব সময়ই স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চায়।"

স্ত্রী নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভাল লাগছে। পিয়ানি সায় দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছেন।" তারপর জিজ্ঞেস করল,

"আপনার পা কেমন আছে?"

"বড্ড ব্যথা।"

দিনের আলো ফোটার আগেই তাগ্লিয়ামেন্তোর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। সেই

বন্যাপ্লাবিত নদীর ওপরে সেতু দিয়ে পার হওয়ার জন্যে জনস্রোতকে অনুসরণ করে সেতুর মুখে এসে দাঁড়ালাম।

"এই নদীটা আগলানো উচিত ওদের।" অন্ধকারে নদীর জলটা খুব উঁচু মনে হচ্ছে। নদীতে তীব্র স্রোত আর তার বিস্তৃতিও বিশাল।

জল প্রায় সেতু পর্যন্ত উঠেছে। কাঠের সেতুটা মাইল খানেক লম্বা। জনতাকে অনুসরণ করে আস্তে আস্তে তার ওপর দিয়ে চলেছি। চারপাশে মানুষের চাপ। তার ফাঁক দিয়েই দেখছি নদীর দিকে, দেখছি চারপাশ। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। এই সেতু পার হওয়ায় কোনও আনন্দ অনুভব করছি না। মনে হচ্ছে দিনের বেলায় এখানে যদি একটা বিমান এসে বোমাবর্ষণ শুরু করে তাহলে কী হবে!

"পিয়ানি," ডাকলাম আমি। সামনেই ভিড়ের মধ্যে থেকে জবাব এল,

"আমি এখানে, তেনেন্তে।"

কারও মুখে কোনও কথা নেই, সবাই সেতু পেরোতে ব্যস্ত। পাড়ের প্রায় কাছে এসে পড়েছি। দূরে সেতুর শেষ সীমায় দেখা যাচ্ছে কয়েকজন অফিসার আর বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে আছে সেতুর দু'পাশে, আলো ফেলছে সকলের মুখে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেলাম—মানুষের সারিতে একটি লোকের দিকে আঙুল দেখাল একজন অফিসার। একজন বন্দুকধারী গিয়ে তার হাত ধরে টেনে রাস্তার ওপাশে নিয়ে চলে গেল। আমরা প্রায় তার সামনেই এসে পড়লাম। সারির প্রত্যেককে আলো ফেলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে অফিসাররা। আমাদের সামনের একজন লোককেও টেনে নিয়ে গেল। লোকটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ওরা যখন আলো ফেলেছিল তখন সেই আলো তার জামার হাতায় তারকাচিহ্ন চোখে পড়েছিল। মাথার চুল সাদা—বেঁটেখাটো, মোটাসোটা, বয়স্ক মানুষ। বন্দুকধারীরা তাকে টেনে অফিসারদের লাইনের পেছনে নিয়ে গেল। আমার দিকেও ওদের দু'-একজন তাকাচ্ছে। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বন্দুকধারীকে কী-যেন বলল। ভিড় ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে এল সে। আমার জামার কলার ধরে টানল লোকটা।

"ব্যাপারটা কী?" বলেই লোকটার মুখে সজোরে ঘুসি মারলাম। দেখতে পেলাম ওর গাল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ততক্ষণে আর-একজন এগিয়ে এসেছে আমার দিকে। তাকেও বললাম, "তোমাদের মতলবটা কী?" কোনও উত্তর দিল না সে। আমাকে কায়দা করে চেপে ধরার মওকা খুঁজছে। পিস্তলটা বার করার জন্যে হাতটা পেছনে নিয়ে ওদের বললাম,

"জানো না, অফিসারের গায়ে তোমরা হাত দিতে পারো না?"

অন্যজন পেছন থেকে আমাকে জাপ্‌টে ধরে আমার হাতটা পেছন দিকে মোচড়

দিয়ে প্রায় ভাঙার জোগাড় করে তুলল। আমিও পেছন দিকে ঘুরে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আমার গলা জাপ্‌টে ধরল। তৎক্ষণাৎ তার তলপেটে সপাটে একটা লাথি কষালাম।

"বাধা দিলে গুলি করো।" কে-যেন নির্দেশ দিল।

"এ-সবের মানে কী?" চিৎকার করে বলতে গেলাম, কিন্তু গলাটা প্রায় বুজে এসেছে। ততক্ষণে আমাকে রাস্তার পাশে এনে ফেলেছে ওরা।

"বাধা দিলেই গুলি করবে। পেছন দিকে নিয়ে যাও।" একজন অফিসার বলল।

"তোমরা কারা?" আমি বললাম।

"দেখতেই পাবে।"

"কে তোমরা?"

"সামরিক পুলিশ।" অন্য একজন অফিসার বলল।

"এই লোকগুলোকে দিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করিয়ে মুখে বলছ না কেন তোমাদের কাছে আসতে?"

কোনও উত্তর দিল না ওরা। উত্তর দেওয়ার দরকারই নেই ওদের। ওরা যে সামরিক পুলিশ!

"একে পেছনে অন্য সকলের কাছে নিয়ে যাও।" প্রথম অফিসারটি বলল, "ওর কথায় কেমন টান আছে দেখেছ!"

"সে তো তোরও আছে রে শুয়োরের বাচ্চা।"

"ওকে আর সবার সঙ্গে নিয়ে যাও।" আবার বলল অফিসারটি।

অফিসারদের সারির পেছনে রাস্তার নীচে একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে আমাকে নিয়ে গেল ওরা। সেখানে আরও একদল লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারজন অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, তার দু'পাশে দু'জন বন্দুকধারী। একপাশে একদল লোক দাঁড়িয়ে, তাদেরও দু'পাশে বন্দুকধারী পাহারা। সেই অপেক্ষমান দলের মধ্যে ঠেলে দিল আমাকে। যে-লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তাকে দেখলাম—সেই পূর্বোক্ত পক্ককেশ লেফটেন্যান্ট কর্নেলটি। প্রশ্নকর্তা অফিসাররা বেশ সুদক্ষভাবে জেরা করে চলেছে—

"কোন্ ব্রিগেড?"

লোকটি উত্তর দিল। আবার প্রশ্ন,

"কোন্ রেজিমেন্ট?" এবার প্রশ্ন,

"নিজের রেজিমেন্টের সঙ্গে নেই কেন?"

উত্তরের যুক্তিতে কান না দিয়ে বলা হল, "তোমাদের কি জানা নেই যে অফিসারকে তার বাহিনীর কাছে কাছে থাকতে হয়?"

লোকটি সেটা জানত। এবার অন্য একজন অফিসার বলল,

"তোমার আর তোমার মতো অন্য লোকেদের জন্যেই আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমির ভেতরে বর্বরগুলো ঢুকতে পেরেছে।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

"তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই আজ আমাদের পরাজয় ঘটেছে।"

"তোমাদের কখনও পশ্চাদপসারণের অভিজ্ঞতা হয়েছে?"

"ইতালি কখনও পিছু হঠতে পারে না।" বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র প্রশ্নোত্তর শুনছি।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলল, "যদি গুলি করতে হয় তো অনুগ্রহ করে এক্ষুনি করো। তোমাদের এইসব নির্বোধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর সম্ভব নয়।" বুকের ওপরে ক্রস-চিহ্নের সংকেত আঁকল সে। অফিসাররা নিজেদের মধ্যে কী-সব পরামর্শ করল। একজন কাগজের ওপর কী-যেন লিখল, তারপর বলল, "সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগের অপরাধে গুলি করে মারার নির্দেশ দেওয়া হল।"

দু'জন বন্দুকধারী কর্নেলকে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে গেল। বৃষ্টির মধ্যে টুপিহীন খালি মাথায় বৃদ্ধ মানুষটি এগিয়ে গেল সামনের দিকে—দু'পাশে বন্দুকের পাহারা। গুলি করাটা চেয়ে দেখলাম না বটে, কিন্তু আওয়াজটা শুনতে পেলাম স্পষ্ট। আর-একজন অফিসারকেও একইভাবে জেরা করা হচ্ছে। এ-লোকটিও নিজের বাহিনী ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু একে কোনও কৈফিয়ত দেবার সুযোগ দেওয়া হল না। মৃত্যুদণ্ড জারি করার পর গুলি করছে, এদিকে তখন আর-একজনকে নিয়ে চলছে জেরার প্রহসন। একের পর এক এমনি চলেছে। আমি চিন্তা করছি ওদের জেরার জন্যে অপেক্ষা করব কি না। ওদের ধারণা আমি ইতালিয়ান অফিসারের ছদ্মবেশে একজন জার্মান। ওরা সব দেশপ্রেমিক যুবক অফিসার, এখানে দেশরক্ষা করছে। তাগ্‌লিয়ামেন্তোর ওপারে দ্বিতীয় বাহিনীকে কলঙ্কমুক্ত করার ব্রত নিয়েছে। ইতালিয়ান ফৌজি উর্দিধারী ছদ্মবেশী বিক্ষোভকারীদের আর সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন বড় অফিসারদের গুলি করে মারছে। এ-পর্যন্ত যতজনকে ওরা ধরে এনে জেরা করেছে, সবাইকেই হত্যা করেছে। ওদের হাবভাবে মৃত্যুদণ্ডদাতা বিচারকসুলভ ন্যায়পরায়ণ নির্লিপ্ততা। ওরা তখন আর একজন লাইন-রেজিমেন্টের কর্নেলকে জেরা করছে। আরও তিনজন অফিসারকে আমাদের সঙ্গে এনে দাঁড় করিয়েছে। প্রশ্ন চলছে,

"রেজিমেন্ট কোথায়?"

বন্দুকধারী প্রহরীরা নবাগতদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যেরা কর্নেলকে দেখছে। এই সুযোগ—দু'জনের মাঝখান দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়লাম। মাথা নিচু করে সোজা নদীর দিকে ছুটছি। পেছন থেকে ছুটে আসছে বন্দুকের গুলি। নদীর পাড়ে পৌঁছেই

লাফিয়ে পড়ে জলের মধ্যে ডুব দিলাম। কনকনে ঠান্ডা জল। দম বন্ধ করে জলের তলায় রয়েছি। বুঝতে পারছি জলের স্রোত আমার ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ছুটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আর যেন থাকতে পারছি না, হয়তো আর কোনও দিন বাতাসের স্পর্শ পাব না। ভেসে উঠলাম জলের ওপর, বুক ভরে টেনে নিলাম টাটকা বাতাস। অমনি পাড়ের দিক থেকে ছুটে এল গুলি। আবার ডুব দিলাম জলে। দ্বিতীয়বার ওপরে ভেসে উঠতে সামনেই পেয়ে গেলাম এক টুকরো কাঠ। হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম সেটা। তার পেছনে মাথা লুকিয়ে ভেসে আছি জলের ওপরে। একবারও মাথা তুলে দেখিনি। পাড়ের দিকে দেখতেও চাই না আর। বন্দুকের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। কাঠের টুকরোটা জলের স্রোতে ঘুরে ঘুরে ভেসে চলেছে। এক হাত দিয়ে টুকরোটা ধরে আমিও চলেছি সেই সঙ্গে।

এবার মাথা তুলে চেয়ে দেখলাম—মনে হচ্ছে তীরটা যেন দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছন দিকে। নদীর স্রোতে অজস্র কাঠ ভেসে চলেছে। কন্‌কনে ঠান্ডা জল। মাঝে একটা ছোট ঝোপে-ঘেরা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে গেলাম। দু'হাত দিয়ে কাঠের টুকরোটা আঁকড়ে ধরে ভেসে চলেছি—স্রোতের টান আমাকে নিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে। কূল নেই কোনওদিকে। তীরভূমি আর চোখে পড়ছে না।

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

সময়ের স্রোত যখন নদীর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দেয়, তখন তার গতির হিসেব করা অসম্ভব। মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘক্ষণ ধরে নদীর বুকে ভেসেই চলেছি—হয়তো তা মোটেই বেশিক্ষণ নয়। নদীর ঠান্ডা স্রোতে ভেসে চলেছে তীর থেকে ভেসে আসা নানান জিনিস। বরাতজোরে এই ভারী কাঠের টুকরোটা পেয়ে গেছি। তার ওপরে থুতনি রেখে দু'হাত দিয়ে ধরে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি কন্‌কনে ঠান্ডা জলে। হাত-পা অসাড় হয়ে যাবে মনে হচ্ছে—কোনওমতে পাড়ে যেতে পারলে হয়।

বিরাট একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে নদীটা। রাতের আকাশে ভোরের ইঙ্গিতে। আলোয় তীরের আবছা আভাস ক্রমশ ফুটে উঠছে। স্রোতের ধারা এখানে তীরমুখী।

একবার ভাবলাম জামাজুতো খুলে সাঁতার দিয়ে তীরে পৌঁছনোর চেষ্টা করি। কিন্তু তারপর মনে হল, তীরে পৌঁছলে জামাজুতো ছাড়া চলবে কীভাবে? যেভাবেই হোক মেস্ত্রে-তে পৌঁছতেই হবে আমাকে। কাজেই জামাজুতো খোলার ভাবনা ত্যাগ করলাম।

স্রোতের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে অবশেষে তীরে পৌঁছলাম। আমার তখন আধমরা অবস্থা। বেশ কিছুটা আলো ফুটেছে, কিন্তু কোনও মানুষের দেখা পেলাম না। হাত-পা ছড়িয়ে তীরের ওপর শুয়ে পড়েছি, কানে আসছে নদীর তিরতিরের সঙ্গে মেশা বৃষ্টির শব্দ।

খানিক পরে উঠে পড়লাম। পায়ের বুট খুলে তার ভেতরে জমা জলটা ফেলে

দিলাম। তারপর সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিঙড়ে আবার পরলাম। গায়ে দেওয়ার আগে জামার হাতার তারকাচিহ্নগুলো কেটে বার করে পুরে রাখলাম ভেতর-পকেটে।

টুপিটা পথের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেছে। পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। তার শূন্য খাপটা কোটের পকেটে ভরে রাখলাম। ভিজে জামাকাপড় সর্বাঙ্গে সেঁটে বসেছে। হাত দিয়ে ঘষে ঘষে শরীরটা গরম রাখার চেষ্টা করছি। হাঁটলে বোধ হয় গরম থাকবে শরীরটা, ঠান্ডাও লাগবে না হয়তো।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তা ধরে চলার সময় দূরে একদল সৈন্যকে যেতে দেখলাম। পথের পাশে আড়াল করে গিয়ে পাশ কাটালাম তাদের । সারা দিন হেঁটে ভেনিসীয় সমভূমি পার হয়ে গেলাম। উত্তরদিক থেকে গ্রামের ভেতর দিয়ে দক্ষিণদিকে হাঁটছি। দু'বার দুটো রেললাইন পার হলাম। খালের পাশ বরাবর জলাভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে অবশেষে ভেনিস থেকে ত্রিয়েস্তে-তে যাওয়ার প্রধান রেলপথে এসে পৌঁছলাম। রেলপথের ওধারে একটা ছোট ফ্ল্যাগস্টেশন, সেখানে একজন বন্দুকধারী প্রহরী রয়েছে। ওদিকে রেললাইন চলে গেছে একটা সেতুর ওপর দিয়ে, সেখানেও পাহারা। আসার সময় এই লাইনের ওপর দিয়ে বিশাল লম্বা একটা রেলগাড়িকে যেতে দেখেছিলাম। এখনও তাই লাইনের উঁচু বাঁধের নীচে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম রেলগাড়ি আসার, আর প্রহরীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকলাম।

শেষ পর্যন্ত যখন কোনও ট্রেন আসার আশা ছেড়ে দিয়েছি ঠিক তখনই দূরে দেখতে পেলাম ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ল ইঞ্জিনটা। আমি উঠে লাইনের ধারে দাঁড়ালাম। প্রহরীরা দেখেছে কি না কে জানে, দেখলেও লাইনের এত কাছে সন্দেহ করার সম্ভাবনা কম।

ইঞ্জিনটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তার পিছনে কয়েকটা বন্ধ মালগাড়ি। এবার এল ছাদখোলা নিচু ধরনের একটা মালগাড়ি, মাথার ওপরটা পুরু ক্যানভাসে মোড়া। লাফ দিয়ে গাড়িটার পিছনের হাতল ধরে ঝুলে পড়লাম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আশ্রয় নিলাম দুটো কামরার ফাঁকে—জুড়ি লোহার ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে। সেতু পার হওয়ার সময় প্রহরীর নজর পড়ল। কিন্তু সে ভাবল আমি রেলেরই লোক, হয়তো কিছু মেরামতির কাজ করছি।

ছাদখোলা গাড়ির ওপরে ঢাকা ক্যানভাসের দড়ি ছুরি দিয়ে কেটে আলগা করে নিয়ে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু মাথা গলিয়ে ভেতরে যেতেই একটা শক্ত কিছুর মারাত্মক চোট লাগল মাথায়। মাথাটা ফুলে উঠল, মুখ বেয়ে গড়িয়ে এল রক্তের ধারা। চিন্তা করার সময় নেই, গুঁড়ি মেরে ঢুকেই পড়লাম। ভেতরে গিয়ে আবার ক্যানভাসের দড়ি এঁটে দিলাম। কামরাভর্তি বন্দুক—সেগুলোর গায়ে-মাখানো তেল আর চর্বির গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরে আছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম কামরার

মেঝেতে। ওপরে ক্যানভাসের গায়ে বৃষ্টি পড়ছে ঝরঝর করে আর নীচে লোহার বুকে চাকা চলছে ঘরঘর শব্দে। কোথা থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে বন্দুকগুলোর ওপরে, সেগুলোর গায়ে সাদা ক্যানভাসের ঢাকনা। হয়তো তৃতীয় বাহিনী থেকে পাঠানো হয়েছে। মাথার চোটটা ফুলে উঠেছে, চুপ করে শুয়ে থাকতে থাকতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যানভাস থেকে চুঁইয়ে-পড়া জল দিয়ে মুখে-কপালে জমা রক্তটা ধুয়ে কোটের হাতায় মুছে ফেললাম। যেভাবেই হোক চেহারায় আর পোশাকে যতটা সম্ভব লোকের সন্দেহ উদ্রেক না করে থাকতে হবে। মেস্ত্রে আসার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে। ওরা নিশ্চয়ই বন্দুকগুলো ওখানেই নামাবে। শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছি সময়ের, পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়।

ক্যানভাসের তলায় মালগাড়ির মেঝেতে বন্দুকের গাদার পাশে শুয়ে আছি ঠান্ডার মধ্যে। সারা শরীর ভিজে, পেট খিদেয় জ্বলছে। শেষ পর্যন্ত হাতের ওপর মাথা রেখে পেটে চাপ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। হাঁটুটা শক্ত হয়ে গেলেও ভালই আছে। ডাঃ ভালেন্তিনি সত্যিই চমৎকার অপারেশন করেছেন। পশ্চাদপসরণের অর্ধেকটা রাস্তা আমি পায়ে হেঁটে এসেছি আর তাগ্লিয়ামেন্তোর নদীর বেশ কিছুটা সাঁতরে আসতে পেরেছি ভালেন্তিনির হাঁটুর দয়ায়। এটাকে ভালেন্তিনির হাঁটুই বলতে হবে—অন্য হাঁটুটা অবশ্য আমার নিজের। ডাক্তাররা যখন শরীরের কোনও অকেজো অংশকে আবার সচল করে তোলেন, তখন সেটা আর নিজস্ব থাকে না।

পেটটা কিন্তু আমার নিজস্ব, তাই খিদের জ্বালায় অস্থির করে তুলেছে। মাথাটাও আমার, কিন্তু এখন সেটা কাজে লাগানো যাবে না। এখন কিছু চিন্তা করাও চলবে না। শুধু সামান্য একটু স্মৃতি-রোমন্থন করা যেতে পাবে, তাও খুব বেশি নয়।

ক্যাথারিনের কথা ভাবতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। জানি না ওর সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা। হয়তো হবে না। না, ওর কথা ভাবা চলবে না। একটু শুধু মনে করা যেতে পারে—অল্প একটু। শব্দ তুলে ধীর গতিতে চলা মালগাড়ির কঠিন মেঝেতে শুয়ে আছি, ক্যাম্বিসের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে একফালি আলো। শুয়ে আছি কঠিন মেঝেতে। পাশে যদি ক্যাথারিন থাকত! কী পাগলের মতো ভাবনা! এই ভিজে কাপড়ে শরীর ঢেকে, অন্তরে-বাইরে অসীম শূন্যতা নিয়ে মালগাড়ির কঠিন মেঝেতে শুয়ে তার সঙ্গ-কামনা!

যে-পরিস্থিতিতে এখানে পড়ে আছি, যাকে সবচেয়ে ভালবাসি তার উপস্থিতির স্বপ্নও সেখানে দেখা চলে না। চারপাশে বন্দুক, ভেসলিনের গন্ধ। ওপরের ক্যাম্বিসের ফাঁক দিয়ে জল পড়ছে।

মনে যতই শূন্যতাবোধ থাকুক, চিন্তার স্বচ্ছতাও ঠিক ততটাই এসেছে মস্তিষ্কে। চোখের সামনে দেখেছি একটা দেশের ওপর দিয়ে একটা সৈন্যবাহিনীর সরে যাওয়া আর অন্য বাহিনীর প্রবেশ। আমার যানবাহন আর অধীনস্থ লোকেরা এই বিপুল অপসারণের স্রোতে হারিয়ে গেল—যেভাবে আকস্মিক কোনও অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যায় ভারপ্রাপ্ত কর্মীর হেফাজতে থাকা মালপত্র। এসবের ক্ষতিপূরণের জন্যে তো বিমা করা ছিল না, কাজেই আমি এখন সে-সবের বাইরে চলে আসতে পারি অনায়াসে—আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। সেই ভারপ্রাপ্ত কর্মীর কথায় বিদেশি টান আছে বলে তাকে যদি গুলি করে মারতে যাওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পরে আবার নতুন করে সেই কারবার চালু হলে সেখানে পুরনো কর্মীর ফিরে যাওয়ার আশা করে না কেউ। সে অবশ্য অনায়াসেই অন্য চাকরি জুটিয়ে নিতে পারে, যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে না হয়। নদীর স্রোতে ভেসে গেছে আমার সমস্ত ক্রোধ আর দায়িত্ববোধ। দায়িত্ববোধ অবশ্য ওরা আমার জামার কলারে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। এখন এই সামরিক উর্দিটা খুলতে পারলে বাঁচি। তবে ওদের বিরুদ্ধে যাব না কখনও। ওদের সৌভাগ্য কামনা করি আমি। ওদের মধ্যে প্রচুর ভাল লোক আছে, সাহসী মানুষ আছে, আছে শান্ত আর বুদ্ধিমান লোকেরা, তারা জয়টীকা লাভের যোগ্য। কিন্তু তাতে আমার করণীয় আর কিছু নেই। এখন মেস্ত্রে-তে গিয়ে কিছু খেয়ে চিন্তার অবসান ঘটাতে চাই।

পিয়ানি জানাবে আমাকে গুলি করে মারা হয়েছে। ওরা যাদেরই গুলি করে মেরেছে তাদের কাগজপত্র পকেট থেকে বার করে নিয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠানোর জন্যে। কিন্তু আমার কাগজপত্র ওরা পাবে না। হয়তো বলবে জলে ডুবে মরেছে। কে জানে আমেরিকায় কী খবর যাবে! হয়তো খবর পাঠানো হবে—আহত হয়ে মারা গেছি আমি।

কে জানে আমাদের মেসের পাদ্রির কী খবর! আর রিনাল্‌দি? সে হয়তো এখন পর্দেনোনে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার—ওদের কারও সঙ্গেই এ-জীবনে আর দেখা হবে না। আমার জীবনের এই অধ্যায়ের এখানেই ইতি।

নাঃ, আর ভাবব না। এখন চাই খাদ্য, চাই পানীয়, আর বিশ্রাম চাই ক্যাথারিনের পাশে শুয়ে। হয়তো আজ রাতেই। না, আজ অসম্ভব—কিন্তু কাল?

তারপর দু'জনে কোথাও চলে যাব। আর কখনও ওকে ছেড়ে যাব না। যেখানে যাব একসঙ্গে যাব, আর সেটা শিগগিরই যেতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব? ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে সেই শক্ত মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ভোরবেলা মিলান স্টেশনে ঢোকার সময় ট্রেনের গতি কমে আসতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম। লাইন পেরিয়ে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম। একটা রেস্তোরাঁ খোলা আছে। একটু কফি খাওয়ার জন্য ঢুকলাম সেইখানে। দোকানঘরে ভোরের সুগন্ধের সঙ্গে মিশেছে সদ্য-ঝাঁট-দেওয়া ধুলোর গন্ধ। বাসি কফির পেয়ালায় ডোবানো রয়েছে চামচ, টেবিলের ওপর গত রাত্রির মদের গ্লাসের গোল ছাপ। দোকানের মালিক হাজির রয়েছে। একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে দু'জন সৈনিক। এক গ্লাস কফি আর একটুকরো রুটি খেলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মালিকটি বলল,

"এক গ্লাস গ্রাপ্পা খান না!"

"না, ধন্যবাদ।"

"আমি খাওয়াচ্ছি।"

ছোট এক গ্লাস ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

"যুদ্ধ-সীমান্তের কী খবর?" মালিকটি জিজ্ঞেস করল আমাকে।

"সেটা আমার জানার কথা নয়।" উত্তর দিলাম আমি।

সৈনিক দুটির দিকে হাত দেখিয়ে মালিকটি বলল,

"ওরা নেশায় চুর হয়ে আছে।"

সত্যি মাতাল বলেই মনে হচ্ছে ওদের, মালিকের কথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই। সে আবার বলল,

"বলুন না যুদ্ধের কী খবর!"

"যুদ্ধের খবর আমি কী করে জানব?"

"আমি আপনাকে স্টেশনের দিক থেকে আসতে দেখেছি—নিশ্চয়ই ট্রেন থেকে নেমেছেন।"

"বিশ্রী ভাবে পিছু হঠে আসতে হয়েছে।"

"সেটা কাগজে পড়েছি। কিন্তু তার পর? যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেছে?"

"না বোধহয়।"

একটা ছোট বোতল থেকে মালিকটি গ্লাসে গ্রাপ্পা ঢালল, বলল,

"আপনি যদি কোনও বিপদে পড়ে থাকেন, আমার এখানে থাকতে পারেন।"

"আমার কোনও বিপদ হয়নি।"

"কোনও বিপদে পড়ে থাকলে আমার কাছে থাকুন।"

"থাকার জায়গা কোথায়?"

"বাড়ির মধ্যে। কেউ বিপদে পড়লে এখানে থাকে।"

"অনেকেই কি বিপদে পড়েছে?"

"সেটা বিপদের ধরনের ওপর নির্ভর করে। আপনি তো দক্ষিণ আমেরিকার লোক?"

"না।"

"স্প্যানিশ বলতে পারেন?"

"অল্পস্বল্প।"

"এখন অবশ্য এ-দেশ ছেড়ে যাওয়া খুব কঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব নয়।"

"আমার ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।"

"এখানে আপনি যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারেন। তখন দেখবেন আমি কেমন মানুষ।"

"আমাকে আজ সকালেই চলে যেতে হবে, তবে ফেরবার সময় আপনার ঠিকানাটা আমার মনে থাকবে।"

মাথা নেড়ে লোকটি বলল,

"আপনি যেভাবে কথা বলছেন, তাতে আমি বুঝতে পারছি আপনি আর ফিরে আসবেন না। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো সত্যিই কোনও বিপদে পড়েছেন।"

"না, আমার কোনও বিপদ হয়নি। তবে সত্যিকারের বন্ধুর দাম আমার কাছে অনেক।"

একটা দশ লিরের নোট এগিয়ে দিলাম—কফির দাম। বললাম,

"আমার সঙ্গে আর একটু গ্রাপ্পা খান না!"

"না না, তার কোনও দরকার নেই।"

"এক গ্লাস?"

দু' গ্লাস ঢালল সে। তারপর বলল,

"এখানে আসতে ভুলবেন না। আর অন্য কারুর খপ্পরে পড়বেন না। আমার এখানে আপনি একদম নিরাপদে থাকতে পারবেন।"

"সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

এবার খুব গম্ভীর ভাবে সে বলল,

"তাহলে একটা কথা বলি—ওই কোটটা গায়ে দিয়ে ঘুরবেন না।"

"কেন?"

"জামার হাতা থেকে তারাগুলো যে কেটে ফেলা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওখানকার কাপড়ের রংটায় একটু তফাত আছে।"

আমি চুপ করে রইলাম। লোকটি আবার বলল,

"আপনার যদি কাগজপত্র না থাকে, আমি তা-ও জোগাড় করে দিতে পারি।"

"কী কাগজ?"

"ছাড়পত্র।"

"না, তার দরকার নেই, কাগজ আমার আছে।"

"বেশ। তবে কোনও কাগজের দরকার থাকলে আমি দিতে পারি।"

"কত খরচ পড়বে?"

"সেটা নির্ভর করবে কী ধরনের কাগজ তার ওপর। তবে দামটা ন্যায্যই হবে।"

"এই মুহূর্তে দরকার নেই।"

একটু হতাশার ভঙ্গি করল সে। বেরোনোর সময় বলল,

"ভুলবেন না, আমি আপনার বন্ধু।"

"ভুলব না।"

"আবার দেখা হবে।"

"নিশ্চয়ই হবে।"

পুলিশের নজরে না-পড়ার জন্য স্টেশনের দিকে আর গেলাম না। পার্কের কোণ থেকে একটা গাড়ি ধরে হাসপাতালের দিকে চললাম। হাসপাতালে দারোয়ানের ঘরে যেতে ওর বউ আমাকে জড়িয়ে ধরল, করমর্দন করল দারোয়ান।

"ফিরে এসেছেন—ভাল আছেন তো?"

"হ্যাঁ, ভালই আছি।"

"সকালে কিছু খেয়েছেন?"

"খেয়েছি।"

"কেমন আছেন, তেনেন্তে?" ওর বউ জিজ্ঞেস করল।

"খুব ভাল।"

"আমাদের সঙ্গে বসে একটু ব্রেকফাস্ট খাবেন না?"

"না, ধন্যবাদ। মিস বার্কলে এখনও হাসপাতালে আছে কিনা জানো?"

"মিস বার্কলে?"

দারোয়ান ঠিক বুঝতে পারল না। আমি বললাম,

"ইংরেজ নার্সটি।"

ওর বউ বলল,

"ওনার ইয়ে গো!" আমার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

দারোয়ান বলল,

"না, তিনি তো চলে গেছেন।"

বুকটা যেন শূন্য হয়ে গেল। বললাম,

"ঠিক জানো? কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছ তো? সেই লম্বা ইংরেজ মহিলা, মাথায় সোনালি চুল!"

"বুঝেছি। তিনি স্ত্রেসায় গেছেন।"

"কবে গেলেন?"

"দিন দুয়েক আগে। অন্য ইংরেজ মহিলাটিও ওঁর সঙ্গে গেছেন।"

বললাম, "ঠিক আছে। তোমাদের কিন্তু আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে। কাউকে বলবে না যে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ব্যাপারটা খুব জরুরি।"

দারোয়ান বলল,

"আমি কাউকে বলব না।"

ওর হাতে একটা দশ লিরের নোট দিতে গেলাম, আমার হাতটা ঠেলে দিল ও,

"আমি শপথ করছি বলব না। এর জন্যে টাকা চাই না আমার।"

ওর বউ বলল,

"আমরা আপনার জন্যে কী করতে পারি, তেনেন্তে?"

"শুধু এইটুকুই।"

"এ-ব্যাপারে একেবারে মুখ বন্ধ করে ফেললাম আমরা।" দারোয়ান বলল, "আমাদের দিয়ে আর কোনও কাজ দরকার হলে অবশ্যই জানাবেন।"

"জানাব। আচ্ছা, এখন চলি, আবার দেখা হবে।" ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে।

গাড়িতে উঠে গাড়োয়ানকে সিমন্‌সের ঠিকানা বললাম। সিমন্‌স আমার পূর্বপরিচিত এক বন্ধু—সঙ্গীতশিক্ষার্থী। শহরে বেশ অনেকটা দূরে পোর্তা মাগেন্তার কাছে সে থাকে। গিয়ে দেখি সিমন্‌স তখনও বিছানায় শুয়ে, ঘুম কাটেনি চোখের। সে বলল,

"তুমি তো খুব ভোরে ওঠো, হেনরি!"

"ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছেছি।"

"যুদ্ধে ছিলে নাকি? সিগারেট খাও একটা, টেবিলের ওপর ওই বাক্সে রয়েছে।"

প্রকাণ্ড ঘরখানা। দেয়ালের একধারে বিছানা, অন্যপাশে দূরে একটা পিয়ানো, একটা লম্বা আয়না আর টেবিল। ওর খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসেছি, বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট খাচ্ছে সিমন্‌স। আমি বললাম,

"খুব ঝামেলায় পড়ে গেছি গো।"

"আমিও। আমার তো সারাক্ষণ ঝামেলা লেগেই থাকে। একটা সিগারেট খাবে না?"

"না। সুইজারল্যান্ডে যাওয়ার কোনও উপায় বাতলাতে পারো?"

"তোমার? ইতালিয়ানরা তোমায় এ-দেশের বাইরে যেতেই দেবে না।"

"তা জানি। কিন্তু সুইসরা? তারা কী করবে?"

"তারা তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।"

"তা জানি। কিন্তু আইনটা কী?"

"কিছুই না—অত্যন্ত সরল। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো—শুধু ওদের জানিয়ে। কেন? পুলিশের চোখ এড়িয়ে বেড়াচ্ছ নাকি?"

"এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না।"

"বলতে না চাইলে থাক। তবে সব কথা শুনতে পারলে ভাল লাগত। এখানে তো কোনও খবর নেই, কিছুই ঘটে না এখানে। পিয়াচেনেৎসাতে আমার গানের অনুষ্ঠানটা একদম জমেনি।"

"খুব দুঃখের কথা।"

"অথচ গানটা ভালই গেয়েছিলাম। আবার একবার লিরিকোতে গাইব ভাবছি।"

"আমার সেখানে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছে করে।" আমি বললাম।

"তুমি বড্ড বেশি ভদ্র। কোনো ঝামেলা বাধিয়ে বসোনি তো?"

"ঠিক বলতে পারছি না।"

"বলতে না চাইলে থাক। ওই জঘন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে এলে কী করে?"

"সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।"

"কাজের ছেলে। আমি বরাবরই জানতাম তোমার মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে। যাক, তোমার কোনও সাহায্যের দরকার আছে?"

"তুমি যে বড্ড ব্যস্ত থাকো।"

"না হে না, একটুও না। বরং তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশিই হব।"

"তোমার আর আমার মাপ তো প্রায় সমান। তুমি বাইরে গিয়ে আমার জন্যে কিছু অসামরিক পোশাক কিনে আনতে পারবে? আমার নিজের যা-কিছু সব রোমে পড়ে আছে।"

"রোমে ছিলে নাকি? কী করে ছিলে গো? যা নোংরা জায়গা!"

"স্থাপত্যবিদ্যা শেখার ইচ্ছে ছিল।"

"তার জন্যে ওখানে যেতে হয়! পোশাক কিনতে হবে না। যা লাগে আমিই দেব। তোমার গায়ে চমৎকার ফিট করবে। পাশের ঘরে যাও, ওখানে আলমারিতে সব রাখা আছে। তোমার যা যা দরকার নিয়ে নাও। কিনতে হবে না।"

"কিনেই নিই না, সিম্!"

"দোহাই তোমার, কেনাকাটা করতে বেরোনোর চেয়ে দিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অনেক সোজা। ছাড়পত্র আছে? ওটা ছাড়া কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না।"

"আমার নিজের পাসপোর্টটা এখনও সঙ্গে আছে।"

"তাহলে জামাকাপড় পরে হেলভেটিয়ার দিকে যাত্রা করো।"

"অত সহজ নয় গো, আগে স্ত্রেসায় যেতে হবে।"

"বাঃ, তাহলে তো আরও ভাল। ওখান থেকে নৌকো পার হয়ে গেলেই হল। আমার এই গানের ঝামেলাটা না থাকলে আমিও সঙ্গে যেতাম।"

"তুমি বরং সুইস গান ধরলে পারতে।"

"তাই করব ভাবছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কী জানো? আমি সুইস গান গাইতেও পারি।"

"নীচে গিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে আসি।"

"হ্যাঁ, যাও। এসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবে।"

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসের আর শরীরের নানারকম কসরত করতে লাগল ও। আমি নীচে নেমে গেলাম।

অসামরিক পোশাক পরে নিজেকে যেন ছদ্মবেশী মনে হচ্ছে। বহুদিন ধরে সামরিক উর্দি পরছি, তাই এই পোশাক কেমন যেন বেমানান লাগছে—ট্রাউজারের পা-টা আলগা মনে হচ্ছে।

মিলান থেকে স্ত্রেসার টিকিট কিনেছি। নতুন একটা টুপি কিনেছি। সিমের টুপি মাথায় হল না, অবশ্য পোশাকটা গায়ে একদম মাপসই হয়েছে। জামা-কাপড় থেকে দারুণ তামাকের গন্ধ বেরোচ্ছে! ট্রেনে বসে মনে হল—পোশাকটা যতটা পুরনো মনে হচ্ছে, টুপিটা ঠিক ততটাই নতুন দেখাচ্ছে।

জানলার বাইরে বর্ষণসিক্ত বিষণ্ণ দেশটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে আমার মন। আমার মতো বয়সী অসামরিক যুবকের দিকে কামরাশুদ্ধু লোকের চোখে একটা বিতৃষ্ণার ভাব। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে চেয়ে আছি আমি। খুব একলা মনে হচ্ছে। স্ত্রেসায় পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্টেশনে কোনও হোটেলেরই লোক ছিল না। খবর নিয়ে জানলাম এখন মাত্র দুটো বড় হোটেলই খোলা আছে। বৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে তাদের একটার দিকেই যাত্রা করলাম। হোটেলের আচার-ব্যবহারে মার্জিত ভদ্রতা। বড় একটা ঘর ভাড়া নিলাম। জানলা দিয়ে লেক দেখা যায়, তার ওপর নিচু হয়ে জমে আছে কালো মেঘ। সূর্যের আলোয় নিশ্চয়ই আরও সুন্দর দেখাবে। হোটেলে জানিয়ে দিলাম, আমার

স্ত্রী-ও আসছেন। ঘরের মধ্যে বিরাট দ্বিশয্যার খাটে সাটিনের ঢাকা, ঘরের আসবাবপত্রে প্রচুর বিলাসিতা। হোটেলের পানশালায় বসে পান করলাম মার্তিনি সুরা, সেই সঙ্গে খেলাম বাদাম আর আলু ভাজা। পরিচালকটি পূর্বপরিচিত। দ্বিতীয় পাত্র মার্তিনি এগিয়ে দিতে দিতে সে বলল,

"এখানে এখন কী করছেন আপনি?"

"ছুটিতে আছি—আরোগ্য-ছুটি।"

"এখানে কেউ নেই। কেন যে এরা হোটেলটা খুলে রেখেছে কে জানে!"

"মাছ-টাছ ধরো?"

"কয়েকটা খুব ভাল মাছ ধরেছি। এই সময় মাছ ধরতে গেলে বেশ ভাল ভাল জাতের মাছ পাওয়া যায়।"

"আমার পাঠানো তামাকটা পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। প্রাপ্তিসংবাদের চিঠিটা পাননি?"

হেসে ফেললাম। যে-তামাকটা ও চেয়েছিল সেটা জোগাড় করতে পারিনি, অতএব পাঠানোও হয়নি। বললাম, "এবার জোগাড় করে দেব। আচ্ছা, দু'জন ইংরেজ নার্সকে দেখেছ এখানে? পরশু এসেছে তারা।"

"এই হোটেলে নেই।"

"দু'জন নার্স।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'জন নার্সকে তো দেখেছি। দাঁড়ান, এক্ষুনি খোঁজ করছি কোথায় আছে তারা।"

"ওদের মধ্যে একজন আমার স্ত্রী। তার সঙ্গে দেখা করতেই এখানে আসা।"

"অন্যটি আমার স্ত্রী।"

"আমি কিন্তু মজা করিনি।"

"মাপ করবেন, বুঝতে পারিনি। বোকার মতন রসিকতা করে ফেলেছি।"

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়ে গেল ও। আমি একটা করে বাদাম মুখে দিচ্ছি আর দোকানের আয়নায় আমার অসামরিক চেহারাটা দেখছি। পরিচালকটি ফিরে এসে বলল,

"স্টেশনের কাছে একটা ছোট হোটেলে আছে ওরা।"

আমি কিছু স্যান্ডউইচ আনিয়ে খেলাম, সঙ্গে আরও দু'গ্লাস মার্তিনি। দীর্ঘদিন পরে ভাল খাদ্য আর পানীয় পেয়ে নিজেকে যেন ভদ্রলোক বলে মনে হল। দু'-একটা প্রশ্ন করল পানশালার পরিচালক। আমি বললাম,

"যুদ্ধের কথা আর তুলো না, এমিলিও।"

যুদ্ধ এখন এখান থেকে অনেক দূরে। হয়তো থেমে গেছে। অন্তত এখানে তো

নেই। আর যেখানেই থাকুক না কেন, আমার কাছে যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। স্কুল-পালানো ছেলে যেমন স্কুলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না, আমার মনের অবস্থাও ঠিক তেমনি।

ওদের হোটেলে যখন পৌঁছলাম, ক্যাথারিন আর হেলেন ফার্গুসন তখন রাতের খাওয়া খেতে বসেছে। হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের টেবিলটা দেখতে পেলাম। ক্যাথারিনের মুখটা অন্যদিকে ফেরানো, ওর মুখের পাশটা দেখতে পাচ্ছি। চোখে পড়ছে গালের পাশ দিয়ে নেমে-আসা সোনালি চুলের গোছা, দীর্ঘ মসৃণ গলা আর সুঠাম কাঁধের একটা অংশ। ফার্গুসন কথা বলছিল, আমাকে দেখে কথা বন্ধ হয়ে গেল।

"হায় ঈশ্বর!" প্রায় আঁতকে উঠল ফার্গুসন।

আমি বললাম, "খবর-টবর কী?"

"তুমি!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল ক্যাথারিন। মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। নিচু হয়ে চুম্বন করলাম ওকে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও। চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

"এমন ঝামেলাবাজ লোক দেখিনি!" ফার্গুসন বলল, "এখানে কী করছ? খাওয়া-টাওয়া হয়েছে?"

"না।" ওর শেষের প্রশ্নটার জবাব দিয়ে পরিবেশনকারিণী মেয়েটিকে আমার জন্যে এক প্লেট আনতে বললাম। ক্যাথারিনের আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখে স্থির হয়ে আছে। ফার্গুসন বলল,

"এই পোশাকে এখানে কী করা হচ্ছে?"

"মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছি।"

"নিশ্চয়ই কিছু ঝামেলা বাধিয়েছ।"

"মনটাকে একটু খুশি কর তো ফার্গি, একটু হাসো।"

"খুশিটা হব কী করে? তোমাকে দেখলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়। কী বিপদেই না ফেলেছ এই মেয়েটাকে!"

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ক্যাথারিন, টেবিলের নীচে আস্তে করে আমার পায়ে পা ছোঁয়াল। বলল,

"আমাকে কেউ কোনও বিপদে ফেলেনি, ফার্গি। আমার সমস্যা আমি নিজেই বাধিয়েছি।"

"এ-লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।" ফার্গুসন বলল, "ইতালিয়ান কেরামতি দেখিয়ে তোমার সর্বনাশ করেছে। আমেরিকানরা ইতালিয়ানদের চেয়েও বদ।"

"শুধু স্কচরাই নীতিনিষ্ঠ।" ক্যাথারিন বলল।

"তা বলছি না! বলছি ওর ইতালিয়ানদের মতো ইতরামির কথা।"

"আমি ইতর, ফার্গি?"

"তার চেয়েও খারাপ। সাপের মতো বিশ্রী স্বভাবের। ইতালিয়ান উর্দি আর কেপ গায়ে জলজ্যান্ত সাপ একটা।"

"উর্দি তো এখন আর নেই।"

"সেটাই তো তোমার আর-একটা ছ্যাঁচড়ামির লক্ষণ। পুরো গ্রীষ্মকালটা এই মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করেছ, এখন ওকে ঝামেলায় ফাঁসিয়ে টুক করে খসে পড়বে।"

আমি আর ক্যাথারিন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও বলল, "আমরা দু'জনেই খসে পড়ব।"

"দু'জনেই সমান! তোমার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়, ক্যাথারিন বার্কলে। তোমার না আছে লাজলজ্জা, না মানসম্মানবোধ। ওটারই মতো তুমিও ছোটলোক।"

ফার্গুসনের হাতে হাত রাখল ক্যাথারিন,

"লক্ষ্মীটি ফার্গি, এভাবে বোলো না। তুমি তো জানো, আমরা একে অপরকে ভালবাসি।"

ফার্গুসনের মুখটা লাল হয়ে গেছে। সে বলল,

"হাত সরিয়ে নাও। তোমার যদি বিন্দুমাত্রও লজ্জা থাকত, তাহলেও না-হয় বোঝা যেত। কিন্তু ঈশ্বর জানেন কতদিনের গর্ভবতী তুমি, আর এখনও ব্যাপারটা তোমার কাছে একটা উচ্চস্তরের রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আবার তোমার সর্বনাশের গোড়াটি ফিরে এসেছে দেখে আমোদ আর ধরে না। তোমার না আছে লাজলজ্জা, না আছে বুদ্ধি।" কাঁদতে শুরু করল ফার্গুসন। ক্যাথারিন ওর কাছে গিয়ে দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল। ক্যাথারিনের শরীরে কোনও পরিবর্তন হয়নি দেখলাম। ফার্গুসন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে,

"কী ভয়ংকর ব্যাপার!"

ক্যাথারিন সান্ত্বনা দিল,

"ব্যাস ব্যাস, আর কেঁদো না, ফার্গি। সত্যি আমার খুব লজ্জা করছে। আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি।"

"না, আমি কাঁদছি না । আমি কাঁদি শুধু তোমার এই মারাত্মক দুর্দশা দেখে।"

আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

"তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ক্যাথারিন হাজার চেষ্টা করেও আমার এই ঘৃণা দূর করতে পারবে না।"

কেঁদে কেঁদে ওর চোখ লাল হয়ে গেছে, নাকের ডগা ফুলে উঠেছে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ক্যাথারিন। তাতে আরও খেপে গেল ফার্গুসন,

"আমার গলা জড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসবে না।"

"ছেলেমানুষি কোরো না, ফার্গি।"

"জানি, ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। আমার কথায় কিছু মনে কোরো না তোমরা।" ফার্গুসন তখনও কাঁদছে, "একেবারে বিগড়ে গেছে মনটা। বোকার মতো যা-খুশি বলছি। না না, তোমরা সুখী হও, দু'জনেই সুখী হও—তাই চাই আমি।"

"আমার সোনা ফার্গি, আমরা খুব সুখে আছি।" ক্যাথারিন বলল। আবার কান্নার ফোয়ারা ছুটল ফার্গুসনের। সে বলল, "এইভাবে তোমাদের সুখী হওয়া চাই না—তোমরা বিয়ে করছ না কেন? তোমার কি আর-একটা বউ আছে নাকি?"

বললাম, "নাঃ।" ক্যাথারিন হাসল।

"হাসার কিছু নেই," ফার্গুসন বলল, "ওর মতো লোকেদের অনেকেরই ঘরে বউ থাকে।"

ক্যাথারিন বলল,

"তুমি যদি খুশি হও, তাহলে এখনই বিয়ে করব আমরা।"

"আমাকে খুশি করার জন্যে নয়, বিয়ে করার ইচ্ছেটা তোমাদের নিজেদেরই হওয়া উচিত।"

"সময় মেলেনি যে এতদিন।"

"হ্যাঁ, তা জানি। কোন্ কর্মে মত্ত ছিলে সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

ভাবলাম আবার বুঝি কান্না শুরু হবে, কিন্তু তার বদলে তিক্ত বাক্যবাণ শুরু হল,

"আজ রাতে ওর সঙ্গেই চলে যাবে বোধহয়?"

ক্যাথারিন বলল,

"ও যদি চায়, তাহলে যেতে তো হবেই!"

"আমার কী হবে?"

"একা থাকতে ভয় করবে তোমার?"

"হ্যাঁ, করবে।"

"তাহলে তোমার কাছেই থাকব।"

"না। ওর সঙ্গেই যাও, এক্ষুনি চলে যাও। তোমাদের দু'জনকেই আর সহ্য করতে পারছি না আমি।"

"আগে খেয়ে নিই।"

"না, খেতে হবে না, এক্ষুনি যাও।"

"কী পাগলামি করছ, ফার্গি?"

"বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। দু'জনেই বিদেয় হও এক্ষুনি।"

ওর এই নিরবচ্ছিন্ন ভাবাবেগ দেখতে দেখতে বিরক্তি এসে গিয়েছিল আমার। ক্যাথারিনকে বললাম,

"চলো তাহলে চলেই যাই।"

ফার্গুসন বলল, "তা তো যাবেই! যাবার জন্যে হাঁকপাঁক করছ। আমার খাবার সময়টুকু পর্যন্ত তর সইছে না তোমাদের, ইতালির লেক দেখার কত ইচ্ছে ছিল আমার, সব চুকে গেল!"

ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে আবার কান্না শুরু হল।

ক্যাথারিন বলল, "বেশ, খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকব আমরা। আর তুমি চাইলে আমি থাকব, যাব না—তোমাকে একলা ফেলে রেখে যাব না।"

"না না, আমি তা চাই না। তুমি যাও।" চোখ মুছে ফার্গুসন বলল, "সত্যি ভীষণ ছেলেমানুষি করছি। তোমরা কিছু মনে কোরো না যেন।"

পরিবেশনকারিণী মেয়েটি এই কান্নাকাটি দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এবার পরিস্থিতি একটু ভাল দেখে সে-ও যেন স্বস্তি পেল।

সেই রাতে হোটেলের ঘরে শুয়ে আছি। নরম বিছানায় নিশ্চিন্ত আরাম। মেঝেতে পুরু কার্পেট। ঘরের বাইরে বিরাট নির্জন হলঘর, দরজার সামনে আমাদের দু'জোড়া জুতো। বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ছে, জানলার কাচে তার স্বচ্ছ ধারা। ভাল লাগছে ভীষণ। মনের আনন্দের সঙ্গে মিশে গেছে ঘর-ভরা আলোর প্লাবন। নেভানো আলোর অন্ধকারেও অপূর্ব আনন্দের শিহরণ! নরম শয্যার আরাম। অন্তহীন দুঃখের বিচ্ছেদ-সাগর পার হয়ে যেন ফিরে এসেছি নিজের ঘরে—স্বস্তির আমেজ, তৃপ্তির সুখ দেহে-মনে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আজ আর সেই একাকিত্বের অনুভূতি থাকবে না, বার বার উঠে চলে যাবে না সে আজ। এটাই আজ পরম সত্য, এই-ই সব। দুনিয়ার আর সব কিছু আজ অবাস্তব দুঃস্বপ্ন। যখন শ্রান্তি আসে, ঘুমে ঢলে পড়ি দু'জনে। আবার একজন যখন জাগি, অন্যজনও সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে। কোথাও কোনও একাকিত্বের অবকাশ নেই।

জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন মানুষ একা থাকতে চায়। ভালবাসার সঙ্গীর পাশে থেকেও তার এই একাকিত্বের বাসনা দূর হয় না, আর একে অপরের এই একাকিত্ববোধকে ঈর্ষা করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম অনুভূতি কখনও আসেনি। যখন অনেক নারীর মধ্যে উদ্দাম জীবন কাটিয়েছি, তখন মাঝেমধ্যে একটা একাকিত্বের তীব্র অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনের গভীরে। কিন্তু আজ ক্যাথারিন আর আমি একসঙ্গে থেকে এতটুকুও নিঃসঙ্গ বোধ করি না, কখনও ভয় পাই না জীবনকে বা এই পৃথিবীকে।

আগে ভাবতাম রাত আর দিনে, অন্ধকার আর আলোয় কত ফারাক! রাতের অনুভূতিকে দিনে অবাস্তব মনে হয়, কারণ রাত তখন অনুপস্থিত। সঙ্গীহীন মানুষের কাছে রাত আরও ভয়ানক। কিন্তু আমার আর ক্যাথারিনের জীবনে দিন-রাতের কোনও ফারাক নেই। সুন্দর সব দিনগুলো, রাত আরও সুন্দর। এত অসীম নির্ভীকতা যারা বহন করে আনে পৃথিবী তাদের হত্যা করে, কারণ তাদের ধ্বংস করার অন্য কোনও উপায় নেই। প্রতিটি মানুষকে চূর্ণ করে ফেলাই এ-দুনিয়ার কাজ। আর যে-হৃদয়কে চূর্ণ করতে পারে না, তার প্রাণকে হত্যা করে সে। যে-মানুষ ভাল, কোমল, আদ্যন্ত নির্ভীক, পৃথিবীর আঙিনায় সে-ই প্রথম বলি হয়। অন্য যারা, তাদেরও হত্যা করা হয় বটে, তবে তার জন্য কোনও তাড়া থাকে না।

ভোরের আলো জানলা দিয়ে এসে ঘুম ভাঙাল আমার। ক্যাথারিন তখনও ঘুমিয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। নীচের শূন্য বাগানটা একেবারে পরিপাটি। দুপাশের সারি-দেওয়া গাছপালার মাঝখান দিয়ে নুড়ি-গাঁথা পথটা সোজা চলে গেছে লেকের পাশের পাথরের দেওয়াল অবদি। ওপারের পাহাড়শ্রেণির সামনে ছড়ানো হ্রদের ওপর সূর্যের সোনালি আলোর ঝলক। জানলা দিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখছিলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি ঘুম-ভাঙা চোখে আমাকেই দেখছে ক্যাথারিন। বলল,

"কেমন আছ গো? খুব সুন্দর দিনটা, না?"

"তোমার শরীর কেমন?"

"খুব ভাল। কালকের রাতটা খুব সুন্দর কেটেছে।"

"এখন ব্রেকফাস্ট খাবে?"

বিছানায় বসে প্রাতরাশ খেলাম দু'জনে। ক্যাথারিন বলল,

"তোমার খবরের কাগজ চাই না? হাসপাতালে তো খবরের কাগজ না হলে চলত না তোমার।"

আমি বললাম, "না, এখন আর চাই না।"

"অবস্থা কি এতই খারাপ হয়েছিল যে এখন আর সে ব্যাপারে কাগজে পড়তেও ইচ্ছে করে না?"

"ও-সম্বন্ধে আর কিছুই জানতে চাই না আমি।"

"তোমার সঙ্গে থাকতে পারলে সব খবরই পেতাম।"

"মাথাটা পরিষ্কার হলে সব বলব তোমায়।"

"কিন্তু ওরা তোমায় উর্দি ছাড়া দেখলে গ্রেপ্তার করবে না?"

"সম্ভবত গুলি করে মারবে।"

"তাহলে আমরা এখানে থাকব না, এদেশের বাইরে চলে যাব।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম।"

"আমাদের চলে যেতেই হবে। এরকম পাগলের মতো ঝুঁকি মাথায় নেওয়া চলবে না তোমার। মেস্ত্রে থেকে মিলানে কী করে এলে?"

"ট্রেনে এসেছি। উর্দি পরা ছিল তখন।"

"বিপদ ছিল না কিছু?"

"তেমন কিছু না। একটা পুরনো ছাড়পত্র সঙ্গে ছিল, মেস্ত্রে-তে এসে তাতে তারিখটা বসিয়ে নিলাম।"

"যে-কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ার হবার সম্ভাবনা আছে। সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। এভাবে পড়ে থাকাটা একেবারেই বোকামি। তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমাদের কী হবে বলো তো?"

"এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না, ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"গ্রেপ্তার করতে এলে তুমি কী করবে?"

"ওদের গুলি করব।"

"খ্যাপামির চূড়ান্ত! এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আমি আর কিছুতেই তোমায় হোটেল থেকে বেরোতে দেব না।"

"যাবটা কোথায়?"

"এরকম কোরো না। তুমি যেখানে বলবে সেখানেই চলে যাব আমরা। এক্ষুনি একটা জায়গা ভেবে ঠিক করো।"

"লেক দিয়ে নৌকো করে কিছুটা গেলেই সুইজারল্যান্ড। ওখানে যাওয়া যেতে পারে।"

"তাহলে খুব ভাল হয়।"

লেকের ওপর আকাশে মেঘ জমে আছে, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। বললাম,

"আশা করি চিরদিন এরকম ফেরারি আসামির মতো কাটাতে হবে না।"

"আবার এক কথা! এমন কিছু বেশিদিন তুমি ফেরারির মতো ঘুরছ না, আর আমরা এখন আসামির মতো বাসও করছি না। দেখো, কী চমৎকার দিন কাটবে আমাদের।"

"সত্যি, একজন জঘন্য অপরাধীর মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। ফৌজ থেকে পালিয়ে এসেছি।"

"একটু মাথা ঠান্ডা করো সোনা। একে ফৌজ থেকে পালিয়ে আসা বলে না, তুমি শুধু ইতালিয়ান সৈন্যদল ছেড়ে চলে এসেছ।"

হেসে বললাম,

"খুব চমৎকার মেয়ে তুমি। চলো শুয়ে পড়ি আবার। যতক্ষণ শুয়ে থাকি, ততক্ষণ বেশ থাকি।"

খানিকক্ষণ পরে ক্যাথারিন বলল,

"নিজেকে আর অপরাধী বলে মনে হচ্ছে না তো?"

"না। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ সেটা মনে হয় না।"

"বোকা ছেলে! আমি তোমাকে খুব সাবধানে যত্ন করে রাখব।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল,

"সকালে আমার শরীর খারাপ হয় না—কী মজা, না?"

"দারুণ!"

"আমি যে তোমার কত চমৎকার বউ সেটা তুমি বোঝোই না। তা না বুঝলে তো বয়েই গেল। তোমাকে আমি এমন জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না। সেখানে খুব আনন্দে জীবন কাটাব আমরা।"

"তবে এক্ষুনি সেখানে যাই চলো।"

"যাব, যাব। তুমি যখন যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই যাব।"

"এখন কিছু ভাবব না।"

"ঠিক আছে।"

হ্রদের ধার দিয়ে ক্যাথারিন ওদের সেই ছোট্ট হোটেলটায় ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। নীচে পানশালায় গিয়ে কিছুক্ষণ কাগজ পড়লাম আমি। ওখানে বিশাল সব আরামকেদারা আছে। তারই একটায় এলিয়ে বসে যুদ্ধের খবর পড়ছি আর এমিলিওর জন্যে অপেক্ষা করছি। কাগজে দেখলাম ইতালীয় বাহিনীকে তাগলিয়ামেন্তো থেকেও পিছু হঠে পিয়াভের দুর্গম অঞ্চলে সরে যেতে হচ্ছে।

এমিলিও এসে বলল,

"কাউন্ট গ্রেফি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন।"

"কে?"

"কাউন্ট গ্রেফি। আগের বারের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মনে নেই?"

"তিনি এখানে আছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গে তাঁর ভাইঝিও আছেন। আপনার কথা শুনে তিনি আপনার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলতে চাইছেন।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

"কেমন আছেন?"

"বয়েস তো যেন দিন-দিন কমছে। কাল রাতে খাবার আগে তিনবার শ্যাম্পেন খেয়েছেন।"

"বিলিয়ার্ড কেমন চলছে?"

"বেশ ভাল। আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। আপনি এখানে এসেছেন শুনে খুব খুশি। ওঁর সঙ্গে খেলার কেউ তো নেই এখানে।"

কাউন্ট গ্রেফির বয়স এখন চুরানব্বই—মেটারনিচের সমসাময়িক। অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোকটির চুল আর গোঁফ সম্পূর্ণ সাদা, আর ব্যবহার ভারী চমৎকার। অস্ট্রিয়া আর ইতালি দুই দেশেরই পররাষ্ট্র-বিভাগে কাজ করেছেন এবং মিলান শহরের অভিজাত-সমাজে তাঁর জন্মদিনের উৎসবটা একটা রীতিমতো জমকালো ব্যাপার হিসেবে গণ্য হয়। জীবনের শতাব্দী পূর্ণ করার ইচ্ছে আছে তাঁর। এই চুরানব্বই বছর বয়সেও তাঁর বিলিয়ার্ড খেলার পারদর্শিতা সত্যিই আশ্চর্য। গতবার যখন স্ত্রেসায় এসেছিলাম তখন ওঁর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলেছিলাম, সেই সঙ্গে খেয়েছিলাম শ্যাম্পেন। এই নিয়মটা খুব ভাল লেগেছিল আমার। শতকরা পনেরো পয়েন্ট আগাম দিয়েও তিনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এমিলিওকে বললাম, "উনি এখানে আছেন বলোনি কেন?"

"খেয়াল ছিল না।"

"আর কে কে আছেন?"

"আপনার চেনা কেউ না। মোট ছ'জন আছেন।"

"তোমার এখন কী কাজ?"

"কিছুই না।"

"তাহলে একটু মাছ ধরতে যাওয়া যাক।"

"এক ঘণ্টার জন্যে যেতে পারি।"

"তাই চলো। ছিপটা নিয়ে এসো।"

গায়ে একটা কোট চড়িয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এমিলিও। লেকের ধারে গিয়ে একটা নৌকো নিলাম। আমি দাঁড় টানতে লাগলাম আর এমিলিও হালে বসে জলে ছিপ ফেলল। গভীর জলে মাছ ধরার মতন ভারী ছিপ। লেকের পাড় ঘেঁষে এগোচ্ছি—এখান থেকে স্ত্রেসাকে একেবারে জনশূন্য মনে হল। গাছের সারি, বড় বড় হোটেল আর রুদ্ধদ্বার ছোট ছোট বাড়ি।

ওপারে ইসোলা বেল্লায় চলে গেলাম, সেখানে পাথরের দেওয়ালের গায়ে জলটা হঠাৎ খুব গভীর হয়ে গেছে। পাথরের দেওয়ালটা ঢালু হয়ে চলে গেছে স্বচ্ছ জলের নীচে।

মেঘের আড়ালে ঢেকে গেছে সূর্য। লেকের ঠান্ডা জল ঘন কালো। একটা মাছও টোপ খেল না, কিন্তু জলের আলোড়নে ওদের যাতায়াত বুঝতে পারছিলাম। জেলেদের দ্বীপ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেলাম নৌকোটা। দ্বীপের ওপরে ডাঙায় টেনে তোলা রয়েছে অনেকগুলো নৌকো। জেলেরা জাল মেরামত করছে। এমিলিও বলল,

“একটু মদ খেয়ে নিলে কেমন হয়?”

“বেশ তো, চলো।”

পাথর-বাঁধানো ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম নৌকোটা। ছিপ গুটিয়ে পাটাতনের নীচে রেখে দিল এমিলিও। ঘাটে নেমে নৌকোটা বাঁধলাম। তারপর দ্বীপের ছোট্ট একটা কাফেতে একটা খালি কাঠের টেবিলে বসে ভার্মুথ দিতে বললাম। ও জিজ্ঞেস করল,

“ক্লান্ত লাগছে?”

“না।”

“ফেরার সময় আমি দাঁড় টানব।”

“আমার দাঁড় টানতে ভালই লাগে।”

“হয়তো হাত বদলালে বরাত খুলতে পারে।”

“তা বেশ।”

এমিলিও বলল,

“যুদ্ধের খবর বলুন।”

“খুব খারাপ।”

“আমাকে যেতে হয়নি, বয়স হয়ে গেছে তো।”

“বলা যায় না, এখনও যেতে হতে পারে।”

“সামনের বছর হয়তো আমাদেরও ডাকবে, তবে আমি যাব না। আমি একবার আবিসিনিয়ায় যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আপনি কেন গেলেন?”

“ঠিক জানি না, বোধহয় বোকা বলেই।”

“আর এক গ্লাস ভার্মুথ নেবেন?”

“নেব।”

ফেরার সময় ও-ই দাঁড় টানল। স্ত্রেসা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা চলে গেলাম, তারপর ফিরে এলাম পাড়ের ধার দিয়ে। আমার হাতে ছিপ, মাঝে মাঝে জলের নীচে সেটার হালকা স্পন্দন অনুভব করছি। তারপর একটা ঝাঁকুনি লাগল, মনে হল বড় মাছ একটা ঘাই দিয়ে গেল। সুতোটা টানটান হয়ে গেল, তারপরেই ফের একটা ঝাঁকুনি। টোপ গিলল না মাছটা, পালিয়ে গেল। এমিলিও বলল,

“মাছটা বড় ছিল বলে মনে হল?”

“বেশ বড় ছিল।”

“একবার একটা বড় মাছকে টেনে তুলতে গিয়ে আমার দাঁতই প্রায় উপড়ে গিয়েছিল।”

“সব চেয়ে ভাল হচ্ছে পা দিয়ে চেপে ধরা। তাহলে আর দাঁত ওপড়াবার ভয় থাকে না।”

বাইতে বাইতে হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে এসে পড়েছি। এমিলিও বলল,

"এগারোটা বাজে, এবার যেতে হবে।"

"তাই চলো।"

ছিপ গুটিয়ে ফেললাম। নৌকোটাকে পাথুরে দেওয়ালের ফাঁকে একটা ফাটলে শেকল আর চাবি দিয়ে আটকে রেখে এমিলিও বলল,

"আপনি যখনই চাইবেন, চাবিটা দিয়ে দেব আপনাকে।"

"ধন্যবাদ।"

ভিতরে ঢুকলাম দু'জনে। সকালবেলা মদ খাওয়ার প্রয়োজন নেই, তাই নীচে না বসে সরাসরি ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। হোটেলের পরিচারিকা ঘরটা সাফসুতরো করে গুছিয়ে দিয়ে গেছে। ক্যাথারিন তখনও ফেরেনি। একা বিছানায় শুয়ে চিন্তার হাত এড়ানোর চেষ্টা করছি। ক্যাথারিন ফিরে আসতেই আবার সব ঠিক হয়ে গেল। ক্যাথারিন বলল, "ফার্গুসন নীচে এসেছে, একসঙ্গে দুপুরের খাবারটা খাবে। তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে না।"

"না, না।"

"কী হয়েছে তোমার?"

"কী জানি!"

"আমি জানি। তোমার কিচ্ছু করার নেই এখানে, যা-কিছু সব এখন আমি। আর সেই আমিই চলে গেছি!"

"ঠিক বলেছ।"

"আমি সত্যি দুঃখিত। আমি জানি, হঠাৎ সব শূন্য মনে হওয়াটা খুব ভয়ংকর।"

আমি বললাম,

"এক সময় আমার জীবনটা পৃথিবীর যে-কোনও জিনিস দিয়েই ভরিয়ে রাখা যেত। অথচ আজ তুমি না থাকলে সবই শূন্য হয়ে যায়।"

"কিন্তু আমি তো তোমার কাছেই থাকব। মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে গিয়েছিলাম। তুমি তখন কিছু করোনি?"

"মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।"

"ভাল লাগেনি?"

"তা লেগেছে।"

"আমি যখন কাছে থাকব না তখন আমার কথা ভাববে না।"

"না ভেবেই তো যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছি, কিন্তু সেখানে তো কিছু কাজ থাকত।"

"বেকার ওথেলো!"

আমাকে রাগানোর চেষ্টা করল ও। উত্তর দিলাম,

"ওথেলো নিগ্রো ছিল। তাছাড়া আমার কোনও হিংসা নেই। আমি শুধুই ভালবাসি। আর সেখানে অন্য কিছুর কোনও জায়গা নেই।"

"ফার্গুসনের সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করবে তো?"

"ফার্গুসন আমাকে গালাগাল না দিলে আমি তো ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করি।"

"ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো। ভেবে দ্যাখো আমাদের কত কিছু আছে, আর ওর কিছুই নেই।"

"আমার মনে হয় না আমাদের যা আছে তা ও চায়।"

"তুমি ওর কতটুকু জানো?"

"বেশ বাবা, ভাল ব্যবহারই করব ওর সঙ্গে।"

"সেটা আমি জানি। তুমি ভীষণ ভাল!"

"খাবার পরে ও আর থাকবে না তো?"

"না। সে আমি ঠিক করে নেব।"

"তারপর ওপরে চলে আসব?"

"অবশ্যই। তাছাড়া আমি আর কী চাই বলে মনে হয় তোমার?"

নীচে নেমে খাবার ঘরে গেলাম। মস্ত হোটেল আর খাবার ঘরের জাঁকজমক দেখে খুব খুশি ফার্গুসন। খাওয়াটাও ভাল হল, সঙ্গে ছিল বোতল দুই কাপ্রি।

খাবার পরে কাউন্ট গ্রেফি এসে আমাদের অভিবাদন জানালেন। সঙ্গে তাঁর ভাইঝি—মহিলাটিকে কতকটা আমার ঠাকুমার মতো দেখতে। ক্যাথারিন আর ফার্গুসনকে কাউন্ট গ্রেফির কথা বললাম, শুনে ফার্গুসনের ধারণাটা বেশ ভাল হল। মস্ত হোটেলের খাবার ঘরে চমৎকার খাবার আর দারুণ মদ পেয়ে সকলেই খুশি। ক্যাথারিন আগে থেকেই এত আনন্দে ছিল যে তার আর নতুন করে খুশি হওয়ার কিছু নেই। ফার্গুসনও খুশি। আমারও মনটা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

খাওয়ার পর নিজের হোটেলে ফিরে গেল ফার্গুসন। বলল, খাওয়ার পর এখন একটু শোবে। আমরা আবার আমাদের ঘরে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার দিকে কে-যেন দরজায় টোকা দিলে।

বললাম, "কে?"

"কাউন্ট গ্রেফি জানতে পাঠালেন—আপনি কি তাঁর সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলবেন?"

ঘড়িটা খুলে বালিশের নীচে রেখেছিলাম, বের করে সময় দেখলাম।

ক্যাথারিন ফিসফিস করে বলল, "যেতেই হবে?"

"যাওয়াই বোধ হয় ভাল।"

ঘড়িতে সোয়া চারটে বাজে। চেঁচিয়ে লোকটিকে বললাম, "কাউন্ট গ্রেফিকে গিয়ে বলো—ঠিক পাঁচটায় বিলিয়ার্ডের ঘরে হাজির থাকব।"

পৌনে পাঁচটায় ক্যাথারিনকে চুমু খেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাথরুমে গিয়ে পোশাক পরতে পরতে আয়নায় নিজেকে দেখছি। গলায় টাই বাঁধছি। অদ্ভুত লাগছে নিজেকে অসামরিক পোশাকে দেখতে। আরও কিছু শার্ট আর মোজা কিনে ফেলা দরকার।

"ওখানে অনেকক্ষণ থাকবে না কি ?"

ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করল। বিছানায় শোয়া অবস্থায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। বলল,

"ব্রাশটা দাও না আমাকে।"

মাথাটা একপাশে কাত করে চুলের রাশের একদিকে ফের ব্রাশ চালাচ্ছে ও, আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে—খাটের ওপরে ঝোলানো বাতি থেকে আলো এসে পড়ছে ওর চুলে, গলায় আর কাঁধে। কাছে গিয়ে ব্রাশ-সমেত ওর হাতটা ধরে চুমু খেলাম ওকে, ওর মাথাটা আবার হেলে পড়ল বালিশের ওপরে। চুমু দিলাম ওর গলায়, কাঁধে। ওকে এভাবে আদর করতে গিয়ে অবশ হয়ে আসছে আমার সর্বাঙ্গ। বললাম,

"যেতে একদম ইচ্ছে করছে না আমার।"

"তোমাকে ছেড়ে দিতে আমারও ইচ্ছে করছে না ।"

"তাহলে যাব না।"

"না না, যাও। একটুক্ষণ তো, খানিক পরেই তো ফিরে আসবে আবার।"

"ওপরেই ডিনার খাব।"

"তাড়াতাড়ি গিয়ে ফিরে এসো।"

কাউন্ট গ্রেফি বিলিয়ার্ড-ঘরেই ছিলেন, খেলার মার অভ্যাস করছিলেন। টেবিলের ওপরে ঝোলানো বাতির আলোয় খুব রোগা মনে হচ্ছিল তাঁকে। আলোর ওপাশে ছোট একটা বরফ ভর্তি বালতি, বরফের ওপরে উঁচিয়ে আছে শ্যাম্পেনের দুটো বোতল। আমাকে টেবিলের কাছে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কাউন্ট গ্রেফি, এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন,

"আপনি এখানে এসেছেন শুনে খুব খুশি হয়েছি। অনুগ্রহ করে যে আমার সঙ্গে খেলতে এসেছেন —"

"আপনি যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, সেটা তো আমারই সৌভাগ্য!"

"শরীর ভাল তো? শুনলাম আপনি নাকি আইসোনজায় জখম হয়েছিলেন। আশা করি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

"এখন একদম ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন তো?"

"আমি সব সময়েই ভালই থাকি। তবে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, এই যা। বয়েসের লক্ষণ ফুটে উঠছে!"

"ও আমার বিশ্বাস হয় না।"

"সত্যি। একটা উদাহরণ দেব? ইতালীয় ভাষায় কথা বলা আমার পক্ষে সহজ। নিজের ওপর আমার বেশ দখল আছে, কিন্তু যখন ক্লান্ত লাগে তখন মনে হয় ইতালীয় ভাষাতেই কথা বলি। এতেই বোঝা যায় যে আমি বুড়ো হয়ে পড়ছি।"

"আমরা তো ইতালীয় ভাষাতেই কথা বলতে পারি। আমারও একটু ক্লান্ত লাগছে।"

"ও। কিন্তু আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, তখন আপনার ইংরেজিতেই কথা বলতে সুবিধে হবে।"

"আমেরিকান ভাষাতে।"

"হ্যাঁ, আমেরিকান। আপনি আমরিকান ভাষাতেই কথা বলুন। খুব সুন্দর ভাষা।"

"আমেরিকাবাসী কারও সঙ্গে তো দেখাই হয় না প্রায়।"

"তাদের জন্যে নিশ্চয়ই মন কেমন করে? নিজের দেশের লোককে দেখতে সব সময়েই ইচ্ছে করে মানুষের, বিশেষত দেশের মেয়েদের। আমার নিজের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। খেলবেন, নাকি বেশি ক্লান্ত লাগছে?"

"না না, তেমন কিছু ক্লান্তি নয়। ওটা আমি মজা করে বলেছিলাম। কত পয়েন্ট আগাম দেবেন আমাকে?"

"খুব খেলছেন নাকি আজকাল?"

"একেবারেই না।"

"আপনি কিন্তু ভাল খেলেন। শতকরা দশ পয়েন্ট দেওয়া যাক, কী বলেন?"

"এটা আপনি আমাকে বাড়িয়ে দেখছেন।"

"বেশ, পনেরো?"

"তাহলে ভালই হয়। কিন্তু তবুও আপনি হারিয়ে দেবেন আমায়।"

"বাজি ধরবেন নাকি? আপনি তো বরাবর বাজি ধরেই খেলেন।"

"সেই ভাল।"

"বেশ। আঠারো পয়েন্ট আগাম নিন, পয়েন্ট পিছু এক ফ্রাঁ করে বাজি।"

ভদ্রলোক দারুণ বিলিয়ার্ড খেলেন। অত পয়েন্ট আগাম পেয়েও পঞ্চাশে মাত্র চার পয়েন্ট এগিয়ে রইলাম তাঁর চেয়ে। দেওয়ালের গায়ে একটা বোতাম টিপে বেয়ারাকে ডাকলেন কাউন্ট গ্রেফি।

"একটা বোতল খোলো।" বেয়ারাকে বললেন কাউন্ট, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটু উত্তেজক কিছু পান করা যাক।"

মদটা খুব ঠান্ডা আর সুন্দর। কাউন্ট বললেন,

"এবার একটু ইতালীয় ভাষায় কথা বলা যাক। আপত্তি নেই তো? আজকাল আমার এই একটা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।"

খেলছি আর মদে চুমুক দিচ্ছি, মাঝে মাঝে ইতালীয় ভাষায় দু'-একটা কথা বলছি। মনটা খেলাতেই ডুবে আছে। কাউন্ট গ্রেফির একশো পয়েন্ট পুরো হয়ে গেল, আর আগাম নিয়েও আমার তখন চুরানব্বই। একটু হেসে আমার পিঠটা চাপড়ে দিলেন কাউন্ট।

"এবার অন্য বোতলটা খোলা যাক আর আপনার কাছে যুদ্ধের গল্প শোনা যাক।"

উনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আমার কথা শোনার জন্যে। আমি বললাম,

"ওই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে অন্য যা-হোক কথা বলুন।"

"যুদ্ধের কথা বলার ইচ্ছে নেই? ঠিক আছে। কী পড়ছেন এখন?"

"কিছুই না। আমি বোধ হয় একটু নির্বোধ ধরনের।"

"না না, তা নয়! তবে পড়াশোনা করা ভাল।"

"যুদ্ধের মধ্যে কী-কী লেখা বেরিয়েছে?"

"বারবুস নামে একজন ফরাসি লেখকের লেখা—'ল্য ফু'। তা ছাড়া—'মিস্টার ব্রিটলিং যা দেখছেন' (মিঃ ব্রিটলিং সিজ্ থ্রু ইট)।"

"কিছুই দেখছেন না তিনি।"

"মানে?"

"মানে এর ভেতর দিয়ে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ওই বইগুলো হাসপাতালে ছিল।"

"তা হলে তো পড়েছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ভাল কিছুই পাইনি।"

"আমার ধারণা ছিল 'মিস্টার ব্রিটলিং' ইংরেজ-মধ্যবিত্ত পরিবারের আত্মার কথা।"

"আত্মার খবর অবশ্য আমি জানি না।"

"বেচারা! আমরা কেউই তো আত্মার খবর জানি না। আপনি কি 'ক্রয়ান্ট'?"

"রাত্তিরে।"

কাউন্ট একটু হাসলেন। হাতের গেলাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন,

"ভেবেছিলাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরভক্তিও হয়তো বাড়বে, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত সেটা আর হল না। বড় দুঃখের কথা।"

"আপনি কি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকতে চান?" কথাটা বলেই মনে হল, এভাবে মৃত্যুর কথা বলাটা ঠিক হয়নি। তবে তিনি তাতে কিছু মনে করলেন না।

"সেটা নির্ভর করে জীবনের ওপর। আমার এই জীবনটা খুবই আনন্দময়, আমার চিরকাল বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।" সামান্য হেসে আবার বললেন, "আর প্রায় তাই-ই রয়েছি।"

নরম চামড়া-মোড়া গদির চেয়ারে এলিয়ে বসে আছি দু'জনে। বরফের বালতিতে শ্যাম্পেন আর সামনের টেবিলে আমাদের গেলাস দুটো।

"আপনি যদি আমার মতো এত বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকেন, তাহলে অসংখ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে আপনার।"

"আপনাকে কখনও বুড়ো বলে মনে হয় না।"

"বুড়ো হয় শরীরটা। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার এক-একটা আঙুলকে বোধহয় একটুকরো খড়ির মতো ভেঙে ফেলা যায়। অথচ আত্মার না বেড়েছে বয়েস, না হয়েছে জ্ঞান।"

"কিন্তু আপনি তো জ্ঞানী।"

"সেটাই তো সবচেয়ে বড় ভাঁওতা, এই বুড়োদের জ্ঞানের ব্যাপারটা। বুড়ো হলে জ্ঞান বাড়ে না, বাড়ে তাদের সতর্কতা।"

"হয়তো তাকেই জ্ঞান বলে।"

"এ-জ্ঞানের কোনও আকর্ষণ নেই। আপনার কাছে কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দামি?"

"যাকে আমি ভালবাসি।"

"আমারও ঠিক তাই। কিন্তু সেটা তো জ্ঞান নয়। জীবনকে আপনি মূল্য দেন?"

"দিই।"

"আমিও দিই। কারণ, ওটাই আমার সর্বস্ব, আর আছে আমার জন্মদিনের উৎসবগুলো।" একটু হেসে আবার বললেন, "আপনি বোধ হয় আমার চেয়ে জ্ঞানী। আপনি তো জন্মদিনে উৎসব করেন না।"

দু'জনে গেলাসে চুমুক দিচ্ছি। আমি বললাম,

"আচ্ছা, যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার মত কী?"

"আমার মতে ওটা বোকামি।"

"কারা জিতবে?"

"ইতালি।"

"কেন?"

"কারণ ও-জাতটা বয়সে তরুণ।"

"সব সময়ই কি তরুণ জাত যুদ্ধে জেতে?"

"কিছুকাল পর্যন্ত তাদের সম্ভাবনাই বেশি থাকে।"

"তারপর কী হয়?"

"তারপর তারা আবার পুরনোর দলে পড়ে যায়।"

"আপনি বলছিলেন আপনি জ্ঞানী নন!"

"ওটা জ্ঞান নয় ভাইয়া, ওটা হচ্ছে জীবনের ভাল দিক সম্পর্কে অবিশ্বাস।"

"আমার তো গভীর জ্ঞান বলেই মনে হচ্ছে।"

"তেমন কিছু নয়। ঠিক উল্টো উদাহরণও দিতে পারি এক্ষুনি। তবে জিনিসটা অবশ্য খারাপ নয়। শ্যাম্পেনটা কি ফুরিয়ে গেল?"

"প্রায়।"

"আর একটু চলবে নাকি? তাহলে পোশাকটা পরে আসি।"

"আমার মনে হয় এখন আর না-খাওয়াই ভাল।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ।"

উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট। বললেন,

"আশা করি আপনার ভাগ্য খুব ভাল হবে, আর আপনার স্বাস্থ্যও হবে খুবই ভাল। খুব সুখী হবেন আপনি।"

"ধন্যবাদ। আশা করি চিরদিন বেঁচে থাকবেন আপনি।"

"ধন্যবাদ। আর তাই তো থেকেছি। আপনার যদি কখনও ঈশ্বরে ভক্তি হয় আর তখন যদি আমি মরে যাই, তাহলে আমার জন্যে একটু প্রার্থনা করবেন। আমি আজকাল আমার অনেক বন্ধুদের এই কথা বলছি। ভেবেছিলাম আমি বোধহয় খুব ধার্মিক হব, কিন্তু সেটা হল না।"

তিনি যেন বিষণ্ণ হাসি হাসলেন, কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না—বয়সের ফলে তাঁর মুখে এত বলিরেখা যে হাসির কুঞ্চনগুলো যেন সেগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। আমি বললাম,

"কখনও আমি হয়তো খুব ধার্মিক হয়ে পড়ব। তখন আপনার জন্যে প্রার্থনা করব আমি।"

"আমি বারবার আশা করেছি আমারও ঈশ্বরে ভক্তি হবে, কারণ আমার পরিবারের সকলেই মৃত্যুর আগে খুব ধার্মিক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বেলায় সেটা হল না।"

"এখনও তার সময় হয়নি।"

"হয়তো সময় পেরিয়ে গেছে। হয়তো ধার্মিকতার বয়েসটাও আমি পেরিয়ে গেছি।"

"আমার ধর্মভাবটা রাতে জাগে।"

"তা ছাড়াও আপনি তো ভালবাসেন—মনে রাখবেন সেটাও ধর্মের একটা অঙ্গ।"

"আপনি তাই মনে করেন?"

"অবশ্যই।" তারপর টেবিলের কাছে এক পা এগিয়ে বললেন, "আপনি যে কষ্ট করে খেলতে এলেন—"

"সেটা আমার কাছে খুব আনন্দের ব্যাপার।"

"চলুন, একসঙ্গে ওপরে যাওয়া যাক।"

সে-রাতে ভীষণ ঝড় উঠল। ঘুম ভেঙে শুনতে পেলাম বৃষ্টির ধারা জানলার ওপর সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে, খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকছে। কে-যেন দরজায় খুব সাবধানে টোকা দিল। ক্যাথারিনকে না জাগিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। দরজা খুলে দেখি সামনে এমিলিও দাঁড়িয়ে। গায়ে বর্ষাতি, হাতে ভিজে টুপি।

"আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, তেনেন্তে।"

"কী ব্যাপার?"

"খুব গুরুতর একটা ব্যাপার।"

অন্ধকার ঘরটার চারদিকে একবার তাকালাম। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের এক কোণে জল এসে পড়েছে, সেখানে অন্ধকারটা যেন চকচক করছে। ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালালাম। জিজ্ঞেস করলাম,

"কী ব্যাপার এমিলিও, তোমার কোনও বিপদ হয়েছে?"

"বিপদটা আমার নয়, তেনেন্তে—আপনার।"

"তাই নাকি?"

"কাল সকালে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে ওরা।"

"সত্যি?"

"খবরটা আপনাকে জানাতে এলাম। শহরে গিয়েছিলাম, একটা কাফেতে বসে ওদের কথাবার্তা শুনলাম।"

"ও।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বেচারি—গায়ে ভিজে কোট, হাতে ভিজে টুপি। বললাম,

"ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে কেন?"

"যুদ্ধের কোনও ব্যাপারে হবে।"

"ব্যাপারটা তুমি জানো?"

"না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আগের বার আপনাকে ওরা অফিসার হিসেবে এখানে দেখেছে, এখন উর্দি ছাড়া দেখছে। এই পিছু-হঠার পর যাকে পাচ্ছে ধরছে ওরা।"

একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস বললাম,

"আমাকে ধরতে ওরা কখন আসবে জানো?"

"ভোরে। সময়টা ঠিক জানি না।"

"তুমি আমাকে কী করতে বলো?"

ওর টুপিটা একদম ভিজে গেছে। তা থেকে মেঝেতে জল পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। টুপিটা মুখ ধোওয়ার বেসিনে রেখে দিল এমিলিও।

"আপনার যদি ভয় পাওয়ার কিছু না থাকে, তাহলে গ্রেপ্তার করলেই বা কী? তবে এখনকার দিনে গ্রেপ্তার না-হওয়াই ভাল।"

"আমি ধরা পড়তে চাই না।"

"তাহলে সুইজারল্যান্ডে চলে যান।"

"কী করে যাব?"

"আমার নৌকোয়।"

"ঝড় হচ্ছে যে!"

"ঝড় থেমে গেছে। অবশ্য ঢেউ খুব। তবে ভয়ের কিছু নেই।"

"কখন যাব?"

"এক্ষুনি। ওরা হয়তো একেবারে ভোরেই এসে পড়তে পারে।"

"জিনিসপত্রের কী হবে?"

"এক্ষুনি সব বেঁধে ফেলুন। মাদামকে পোশাক-টোশাক পরে নিতে বলুন। জিনিসপত্রের ব্যবস্থা আমি করছি।"

"তুমি কোথায় থাকবে?"

"এখানেই। বাইরে গেলেই কারও নজরে পড়তে পারি। সেটা আমি চাই না।"

দরজা খুলে শোবার ঘরে গেলাম। ক্যাথারিন জেগে ছিল।

"কী হয়েছে গো?"

"কিচ্ছু হয়নি, রিনি। এক্ষুনি জামাকাপড় পরে একটা নৌকোয় করে সুইজারল্যান্ড যেতে চাও?"

"তুমি?"

"আমি এখন আবার শুয়ে পড়তে চাই।"

"বলো না কী হয়েছে!"

"এমিলিও বলছে কাল ভোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে।"

"ওর কি মাথার গণ্ডগোল আছে?"

"না।"

"তা হলে শিগগির করো। পোশাক পরে নাও, যাতে এক্ষুনি রওনা হতে পারি।" ঘুমচোখে বিছানায় উঠে বসল ক্যাথারিন। বলল,

"বাথরুমে কি এমিলিও আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আর মুখহাত ধুতে হবে না। ওদিক ফিরে থাকো, আমি চট করে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"

নাইটগাউনটা খুলে ফেলল ও। আমাকে অন্যদিকে তাকাতে হল, কারণ ও তা-ই চায়। পেটে বাচ্চা থাকায় ওর শরীরটা ক্রমশ বড় হতে শুরু করেছে। আমি যে সেটা দেখি তা ও চায় না। জানলা দিয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে পোশাক পরে নিলাম। ব্যাগে পোরার মতো জিনিসপত্র খুব একটা নেই আমার।

বললাম, "আমার ব্যাগে অনেক জায়গা আছে। ইচ্ছে করলে তোমার কিছু জিনিস দিয়ে দিতে পারো।"

ক্যাথারিন বলল, "আমার গোছগাছ করা প্রায় হয়ে গেছে। দ্যাখো, বোকার মতো একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু ও-লোকটা বাথরুমে কেন?"

"চুপ, চুপ! আমাদের ব্যাগদুটো নীচে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছে ও।"

"খুব ভাল লোক তো!"

"ও আমার পুরনো বন্ধু। একবার আমি ওকে কিছু তামাক পাঠাবার চেষ্টা করেছিলাম।"

জানলার বাইরে ঘোর কালো রাত্রির দিকে তাকালাম। হ্রদটা দেখা যাচ্ছে না, চোখে পড়ছে শুধু অন্ধকারের বুক চিরে বৃষ্টির ধারা। ঝোড়ো হাওয়া এখন অনেকটা কমে এসেছে। ক্যাথারিন বলল,

"আমার হয়ে গেছে।"

"বেশ।"

বাথরুমে গিয়ে এমিলিওকে ডাকলাম,

"এমিলিও, ব্যাগদুটো ভরা হয়ে গেছে।"

দু'হাতে ব্যাগদুটো তুলে নিল এমিলিও। ক্যাথারিন বলল,

"তুমি খুব উপকার করলে!"

"ও কিছু না। নিজেকে বাঁচিয়ে যতটুকু সাহায্য করা যায় ততটুকুই শুধু করব।" আমাকে বলল,

"এগুলো নিয়ে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে নৌকোয় চলে যাচ্ছি আমি। আপনারা বেড়াতে যাওয়ার ভান করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়বেন।"

ক্যাথারিন বলল, "বেড়াবার মতো রাতই বটে!"

"রাতটা সত্যিই যাচ্ছেতাই।"

"ভাগ্যিস আমার একটা ছাতা আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দরজার সামনে আসতে আমাদের দেখে দারোয়ান অবাক হয়ে বলল,

"বেরোচ্ছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। ঝড়ের সময় হ্রদটা কেমন দেখায়, একটু দেখে আসি।"

"আপনার তো ছাতা নেই।"

"না। তবে গায়ে কোট আছে, তাতেই জল আটকে যাবে।"

আমার কথায় ওর ভরসা হল না। বলল,

"আমি একটা ছাতা এনে দিচ্ছি।"

বিশাল একটা ছাতা নিয়ে এল। একটা দশ লিরের নোট দিলাম ওকে। লোকটি খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাল, আর বলল যে আমি নাকি ভীষণ ভাল লোক। বেরোনোর সময় ক্যাথারিনকে সাবধান করে বলল যে ঝড়ের মধ্যে থাকলে সে ভিজে যাবে।

"একটু পরেই ফিরে আসছি।"

বিরাট ছাতার নীচে মাথা ঢুকিয়ে অন্ধকার বাগানের পথ ধরে হ্রদের ধারে পৌঁছে গেলাম। কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। মনে হল কোথাও নিশ্চয়ই বরফ পড়ছে। গাছের সারির মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল এমিলিও। বেরিয়ে এসে বলল,

"ব্যাগ দুটো নৌকোর মধ্যে আছে।"

আমি বললাম, "তোমাকে নৌকোর দামটা দিয়ে দিই?"

"কত টাকা আছে সঙ্গে?"

"খুব বেশি নেই।"

"টাকাটা পরে পাঠাবেন, তাতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"কত পাঠাব?"

"যা খুশি।"

"বলোই না কত?"

"যদি নিরাপদে পেরিয়ে যেতে পারেন, পাঁচশো ফ্রাঁ পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকমতো বেঁচে যেতে পারলে এ-টাকাটা বেশি মনে হবে না।"

"ঠিক আছে।"

আমার হাতে একটা মোড়ক দিয়ে এমিলিও বলল,

"এতে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আছে—এই ক'টাই ছিল। এই এক বোতল ব্র্যান্ডি আর এক বোতল ওয়াইন।"

জিনিসগুলো আমার ব্যাগে ভরে ওগুলোর দাম নিতে বললাম ওকে। ও রাজি হল। ওকে পঞ্চাশ লিরে দিলাম। শিকল-বাঁধা নৌকোটা ঢেউয়ের দোলায় নেচে চলেছে।

হাত ধরে ক্যাথারিনকে নৌকোয় তুলে দিলাম। গায়ে কেপ জড়িয়ে গলুইয়ের কাছে গিয়ে বসে পড়ল ও। এমিলিও বল,

"কোথায় যেতে হবে জানেন তো?" বললাম—জানি। তখন জিজ্ঞেস করল দূরত্বটা আমার জানা আছে কিনা। তারপর ভাল করে পথটা বুঝিয়ে দিল। ক্যাথারিন বলল,

"ক'টা বাজে?"

"মাত্র এগারোটা।"

এমিলিও বলল, "সারা রাত দাঁড় টানলে ভোর সাতটায় পৌঁছে যাবেন।"

"এত দূর?"

"পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার।"

"যাব কী করে? এই বর্ষায় একটা কম্পাস তো চাই!"

"কিচ্ছু চাই না। সোজা দাঁড় টেনে ইসোলা বেল্লায় চলে যান, তারপর বাতাসে ভর দিয়ে গেলে উল্টো পাড়ে ইসোলা মাদ্রেয় পৌছবেন, সেখান থেকে বাতাসের টানেই পাল্লান্জায় পৌঁছে যাবেন—আলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেখান থেকে নদীর তীর ধরে এগোবেন।"

"হাওয়াটা যদি দিক বদলায়?"

"বদলাবে না। তিনদিন পর্যন্ত এভাবেই চলবে। একটা টিনের কৌটো আছে জল ছেঁচে ফেলার জন্যে।"

"তোমার নৌকোর জন্যে কিছু টাকা এখনই দিয়ে যাই।"

"না। ঠিকমতো বেঁচে পৌঁছে যেতে পারলে টাকাটা একবারেই পাঠাবেন।"

"আচ্ছা।"

"ডোবার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় না।"

"খুব ভাল।"

নৌকোর ওপরে উঠে বসলাম। এমিলিও বলল,

"হোটেলের পাওনা টাকাপয়সা রেখে এসেছেন তো?"

"হ্যাঁ। ঘরের মধ্যে একটা খামে পুরে রেখে এসেছি।"

"ঠিক আছে তেনেন্তে, আশা করি যাত্রাটা শুভই হবে আপনাদের।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ডুবে গেলে তো আর ধন্যবাদ দেবেন না।"

ক্যাথারিন জানতে চাইল ও কী বলছে। বললাম—আমাদের সৌভাগ্য কামনা করছে।

ক্যাথারিনও ওর সৌভাগ্য কামনা করে ধন্যবাদ জানাল।

এমিলিও বলল, "তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

নিচু হয়ে নৌকোটা জলের মধ্যে ঠেলে দিল এমিলিও। দাঁড় টেনে জলের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। হাত নেড়ে বিদায় জানালাম এমিলিওকে। বিষণ্নমুখে হাত নাড়ল এমিলিও। অন্ধকারে হোটেলের আলো দেখতে দেখতে দাঁড় টানছি। একসময় চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল আলোটা। ঝড়ের ধাক্কায় হ্রদের জলে যেন সাগরের ঢেউ, তবু বাতাসে ভর করে এগিয়ে চলেছি আমরা।

হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে মুখে। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড় বেয়ে চলেছি। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে এক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে। নিকষ অন্ধকার, কন্‌কনে হাওয়া—গলুইয়ের ওপর বসে আছে ক্যাথারিন। লম্বা লম্বা দাঁড়, তাতে চামড়ার কোনও হাতল নেই। যথাসম্ভব আলগা করে দাঁড় ধরে আছি। জানি একটু পরেই হাতে ফোস্‌কা পড়বে, তাই যথাসম্ভব কম দাঁড় টানছি। হালকা নৌকো। সহজেই বেয়ে চলেছি কালো জলরাশি ভেদ করে। দেখা যাচ্ছে না,তবু আশা করছি শিগগিরই পাল্লান্‌জার কাছে পৌঁছে যাব।

কিন্তু পাল্লান্‌জা আর চোখে পড়ল না। অন্ধকারে কখন যে পার হয়ে গেছি বুঝতে পারিনি। অনেকক্ষণ পরে যে-আলো দেখতে পেলাম সেটা ইনত্রার। বহুক্ষণ পর্যন্ত কোনও আলোর দেখা পাইনি, তীরও চোখে পড়েনি। অন্ধকারে একটানা দাঁড় বেয়ে চলেছি। ঢেউয়ের দোলায় মাঝে মাঝে নৌকো উঁচুতে উঠে যায়, জলে দাঁড় ছোঁয়াতে পারি না।

খানিক পরে বুঝলাম ওপারে চলে আসতে পেরেছি। ক্যাথারিন পাল্লান্‌জার কথা জিজ্ঞেস করতে বললাম যে পেরিয়ে এসেছি। ও বলল,

"কেমন আছ?"

"খুব ভাল।"

"এবার আমি একটু দাঁড় টানি।"

"না না, আমি ঠিক আছি।"

ক্যাথারিন বলল,

"বেচারা ফার্গুসন, সকালে হোটেলে এসে দেখবে আমরা নেই।"

"আমি ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না, শুধু ভাবছি দিনের আলো ফোটার আগেই সুইজারল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারব কিনা, আর কী করে সীমান্তরক্ষীদের নজর এড়াব।"

"এখনও কি অনেক দূর?"

"তিরিশ কিলোমিটারের একটু বেশি।"

সারা রাত দাঁড় টানলাম। হাতের এমন অবস্থা হল যে মুঠো করে আর দাঁড় ধরতে পারছি না। কয়েকবার অন্ধকারে পাড়ের ধাক্কায় নৌকো ভাঙার জোগাড় হয়েছিল। তবু পাড়ের ধার ধরেই যাওয়ার চেষ্টা করছি—হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে আর সময় বাঁচানোর আশায়।

বৃষ্টি থেমে গেছে, হাওয়ার দাপটে উড়ে গেছে মেঘ। আকাশে চাঁদ, হ্রদের জলে জ্যোৎস্নার আলো। মাঝে মাঝে ছোট্ট দ্বীপগুলো ঝকঝক করছে, দূরে পাহাড়সারির মাথায় তুষারের মুকুট। আবার কোথা থেকে মেঘের দল এসে জমে। ঢাকা পড়ে চাঁদের মুখ, চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় সব ছবি। তবু অন্ধকার খুব গাঢ় নয়, দূরে দেখা যায় তীরের কালো রেখা। আবার যখন মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দেয়, তীরভূমির ওপারে দেখা যায় পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছোট ছোট সাদা বাড়িগুলো গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দীর্ঘ সাদা পথরেখা।

একটানা দাঁড় বেয়ে চলেছি। দূরে পাড়ের ওপরে আলো চোখে পড়ে। সম্ভবত লুইনো-র আলো। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের গতি ভালই বলতে হবে। দাঁড় দুটো নৌকায় তুলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, হাত, কাঁধ, পিঠ, মাথা সব ব্যথায় টনটন করছে, হাত দুটোতে বোধহয় ফোস্‌কা পড়েছে। ক্যাথারিন বলল,

"ছাতাটা খুলে ধরে থাকি, তাহলে পালের কাজ হবে—হাওয়ার ধাক্কায় চলে যাওয়া যাবে।"

"তুমি হাল ধরতে পারো?"

"বোধ হয় পারব।"

"তাহলে এই দাঁড়টা হাতের তলায় চেপে ধরে নৌকোর ধার ঘেঁষে বসে আস্তে আস্তে চালিয়ে যাও।" দাঁড়টা কীভাবে ধরতে হবে দেখিয়ে দিয়ে গলুইয়ের ওপরে বসলাম। হোটেলের দারোয়ানের দেওয়া বিরাট ছাতাটা খুললাম। বাঁটটা বসবার আসনে আটকে রেখে, খোলা ছাতার দু'পাশটা দু'হাত দিয়ে ধরে থাকি—নৌকোর দু'পাশে পা রেখে। ছাতার মধ্যে জোরে হাওয়া ঢুকে পালের মতো টেনে নিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড জোর লাগছে ধরে থাকতে। হু-হু করে ছুটে চলেছে আমাদের নৌকো।

"দারুণ যাচ্ছি আমরা।"

ক্যাথারিন বলল। আমার চোখের সামনে শুধু ছাতার কালো শিকগুলো। ভীষণ জোর পড়ছে ছাতার মধ্যে। মনে হচ্ছে আমিও বোধহয় ছাতাটার সঙ্গে উড়ে যাব। নৌকোর দু'কোণে পা-দুটো শক্ত করে আটকে ছাতাটা চেপে ধরে আছি। হঠাৎ ভেঙে

গেল ছাতাটা, একটা শিক ছিটকে এসে লাগল আমার কপালে। ওপর থেকে ছাতাটা হাত দিয়ে চেপে ধরার চেষ্টা করলাম, সবশুদ্ধু উল্টে গেল। নৌকোর দু'পাশে পা রেখে বসে আছি, সবক'টা শিক ঝুলে-পড়া উল্টোনো ছাতাটার বাঁট ধরে। বাঁটটা আসন থেকে খুলে নিলাম, তারপর ভাঙা ছাতাটা গলুইয়ের পাশে রেখে ক্যাথারিনের কাছে গেলাম দাঁড় টানতে। গিয়ে দেখি ও হাসছে। কাছে যেতে আমার হাত দুটো ধরে হাসতে লাগল। দাঁড়টা ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম,

"ব্যাপারটা কী?"

"তোমার ছাতাধারী চেহারাটা যা মজার লাগছিল দেখতে।"

"তা তো লাগবেই।"

"রাগ কোরো না, সত্যি খুব মজার লাগছিল। ছাতার দু'পাশ ধরে—দু'দিকে পা মেলে—যেন কুড়ি ফিট চওড়া বিশাল একটা দৈত্য।"

দমবন্ধ হয়ে এল হাসতে হাসতে।

আমি বললাম, "সরো, এবার আমি দাঁড় টানি।"

"একটু জিরিয়ে নিয়ে একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নাও। কী সুন্দর রাতটা, তা ছাড়া অনেকটা দূর তো এসেই গেছি।"

"নৌকোটাকে ঢেউয়ের ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

"ব্র্যান্ডিটা বার করে দিচ্ছি। একটু বিশ্রাম করে নাও, সোনা।"

দাঁড়টা নামিয়ে রাখলাম। আপনিই বয়ে চলল নৌকোটা। ব্যাগ খুলে ব্র্যান্ডির বোতল বার করল ক্যাথারিন। পকেট থেকে ছুরি বের করে বোতলের ছিপিটা খুললাম। অনেকটা খেয়ে নিলাম এক চুমুকে। শরীরটা বেশ গরম হয়ে উঠল, মনটাও চাঙ্গা হয়ে উঠল।

"ব্র্যান্ডিটা দারুণ।" আমি বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম,

"কিটি, তোমার ঠান্ডা লাগছে না তো?"

"একটু আড়ষ্ট লাগছে বটে, কিন্তু খুব ভাল আছি।"

"পায়ের নীচের জলটা ছেঁচে ফেলে দিয়ে পা নামিয়ে আরাম করে বোসো।"

নিস্তব্ধ হ্রদের ওপর দাঁড় টানার ছপছপ শব্দ আর ক্যাথারিনের জল ছেঁচার আওয়াজ। নীরবে ভেসে চলেছি আমরা। ওকে বললাম,

"তোমার জল-ছেঁচার কৌটোটা দাও তো, একটু জল খাব।"

"এটা ভীষণ নোংরা।"

"হোকগে, ধুয়ে নেব।"

শুনতে পাচ্ছি কৌটোটা জলে ধুচ্ছে ক্যাথারিন। তারপর জল-ভর্তি কৌটোটা এগিয়ে দিল। ব্র্যান্ডি খাবার পর খুব তেষ্টা পেয়েছিল, অনেকটা জল খেলাম। ঠান্ডা কন্‌কনে জল, দাঁত শিরশির করে। ক্যাথারিনকে বললাম,

"কিছু খাবে না?"

ও বলল, "না, একটু পরেই খিদে পাবে, ততক্ষণ ওগুলো থাক।"

"তাহলে থাক।"

মনে হল আর একটা ঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছি। দাঁড় টেনে আবার পাড়ের থেকে অনেকটা ভেতরে সরে এলাম। হ্রদটা এখানে অনেক সরু হয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদের আলো। পাড়ে পাহারা থাকলে চাঁদের আলোয় হ্রদের বুকে আমাদের নৌকোটা দেখতে পেত তারা।

"কেমন আছ, কিটি?"

"ঠিক আছি। কতদূর এলাম?"

"আর বোধ হয় মাইল আষ্টেক আছে।"

"তার মানে আরও অনেকক্ষণ দাঁড় টানতে হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে, না?"

"না না, আমি ঠিক আছি। হাতদুটো শুধু একটু অসাড়-অসাড় লাগছে।"

দাঁড় টেনে চলেছি। ডান দিকের পাড়ে পাহাড়ের সারিতে হঠাৎ একটা খাঁড়ি দেখা গেল। মাঝখানটা সমতল হয়ে নীচে নেমে এসে জলের সঙ্গে মিশেছে। ওটা বোধহয় কান্নোবিও। ঘাট থেকে অনেকটা দূর দিয়ে চলেছি, যাতে কোনও প্রহরীর চোখে না পড়ি। মনে হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জল পেতে আরও পাঁচ মাইল যেতে হবে। চাঁদ প্রায় ডুবতে চলেছে, কিন্তু পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগে আবার আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে এল, চারপাশটা আবার অন্ধকারে ডুবে গেল। হ্রদের প্রায় মাঝখান দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে দাঁড় টানছি, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছি। ক্যাথারিন বলল, "দাও, আমি একটু দাঁড় টানি।"

"তোমার বোধহয় উচিত হবে না।"

"বাজে বোকো না। বসে থেকে হাত-পা জমে যাচ্ছে। দাঁড় টানলে সেটা কমবে।"

"তোমার পক্ষে সেটা ঠিক হবে না।"

"আবার বাজে বকছ! একটু-আধটু দাঁড় টানা এ-অবস্থায় ভালই।"

"বেশ, তাহলে অল্প একটু টানো। আমি এখান থেকে সরে যাচ্ছি, তুমি এসো। আসার সময় ধরে ধরে এসো।"

গলুইয়ে বসে ক্যাথারিনের দাঁড় টানা দেখছি। ভালই টানছে, তবে দাঁড়গুলো বেশি লম্বা হওয়ায় বোধহয় একটু অসুবিধে হচ্ছে। ব্যাগ খুলে দুটো স্যান্ডউইচ আর একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নিলাম। বেশ ভাল লাগল। আরও একটু ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে দিলাম। ক্যাথারিনকে বললাম,

"ক্লান্তি লাগলে বোলো।"

একটু থেমে আবার বললাম,

"দেখো, দাঁড়টা যেন পেটে না লাগে।"

দাঁড় টানতে টানতেই ও বলল,

"লাগলে তো সব সমস্যা সহজেই মিটে যেত।"

আবার একটু ব্র্যান্ডি খেলাম।

"কেমন লাগছে?"

"ঠিক আছে।"

"না পারলে বোলো।"

আর এক ঢোঁক ব্র্যান্ডি খেয়ে নৌকার ধার দুটো ধরে ওর দিকে এগোতে লাগলাম। ও বলল,

"না না, আমি ঠিক আছি।"

"যাও, গলুইয়ে গিয়ে বোসো, আমার অনেক বিশ্রাম হয়ে গেছে।"

ব্র্যান্ডি খেয়ে চাঙ্গা শরীরে খানিকক্ষণ বেশ বেয়ে চললাম, কিন্তু খানিক পরেই দেখি আর ঠিকমতো দাঁড় পড়ছে না। শেষে গলা দিয়ে সামান্য পিত্তি উঠতে লাগল—ব্র্যান্ডি খেয়ে বেশি দাঁড় টানার ফল। ক্যাথারিনকে বললাম,

"একটু জল দাও তো।"

দিনের আলো ফোটার আগেই আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। কতদূর এসেছি জানি না, প্রাণপণে দাঁড় টানছি—যেভাবেই হোক হ্রদের সুইজারল্যান্ডের অংশটায় পৌঁছতেই হবে। দিনের আলোয় দেখলাম তীরের বেশ কাছ দিয়েই চলেছি আমরা—পাথুরে পাড় আর গাছগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরে লেকের ওধারে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। ক্যাথারিন বলল,

"ওটা কী?"

কান পেতে শুনে বুঝলাম, একটা মোটরবোটের ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ—শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বৃষ্টির মধ্যে একটা মোটরবোট আসছে—আমাদের থেকে একটু ওপাশে। মাশুল আদায়কারী চারজন সান্ত্রী গলুইয়ে বসে, মাথার টুপি নামানো, জামার কলার তোলা, পিঠে বন্দুক। এই ভোরবেলা সকলেরই চোখ ঘুমে জড়ানো। জল কেটে এগিয়ে গেল মোটরবোটটা, বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নৌকোটা আবার হ্রদের মাঝখানে নিয়ে এলাম। ভয় হচ্ছে পাড় থেকে দেখতে পেয়ে কোনও সান্ত্রী যদি ডেকে বসে। আর একটা মোটরবোটের আওয়াজ পেলাম। চুপচাপ বসে রইলাম। শব্দটা ক্রমশ লেকের মাঝখান দিয়ে দূরে চলে গেল।

বললাম, "কিটি, মনে হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে পৌঁছে গেছি।"

"সত্যি?"

"সুইস সৈন্যবাহিনীকে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কিংবা সুইস নৌ-সেনা।"

"সেটা আমাদের পক্ষে খুব মজাদার ব্যাপার হবে না। এক্ষুনি যেটা গেল সেটাই বোধহয় সুইস নৌ-সেনার মোটরবোট।"

"সুইজারল্যান্ডে যদি পৌঁছে গিয়ে থাকি, তাহলে চলো জমিয়ে ব্রেকফ্রাস্ট খেয়ে আসি। ওদের এখানে খুব চমৎকার রোল, মাখন আর জ্যাম পাওয়া যায়।"

ঝকমকে দিনের আলো, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সুইজারল্যান্ডের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে অনেক বাড়ি। পাথুরে বাড়িতে ভরা একটা গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাড়ি, মাঝখানে একটা গির্জা। পাড়ের দিকে চেয়ে দেখছি কোনও প্রহরীকে দেখা যায় কিনা। রাস্তার পারে একটা কাফে, সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন সান্ত্রী, সবুজ-খাকি রঙের উর্দি পরনে, মাথায় জার্মানদের মতো টুপি। ভরাট মুখের ওপর ছোট একজোড়া গোঁফ। সে আমাদের দিকে তাকাতে ক্যাথারিনকে বললাম,

"ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ো।"

ক্যাথারিন তাই করল, সান্ত্রীটিও লাজুক হেসে হাত নাড়ল।

এবার ধীরে ধীরে দাঁড় টানতে শুরু করলাম।

গ্রামের সীমানা পেরিয়ে চলেছি।

"আমরা বোধহয় সীমান্ত থেকে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছি।" আমি বললাম।

ক্যাথারিন বলল,

"এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে নামাই ভাল। পরে আবার ফিরে যেতে না হয়।"

"সীমান্ত এখান থেকে অনেক দূর। এ-জায়গাটা নিশ্চয়ই ব্রিসাগো। এখানে শুল্ক আদায় করা হয়।"

"কোনও ইতালিয়ান তো নেই এখানে? শুল্ক আদায়ের জায়গায় দু'দেশের লোকই তো থাকে।"

" এই যুদ্ধের সময় সীমানা পেরিয়ে এত দূরে ইতালিয়ানরা আসার অনুমতি পাবে বলে মনে হয় না।"

চমৎকার পরিচ্ছন্ন শহর। ঘাটের ধারে প্রচুর জেলে-নৌকো দাঁড়িয়ে, ঘাটের ওপর মাছ-ধরার জাল বিছোনো। নভেম্বরের চমৎকার বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে কোনও বিষণ্ণতা নেই।

"এখানেই নেমে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়া যাক।"

"তাই হোক।"

ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে একটা লোহার রিঙের সঙ্গে বেঁধে দিলাম নৌকোটা, তারপর লাফ দিয়ে নামলাম ঘাটের ভিজে পাথরের ওপর—সুইজারল্যান্ডের পাথর। নৌকো বেঁধে হাত বাড়িয়ে দিলাম ক্যাথারিনের দিকে,

"নেমে এসো কিটি। অদ্ভুত লাগছে, অপূর্ব লাগছে!"

"ব্যাগদুটোর কী হবে?"

"ওখানেই থাক।"

নেমে এল ক্যাথারিন। দু'জনে দাঁড়িয়ে আছি সুইজারল্যান্ডের মাটিতে। ক্যাথারিন বলল,

"দারুণ, না?"

"চলো, ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাক।"

"কী চমৎকার দেশ, না! পায়ের নীচে এ-দেশের মাটি—কী আশ্চর্য লাগছে!"

"কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীরটা, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছে দেশটা। ভাবতে পারছ, আমরা সুইজারল্যান্ডে এসে গেছি? বুঝতে পারছ, ওই সাংঘাতিক দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি?"

"পারছি, সত্যি পারছি। এভাবে কোনও কিছু এর আগে কখনও অনুভব করিনি।"

"বাড়িগুলো দ্যাখো। কী চমৎকার চৌরাস্তা। ওই দেখো, ওইখানে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে পারব।"

বৃষ্টিটাও কী সুন্দর! এমন বৃষ্টি ইতালিতে কখনও দেখিনি। এখানকার বৃষ্টিতে খুশির আমেজ।

কাফের ভেতরে গিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন কাঠের টেবিলে বসলাম দু'জনে। বিচিত্র উত্তেজনা আমাদের মনে। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা একজন মেয়ে জিজ্ঞেস করল আমাদের কী চাই। ক্যাথারিন বলল, "রোল, জ্যাম আর কফি।" মেয়েটি বলল, "আমাদের এখানে রোল পাওয়া যাবে না, যুদ্ধের সময় তো।"

"রুটি?"

"টোস্ট করে দিচ্ছি।"

"আমার ডিমের ফ্রাই চাই।" আমি বললাম।

মেয়েটি বলল,

"ক'টা?"

"তিনটে।"

ক্যাথারিন বলল, "না না, চারটে নাও।"

"তাহলে চারটেই।"

চলে গেল মেয়েটি। টেবিলের ওপার থেকে চুমু দিলাম ক্যাথারিনকে। শক্ত করে ধরে আছি ওর হাত, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি দু'জনে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি কাফের চারদিকে।

"কী সুন্দর, না?"

"দারুণ!"

"রোল নেই তো কী হয়েছে!" ক্যাথারিন বলল, "অবশ্য সারা রাত এই রোল খাওয়ার কথাই ভেবেছি। তবে পাওয়া যায়নি বলে কোনও আক্ষেপ নেই।"

"শিগগিরই বোধহয় গ্রেপ্তার করবে আমাদের।"

"করলে করবে। আগে খেয়ে তো নিই। ভরা-পেটে ধরা পড়লে মন্দ লাগবে না। আর তা ছাড়া ওরা আমাদের কী-ই বা করবে! আমরা আমেরিকা আর ব্রিটেনের স্বাধীন নাগরিক, এবং খারাপ লোক নই।"

"তোমার তো একটা ছাড়পত্র আছে, না?"

"আছে। ওসব কথা থাক এখন। এখন একটু আনন্দে থাকো।"

বললাম, "এর চেয়ে বেশি আনন্দে থাকার শক্তি আমার নেই।"

একটা মোটা বেড়াল ল্যাজ তুলে আমাদের টেবিলের পাশে ঘুরছে—আমার পায়ে মাথা ঘসে আদর পাওয়ার ইচ্ছে। নিচু হয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়ে দিলাম। খুশিভরা মুখে ক্যাথারিন বলল,

"কফি এসে গেছে।"

ব্রেকফাস্টের পর গ্রেপ্তার করল আমাদের। খেয়ে উঠে ব্যাগদুটো নেওয়ার জন্যে নৌকোর কাছে গেছি, দেখি একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল,

"এই নৌকোটা আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"কোথা থেকে আসছেন?"

"লেকের ওপার থেকে।"

"আপনাদের একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

"ব্যাগগুলোর কী হবে?"

"সঙ্গে নিয়ে নিন।"

সৈন্যটিকে অনুসরণ করে শুল্ক-অফিসে চললাম। আমার হাতে দুটো ব্যাগ, পাশে ক্যাথারিন। শুল্ক-অফিসে রোগা চেহারার একজন লেফটেন্যান্ট আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল,

"আপনারা কোন্ দেশের লোক?"

"আমেরিকান আর ব্রিটিশ।"

"ছাড়পত্র দেখি।"

দু'জনেই ছাড়পত্র বের করে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করল,

"এভাবে নৌকোয় করে এখানে ঢুকেছেন কেন?"

উত্তর দিলাম, "আমি খেলাধুলোর ভক্ত। বিশেষত নৌকো বাওয়ার খুব শখ আমার। সুযোগ পেলেই একটু দাঁড় টেনে নিই।"

"এখানে এলেন কেন?"

"শীতের খেলাধুলোয় যোগ দেব বলে। আমরা নানান দেশে সফর করে বেড়াচ্ছি। এখন শীতের খেলাধুলোয় যোগ দিতে চাই।"

"এখানে শীতের খেলার কোনও জায়গা নেই।"

"তা জানি। যেখানে খেলা হয় সেখানে যেতে চাই।"

"ইতালিতে কী করছিলেন?"

"আমি স্থাপত্যবিদ্যার চর্চা করছিলাম আর ইনি ছবি আঁকা শিখছিলেন।"

"চলে এলেন কেন?"

"শীতের খেলাধুলোয় যোগ দেওয়ার জন্যে। যুদ্ধের ফলে স্থাপত্যবিদ্যা শেখার সুবিধে হল না।"

"আপনারা অনুগ্রহ করে এখানেই কিছুক্ষণ থাকুন।" আমাদের ছাড়পত্র দুটো নিয়ে ভেতরে চলে গেল লেফটেন্যান্ট। ক্যাথারিন বলল,

"দারুণ বলেছ। এভাবেই কথা চালিয়ে যেতে হবে। শীতের খেলাধুলোয় যোগ দিতে চাও তুমি।"

"ছবি আঁকার সম্বন্ধে কিছু জানো?"

ক্যাথারিন কয়েকজন ইতালিয়ান শিল্পীর নাম বলল। আমি বললাম,

"আপাতত ওতেই চলবে।"

খানিক পরে ছাড়পত্র দুটো হাতে নিয়ে ফিরে এসে লেফটেন্যান্ট বলল,

"আপনাদের লোকার্নো-তে যেতে হবে। এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি পাবেন। সঙ্গে অবশ্য একজন সৈনিক যাবে।"

আমি বললাম, "নৌকোটার কী হবে?"

"নৌকোটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আপনাদের ব্যাগে কী আছে?"

ব্যাগটা খুলে নাড়াচাড়া করে দেখে ব্র্যান্ডির বোতলটা বার করল। বললাম,

"আমার সঙ্গে একটু খান না।"

"না, ধন্যবাদ।" সোজা হয়ে দাঁড়াল সে,

"আপনার কাছে কত টাকা আছে?"

"আড়াই হাজার লিরে।"

টাকার অঙ্কটা শুনে আমার সম্বন্ধে ধারণাটা একটু উঁচু হল লোকটির। বলল,

"আপনার আত্মীয়ার কাছে কত আছে?" ওর কাছে বারোশো লিরের কিছু বেশি ছিল। লোকটি খুশি হল, তার ব্যবহারের রুক্ষতাও কমে গেল। বলল, "শীতের খেলাধুলোর পক্ষে ওয়েন্‌গেন্‌ খুব চমৎকার জায়গা। সেখানে আমার বাবার একটা সুন্দর হোটেল আছে, সব সময় খোলা থাকে।"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়।" বললাম আমি, "নামটা দেবেন?"

"একটা কার্ডে লিখে দিচ্ছি।"

খুব নম্রভাবে কার্ডটা আমার হাতে দিয়ে বলল,

"সৈনিকটি আপনাদের লোকার্নো-তে নিয়ে যাবে। আপনাদের ছাড়পত্র দুটো আপাতত ওর কাছেই থাকবে। এর জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু এটাই নিয়ম। তবে আশা করি তার বদলে লোকার্নো-তে আপনাদের একটা করে ভিসা কিংবা পুলিশের অনুমতিপত্র দেবে।"

সৈনিকটির হাতে ছাড়পত্র দুটো দিল সে। আমরা ব্যাগ হাতে তার পেছনে চললাম। পেছন থেকে সৈনিকটিকে ডাকল লেফটেন্যান্ট। জার্মান ভাষায় কী-যেন বলল তাকে। সে তার রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে আমার হাত থেকে ব্যাগদুটো নিয়ে নিল। লেফটেন্যান্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এসে একটা গাড়িতে চড়ে লোকার্নোয় চললাম।

লোকার্নোতে তেমন অসুবিধে হল না। ওরা অনেক প্রশ্ন করল, তবে খুব ভদ্র ও নম্রভাবে। কারণ আমাদের সঙ্গে ছাড়পত্র আছে আর টাকাও আছে। তবে আমাদের একটা কথাও ওরা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না, আর আমাদের গপ্পোটাও নিতান্তই শিশুসুলভ। কিন্তু এ-সবই আদালতের মতো ব্যাপার। যুক্তির দরকার নেই, আইনমাফিক হলেই হল। তবে নিজের কথাগুলো প্রতিবারই এক হওয়া চাই, তার জন্য কোনও কৈফিয়তের দরকার নেই। আমাদের ছাড়পত্র আছে, টাকা খরচ করতেও পিছ্‌পা নই। অতএব অস্থায়ী প্রবেশপত্র মিলল আর নির্দেশ

দেওয়া হল—যখনই যেখানে যাব, পুলিশকে খবর দিয়ে যাব। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে ওদের খুশিমতো যে-কোনও সময়ে এই প্রবেশপত্র ওরা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে।

যেখানে খুশি যাওয়া যাবে কিনা জানতে চেয়ে শুনলাম সেটা সম্ভব। কোথায় যাব জানতে চাইল ওরা। ক্যাথারিন বলল, মনত্রো যাবে। ওরা সেখানকার নানান খবর আমাদের জানিয়ে দিল, আর পৌঁছেই সেখানকার পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দিল। ওদের ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ক্যাথারিন বলল,

"ওহ্, এত দেরি হবে কে জানত!" কোচোয়ানকে একটা হোটেলের নাম বললাম—নামটা ওদের একজন কর্মচারী বলেছিল। কোচোয়ান ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল। ক্যাথারিন বলল, "সৈনিককে ভুলে গেলে যে।" সৈনিকটি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে একটা দশ লিরের নোট দিয়ে বললাম, "এখনও সুইস টাকা পাইনি, এটাই নাও।"

লোকটি ধন্যবাদ দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। আমরা হোটেলের পথ ধরলাম।

"মনত্রোর নামটা কোথায় পেলে? সত্যিই সেখানে যেতে চাও নাকি?" ক্যাথারিনকে বললাম।

ও বলল,

"ওই নামটাই মুখে এসে গেল। তা ছাড়া জায়গাটাও ভাল।"

"খুব ঘুম পাচ্ছে।"

"এখনই ঘুমিয়ে পড়ব।"

"এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে। সারা রাত খুব কষ্ট পেয়েছ।"

ক্যাথারিন বলল, "চমৎকার রাত কেটেছে, বিশেষ করে তুমি যখন ছাতার পাল উড়িয়েছিলে।"

"ভাবতে পারছ, আমরা সুইজারল্যান্ডে এসে পড়েছি?"

"না। খালি মনে হচ্ছে ঘুম ভেঙে দেখব কিছুই সত্যি নয়, স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"সত্যিই আমরা সুইজারল্যান্ডে, তাই না? এমন তো নয় যে গাড়ি করে তোমায় মিলান স্টেশনে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি?"

"না বোধহয়।"

"অমন করে বোলো না। আমার ভয় করে। কে জানে তাই যাচ্ছি কিনা!"

"জানি না, মাথাটা ঠিক পরিষ্কার নেই, কেমন যেন নেশার মতো লাগছে।"

"তোমার হাতটা দেখি?"

হাত বাড়িয়ে দিলাম—দুটো হাতই ফোস্‌কায় ভর্তি।

ক্যাথারিন বলল, "বেচারা।"

"ওগুলো ছুঁয়ো না। ঈশ্বর জানেন কোথায় আছি আর কোথায় চলেছি। এই কোচোয়ান, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

কোচোয়ান গাড়ি থামিয়ে বলল,

"হোটেল মেট্রোপোল। আপনি তো তাই বললেন?"

"হ্যাঁ।" ক্যাথারিনকে বললাম, "ঠিকই যাচ্ছি।"

"সব ঠিকই আছে। দুশ্চিন্তা কোরো না। এক্ষুনি আমরা ভাল করে ঘুমোতে পারব। কালকে আর নেশা-নেশা লাগবে না।"

"ভীষণ নেশার মতো লাগছে। খিদে পেয়েছে বোধহয়।"

"না। আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঠিক হয়ে যাবে।"

গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। কে-একজন ব্যাগ নিতে বাইরে এল। ক্যাথারিনকে বললাম,

"আমি ঠিক আছি।"

দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম। ও বলল,

"আসলে খুব ক্লান্ত আছ তো, কত ঘণ্টা ঘুমোতে পাওনি!"

"যাকগে, এসে তো পড়েছি।"

"হ্যাঁ, সত্যি—সুইজারল্যান্ডে এসে পড়েছি।" ব্যাগ নিয়ে বেয়ারা চলেছে, তার পেছনে পেছনে হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম আমরা।

পঞ্চম অধ্যায়

সেবার বছরের শেষে তুষার পড়তে অনেক দেরি হল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পাইন গাছের আড়ালে একটা কাঠের বাড়িতে আছি আমরা। রাত্তিরে কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ, ভোরবেলা জলের ওপর পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ে। ভোরে গৃহকর্ত্রী মিসেস গাটিনজেন এসে ঘরের জানলা বন্ধ করে, আর লম্বা চিনেমাটির স্টোভে আগুন জ্বালিয়ে দেয়—শুকনো পাইন কাঠের গন্‌গনে আগুন। তারপর আসে গরম জল। ঘরটা যখন বেশ গরম হয়ে ওঠে, তখন প্রাতরাশ। বিছানায় বসে খাই দু'জনে, আর দূরের লোকজন দেখি। চোখে পড়ে লেকের ওপারে ফরাসি এলাকায় লেকের ধারে সার-সার পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় সাদা তুষার। লেকের শান্ত জল ঘন নীল।

চওড়া কার্নিশ-দেওয়া আমাদের ছোট্ট কাঠের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। জমাট-বাঁধা শিশিরে কঠিন হয়ে আছে পাহাড়ি রাস্তাটা। পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে দূরের উপত্যকায় মাঠ, খামার আর কাঠের বসতবাড়িগুলোর দিকে। একপাশে অনেক নীচে উপত্যকার বুক চিরে সরু একটা নদী গিয়ে হ্রদে মিশেছে। যখন উপত্যকার ওপর দিয়ে শীতের বাতাস বয়ে যায়, ঢেউ জাগে নদীর বুকে, পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে শব্দ তোলে নদীর জল।

পাহাড়ি পথ বেয়ে পাইন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াই দু'জনে। বনের মাটি নরম আছে, রাস্তার মতো কঠিন হয়ে যায়নি। তবে কঠিন পথেও অসুবিধে কিছু নেই, আমাদের পায়ে আছে পাহাড়ি-পথে-চলার কাঁটা-লাগানো জুতো। তবু পাইন বনের নরম মাটিতে বেড়াতেই বেশি ভাল লাগে।

বাড়িটার সামনের দিকে গোল বারান্দায় বসে থাকি দু'জনে। বিশাল পাহাড়টা সামনে দিয়ে খাড়া নেমে গিয়ে হ্রদের পাশের ছোট্ট সমভূমিতে মিশেছে, আর পাহাড়ের গা বেয়ে পথটা ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পাশের নিচু পাহাড়টার বুকে। রাস্তার ধারে ধারে আঙুরের খেত, শীতের প্রকোপে শুকিয়ে গেছে আঙুরলতা, শুধু জমির নিশানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দেওয়ালগুলো। নীচের সঙ্কীর্ণ সমভূমিতে লেকের ধারে শহরের বাড়িগুলো চোখে পড়ে। লেকের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। শীতের রোদে আরাম করে বারান্দায় বসে থাকি আমরা দু'জন।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে বারান্দায় বসেই লাঞ্চ খাই, না হলে খেতে যাই ওপরের একটা ছোট ঘরে—তার দেওয়ালগুলো কাঠের। ঘরের এক কোণে বিরাট

একটা স্টোভ। শহর থেকে অনেক বই আর পত্রিকা কিনে এনেছি। শিখে নিয়েছি তাস নিয়ে দু'জনের অনেকগুলো খেলা। এই ছোট ঘরটাতেই অনেকটা সময় থাকি। দুটো আরামকেদারা আর একটা বইপত্র রাখার টেবিল আছে ঘরে। খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেলে সেখানে বসে তাস খেলি আমরা। গাটিনজেন দম্পতি থাকে নীচের তলায়। মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসে। ওরা দু'জনেও খুব সুখী। একটা হোটেলে কাজ করত দু'জনেই, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে এই বাড়িটা কিনেছে। একটি ছেলে আছে ওদের, জুরিখের এক হোটেলে কাজ শিখছে সে। বাড়ির নীচের তলায় একটা মদের দোকান করেছে গাটিনজেনরা। মাঝে মাঝে সেখানে খদ্দের আসে, ওপর থেকে তাদের সাড়া পাই সন্ধের দিকে।

আমাদের ঘরের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য ঘরের বাইরের বারান্দায় বিস্তর কাঠ জড়ো করা আছে। বেশি রাত জাগি না আমরা। অন্ধকার হলেই শোবার ঘরে চলে যাই। শোবার আগে অন্ধকার ঘরে জানলাটা খুলে একটু দাঁড়াই। বাইরে শীতের নিস্তব্ধ রাত, আকাশ-ভরা তারা, নীচে পাইন বনের ভেতরে বাতাসের চলাচল। বিছানায় শুয়ে পড়ি —নরম বিছানায় নিশ্চিন্ত আরাম, বাইরে পরিষ্কার রাত। যুদ্ধ আজ অনেক দূরে, কিন্তু বন্ধ যে হয়নি তা জানতে পারি কাগজ পড়ে। তুষারপাত শুরু হয়নি বলে পাহাড়ের ওপর এখনও যুদ্ধ চলছে।

মাঝেমধ্যে পাহাড়ি পথ বেয়ে নেমে যাই মনত্রো-তে। সেখানে শুধু একজনকে চিনি, সে ক্যাথারিনের কেশবিন্যাসকারিণী। ক্যাথারিন তার দোকানে যায়, আমি একটা কাফেতে ঢুকে এক মগ বিয়ার নিয়ে বসি আর কাগজ পড়ি, তারপর সেই দোকানে যাই। বাইরে বসে দেখি ওর দীর্ঘ কেশে বিন্যাসের বাহার, মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখি ওর সোনালি চুলে দক্ষ হাতের নিপুণ স্পর্শ। দোকানের মেয়েটি লক্ষ করে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি। বলে,

"আপনার ভাল লাগছে?"

উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

পথে বেরিয়ে পড়ি দু'জনে, শীতের হাওয়া বয়ে যায় আমাদের ওপর দিয়ে। ক্যাথারিনকে বললাম,

"ভীষণ ভালবাসি তোমায়, রানি আমার!"

"কী চমৎকার দিন কাটছে আমাদের!"

ক্যাথারিন বলল, "শোনো, চা না খেয়ে একটু বিয়ার খাই বরং। তাতে আমাদের ছোট্ট ক্যাথারিনের পক্ষে ভাল হবে, বেশি বাড়বে না।"

আমি বললাম, "ছোট্ট ক্যাথারিন—দুষ্টুটা।"

"না না, ও খুব ভাল। আমাকে কোনও কষ্ট দেয় না। ডাক্তার বলেছে বিয়ার খেলে আমার শরীরের উপকার হবে আর বাচ্চাটাও ছোট থাকবে।"

"খুব করে বিয়ার খাও। তাহলে ওটা ছেলে হলে বড় হয়ে রেসের ঘোড়ার জকি হতে পারবে।"

ক্যাথারিন বলল,

"দ্যাখো, আমার মনে হয়, বাচ্চাটার জন্যেই আমাদের বিয়েটা করে ফেলা ভাল।" কাফের এক কোণে টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছিলাম। বেলা পড়ে আসছে, আকাশে গোধূলির ছোঁয়া। বললাম,

"চলো, এক্ষুনি বিয়ে করব।"

ক্যাথারিন বলল, "না, এখন বিয়ে করতে আমার লজ্জা করবে। আমাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় আজকাল। এইভাবে এদেশের কারও সামনে বিয়ের জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।"

"বিয়েটা হয়ে গেলেই কিন্তু ভাল হত।"

"সেটা আমিও বুঝি। তবে এরকম গিন্নির মতো চেহারা নিয়ে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।"

"কিচ্ছু গিন্নির মতো চেহারা হয়নি।"

হয়েছে। চুল বাঁধার দোকানে মেয়েটি জিজ্ঞেস করছিল—এটা আমার প্রথম কিনা। আমি বানিয়ে বানিয়ে বলে দিয়েছি আরও দুটো ছেলে দুটো মেয়ে আছে আমাদের।"

"তাহলে কবে আমাদের বিয়েটা হবে?"

"আবার যখন হালকা হয়ে যাব, তখন। আমার ইচ্ছে বিয়েটা বেশ ধুমধাম করে হবে, লোকে বলবে—চমৎকার জোড় মিলেছে।"

"তোমার কোনও দুশ্চিন্তা হয় না?"

"কেন আমার চিন্তা হবে? আমার শুধু একবারই খারাপ লেগেছিল—মিলানের সেই হোটেলে, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। আর তা-ও শুধু ঘরের সাজসজ্জার জন্যে। আমি কি তোমার মনের মতো স্ত্রী হতে পারিনি?"

"আমার মিষ্টি বউ!"

"তাহলে আর আইনকানুন নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আবার আগের চেহারা ফিরে পেলেই বিয়েটা করে নেব আমরা।"

"বেশ, তাই হবে।"

"আর-একটু বিয়ার কি খাব? ডাক্তার বলছিল আমার কোমরের মাপটা সরু, তাই ছোট্ট ক্যাথারিন যত ছোট থাকে ততই ভাল।"

"আর কী বলেছে ডাক্তার?" আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"তেমন কিছু না। বলল, আমার রক্তের চাপ খুব ভাল আছে।"

"তোমার কোমরের মাপের কথা কী বলেছে?"

"কিছু না, কিছু না। বলেছে স্কি করতে পারব না।"

"ঠিকই বলেছে।"

"ডাক্তারটি খুব ভাল। ওকেই ডাকব সে-সময়।"

"ওকে জিজ্ঞেস করেছিলে, বিয়ে করা দরকার কিনা?"

"না। আমি বলেছি চার বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। দ্যাখো, তোমাকে বিয়ে করলেই আমি আমেরিকান হয়ে যাব। আর যখনই বিয়ে করি না কেন, আমেরিকান আইন অনুযায়ী বাচ্চাটা আমাদের বৈধ সন্তানই হবে।"

"এ আবার তুমি কোথায় পেলে?"

"লাইব্রেরিতে, বইপত্র ঘেঁটে।"

"আশ্চর্য মেয়ে তুমি!"

ক্যাথারিন বসে বসে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানোর কথা বলছে। নায়েগ্রা প্রপাত দেখতে যাবে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে যাবে, গোল্ডেন গেটে যাওয়ারও ইচ্ছে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে হল—পাহাড়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে। সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে এলাম দু'জনে। ইলেকট্রিক ট্রেনের কামরায় জানলার ধারে বসে বললাম,

"ক্লান্ত লাগছে, কিটি?"

"না না, খুব ভাল লাগছে।"

"অনেকটা রাস্তা, না?"

"তা হোক, আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না, আমি খুব ভাল আছি।"

বড়দিনের তিনদিন আগে শুরু হল তুষারপাত। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি তুষার পড়ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখছি জানলার বাইরে তুষার পড়ছে। ঘরের কোণে ফায়ারপ্লেসে গন্‌গনে আগুন। বাইরে প্রচণ্ড তুষার-ঝড় চলছে। মিসেস গাটিনজেন ব্রেকফাস্ট ট্রে নিতে এসে বলল, মাঝরাত থেকে নাকি ঝড়টা শুরু হয়েছে। জানলায় দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তার ওপারে কিছুই দেখতে পেলাম না—তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড তুষার-বৃষ্টি। ফিরে গিয়ে ক্যাথারিনের পাশে শুয়ে পড়লাম। ও বলল,

"আমার খুব ইচ্ছে করে স্কি করতে। এই বরফে স্কি করতে না পারলে খুব খারাপ লাগে!"

"আমরা একটা ববস্লেড নিয়ে বরফের রাস্তা দিয়ে নেমে যাব। তাতে গাড়ির চেয়ে বেশি ঝাঁকুনি লাগবে না, আর স্কি করার আনন্দও কিছুটা পাবে।"

"বেশি উঁচু-নিচু হবে না?"

"দেখাই যাক না। এখন একটু পরে বেরিয়ে গিয়ে বরফের ওপর হেঁটে আসব।"

বরফের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু বেশি দূর যাওয়া গেল না। প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে তীক্ষ্ণ তুষারের কণা। খানিক পরেই ফিরে এলাম।

লাঞ্চের পর ছোট ঘরটায় বসে জানলা দিয়ে দেখছি তুষারের রাশি নেমে আসছে। ক্যাথারিন বলল,

"তোমার একা-একা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না? অন্যদের সঙ্গে স্কি করতে, আমোদ করতে ইচ্ছে করে না?"

"না। কেন করবে?"

"মাঝেমাঝে মনে হয়, তোমার হয়তো অন্যদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে।"

"তুমি কি অন্যদের সঙ্গে মিশতে চাও?"

"নাঃ।"

"আমিও চাই না।"

"তা জানি। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। আমার বাচ্চা হবে, কাজেই আমার কিছু করার নেই, এভাবেই খুশি থাকতে হবে। তাছাড়া আজকাল খুব বোকা-বোকা কথা বলি, বেশি বকি। তাই মনে হয় একটু একলা ঘোরাফেরা করলে আমার সঙ্গটা তোমার আর ক্লান্তিকর মনে হবে না।"

"তুমি কি চাও আমি চলে যাই?"

"না, না, আমি চাই তুমি থাকো।"

"আমি তাই থাকব।"

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্যাথারিন বলল,

"আচ্ছা, তুমি দাড়ি রাখলে কেমন হয়?"

"তুমি চাও?"

"মন্দ হত না, দাড়িতে তোমায় কেমন দেখায় দেখতাম।"

"বেশ, তাহলে এখন থেকেই দাড়ি রাখব। এটা ভাল বলেছ, একটা অন্তত কাজ পাওয়া গেল।"

"কিছু করার নেই বলে খুব অস্বস্তি হয় তোমার?"

"আমার দিব্যি লাগে। চমৎকার জীবন আমাদের। তোমার কি মনে হয়?"

"আমারও দারুণ লাগছে। তবে ভয় হয় আমার এই বিশাল চেহারায় হয়তো তোমার বিরক্তি এসে গেছে।"

"মিষ্টি কিটি আমার, তুমি তো জানো আমি তোমায় পাগলের মতো ভালবাসি!"

"এই চেহারাতেও?"

"ঠিক যেমন আছ তেমনি। দিনগুলো খুব সুন্দর কাটছে আমাদের, তাই না?"

"আমার তো ভাল কাটছেই। মনে হয়, তুমি হয়তো একটু অস্থির হয়ে পড়েছ।"

"না। মাঝেমাঝে যুদ্ধের কথা মনে হয়, ওখানকার পরিচিত মানুষদের কথা মনে পড়ে, তবে কোনও দুশ্চিন্তা হয় না।"

"কাদের কথা ভাবো?"

"রিনাল্‌দির কথা, পাদ্রির কথা, আরও অনেক চেনাশোনা লোকের কথা। তবে খুব বেশি ভাবি না। আর যুদ্ধের কথা একেবারেই ভাবতে চাই না—ও-পাট চুকিয়ে দিয়েছি আমি।"

"এখন কী ভাবছ?"

"কিচ্ছু না।"

"হ্যাঁ, ভাবছ। বলো না, কী ভাবছ?"

"ভাবছিলাম, রিনাল্‌দির কি সত্যিই সিফিলিস হয়েছিল?"

"শুধু এই?"

"হ্যাঁ।"

"সিফিলিস ছিল নাকি?"

"জানি না।"

"ভাগ্যিস তোমার নেই। এরকম কোনও অসুখ তোমার কখনও হয়েছে?"

"গনোরিয়া হয়েছিল।"

"ও আমি শুনতে চাই না। হ্যাঁ গো, খুব কষ্ট হত?"

"ভীষণ।"

"ভাবছি আমার যদি হত!"

"না না, ছিঃ।"

"আমারও যদি হত, তাহলে তোমার কষ্টটা বুঝতে পারতাম। আমার মনে হয়, তুমি যখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছ তখন আমিও যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে আজ তাদের কথা নিয়ে মজা করতে পারতাম।"

"আহা, কী দারুণ দৃশ্য!"

"তোমার গনোরিয়া হওয়াটাও দারুণ কিছু নয়।"

"তা জানি। কী সুন্দর বরফ পড়ছে দ্যাখো।"

"তার চেয়ে আমি তোমাকে দেখব। তুমি তোমার মাথার চুলটা একটু বড় করো না কেন?"

"কত বড়?"

"এই আর-একটু বড়।"

"এখনই কি কম বড় আছে?"

"না, আর একটু বাড়তে দাও, আর আমারটা আমি কেটে ছোট করে ফেলব। তাহলে আমাদের দেখতে অনেকটা এক রকম লাগবে—শুধু একজনের সোনালি চুল আর অন্যজনের কালো।"

"তোমার চুল আমি কাটতে দেব না।"

"খুব মজা হবে গো! এত বড় চুল নিয়ে আমি নাজেহাল হয়ে পড়েছি। রাতে বিছানায় শুতে বেশ অসুবিধে হয়।"

"আমার ভাল লাগে।"

"ছোট হলে ভাল লাগবে না?"

"হয়তো লাগবে, কিন্তু এখন যেমন আছে এই ভাল।"

"ছোট করে কাটলে আরও ভাল লাগতে পারে, তখন আমরা দু'জনে দেখতে এক রকম হয়ে যাব। খুব ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে।"

"মিশেই তো গেছো তুমি। আমরা দু'জনে এক দেহ এক প্রাণ।"

"তা জানি। রাতের বেলায় এক হয়ে যাই আমরা।"

"রাতগুলো অপূর্ব।"

"আমি চাই আমরা পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যাই। তুমি অন্য কোথাও যাও সেটা আমি একেবারেই চাই না, ওটা একটা কথার কথা বলেছি। আর যদি যেতে চাও তাহলে তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো। তুমি কাছে না থাকলে মনে হয় আমি যেন আর বেঁচে নেই।"

বললাম, "আমি তোমাকে ফেলে কখনও কোথাও যাব না। তুমি না থাকলে আমারও সব শূন্য হয়ে যায়, জীবনের আর কোনও অর্থই থাকে না।"

"আমি চাই তোমার জীবনটা খুব সুন্দর হোক, কিন্তু সে-জীবন হবে আমাদের দু'জনের।"

রাতে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারলাম, ক্যাথারিনও জেগে রয়েছে। আকাশভরা জ্যোৎস্না, সেই জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে ঘর, বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। তার ওপর জানলার গরাদের ছায়ার কালো-কালো ডোরা। ক্যাথারিন বলল,

"জেগে আছ?"

"হ্যাঁ। তোমার ঘুম আসছে না?"

"আমার এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। ভাবছিলাম প্রথম তোমাকে দেখে আমি কেমন পাগলের মতো আচরণ করেছিলাম। তোমার মনে আছে?"

"একটু পাগলামি করেছিলে বটে।"

"আর কখনও করিনি কিন্তু। এখন আর কোনও পাগলামি নেই আমার। এখন আমি ভীষণ সুখী। এ-সুখের কোনও অন্ত নেই।"

"ঘুমিয়ে পড়ো।"

"এসো একসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি দু'জনে।"

"বেশ।"

তখনই কিন্তু ঘুম এল না। অনেকক্ষণ জেগে থেকে নানা কথা ভাবলাম আর চেয়ে চেয়ে দেখলাম ক্যাথারিনের ঘুমন্ত মুখটা। মুখের ওপর চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই আশ্চর্য রূপ দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি নাগাদ চমৎকার ঠান্ডা পড়ল, পথঘাট বরফে জমে কঠিন হয়ে গেল। সে-পথে হাঁটতে আর কোনও অসুবিধে নেই। পথ বেয়ে আসে খড়-বোঝাই গাড়ি, আসে কাঠের গাড়ি, চাকাহীন বরফে চলা স্লেজ। তাদের দু'পাশে বরফ জমে শক্ত হয়ে আছে। সারা দেশটাই ঢেকে গেছে তুষারে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তুষার নেমে গেছে মনত্রো পর্যন্ত, হ্রদের ওপারে পাহাড়গুলো ঢেকে গেছে সাদা তুষারে, ঢেকে গেছে রোন উপত্যকার সমভূমি।

পাহাড়ের ওপাশে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে আসি দু'জনে। ক্যাথারিনের পায়ে বরফে চলার কাঁটা-লাগানো জুতো, গায়ে একটা কেপ্। কেপ্টা থাকায় ওর শরীরের পরিবর্তন তেমন বোঝা যায় না। আস্তে আস্তে হাঁটি আমরা, ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে রাস্তার ধারে কোনও গাছের গুঁড়ির ওপরে বসে বিশ্রাম নিই।

বনের পথে দু'-একটা শেয়াল চোখে পড়ে। ক্যাথারিন বলল, "শেয়ালগুলোকে আমার খুব ভাল লাগে। কেমন চমৎকার মোটা ল্যাজ!"

"শোবার সময় ল্যাজটা গায়ে জড়িয়ে শোয়, ফলে ওদের শীত করে না।"

"আমাদের ওইরকম একটা ল্যাজ থাকলে বেশ হত, না?"

"জামাকাপড় পরতে খুব ঝামেলা হত।"

"অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিতাম। কিংবা এমন কোনও দেশে থাকতাম যেখানে ওরকম পোশাক পরলেও কিছু যায়-আসে না।"

"এ-ই তো সেই দেশ।" আমি বললাম।

ক্যাথারিন বলল, "এখানে পরিচিত কেউ নেই বলে বেশি ভাল লাগে জায়গাটা। তোমার ইচ্ছে করে পরিচিত কাউকে দেখতে?"

"নাঃ।"

"এখানে একটু বসা যাক, ক্লান্ত লাগছে।" পাশাপাশি কাঠের ওপর বসে আছি দু'জনে, সামনে দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে দূরে বনের মধ্যে।

ক্যাথারিন বলল, "ছোট্ট ক্যাথারিন মাঝখানে এসে পড়ে আমাদের দু'জনকে পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না তো?"

"না, আমরা সেটা হতে দেব কেন?"

"টাকাপয়সা আর কত আছে?"

"অনেক আছে। শেষের হুন্ডিটা ভাঙিয়েছি।"

"তোমার বাড়ির লোকেরা যখন জানবে তুমি সুইজারল্যান্ডে আছ, তখন তোমাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না?"

"করতেও পারে। কিছু একটা লিখে দিতে হবে ওদের।"

"এখনও লেখোনি?"

"না, শুধু হুন্ডির কথাটা লিখেছি।"

"ভাগ্যিস আমি তোমার বাড়ির লোক নই! তাহলে ওদের মতো আমাকেও এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হত।"

"একটা তার করে দেব ওদের।"

"ওদের জন্যে তোমার মন কেমন করে না?"

"করত, কিন্তু এত ঝগড়া হয়েছে যে মনের ব্যাপারটা এখন প্রায় চাপা পড়ে গেছে।"

"আমার মনে হয়, ওদের সঙ্গে আমার ঠিক বনিবনা হয়ে যাবে। ওদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।"

"ও-সব কথা থাক, নইলে আবার ওদের জন্যে ভাবতে শুরু করব।" একটু পরে বললাম, "তোমার বিশ্রাম নেওয়া হয়ে গিয়ে থাকলে ওঠা যাক চলো।"

"হয়ে গেছে।"

উতরাই বেয়ে নেমে এলাম দু'জনে। অন্ধকার হয়ে গেছে। জুতোর চাপে মচমচ করে উঠছে কঠিন বরফ। হিমশীতল রাত, মেঘহীন আকাশ। পরিষ্কার শুকনো পরিবেশ।

ক্যাথারিন বলল, "আমার মাথার চুল আমি এখন কাটব না—যা গিন্নি-গিন্নি চেহারা হয়েছে। ছোট্ট ক্যাথারিনের জন্মের পর আবার যখন রোগা হয়ে যাব, তখন চুল কেটে ছোট করে ফেলব। তখন আমাকে তোমার একেবারে নতুন মনে হবে। একদিন দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে চুলটা কেটে আসব, কিংবা না বলেই একদিন বেরিয়ে গিয়ে চুল কেটে এসে তোমাকে চমকে দেব।"

আমি উত্তর দিলাম না। ও আবার বলল, "তুমি বাধা দেবে না তো?"

"না, ভালই লাগবে মনে হচ্ছে।"

"তুমি খুব ভাল। চুল কেটে হয়তো আমাকে আরও সুন্দর দেখাবে। তখন সব দিক থেকে আমাকে তোমার নতুন মনে হবে—আবার সেই নতুন আমার প্রেমে পড়বে তুমি।"

"ওহ্, কী সাংঘাতিক! এখনই কি তোমাকে কম ভালবাসি! তোমার মতলবটা কী—আমাকে একেবারে নিঃশেষ না করে ছাড়বে না?"

"হ্যাঁ, একদম শেষ করে ফেলব তোমায়।"

"বেশ, বেশ, আমিও তাই চাই।"

জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসের শীতের আচ্ছাদনে আনন্দে দিন কেটে চলল আমাদের। মাঝে মাঝে একটানা ঠান্ডায় ছেদ পড়ে, কোথা থেকে যেন উষ্ণ বাতাস বসন্তের আমেজ বয়ে আনে, তুষারের কাঠিন্য নরম হয়ে আসতে চায়। আবার শুরু হয় ঠান্ডা বাতাস, ফিরে আসে তুষারের কাঠিন্য, দেখা যায় শীতের পরিবেশ।

মার্চ মাসে প্রথম ভাঙন ধরল। সারা রাত একটানা বৃষ্টি, সারাটা সকালেও সে-বৃষ্টি থামল না। কঠিন তুষার গলে নরম হয়ে গেল। পাহাড়ের চারপাশে বিষাদী অন্ধকার। হ্রদের ওপর উপত্যকার বুকে মেঘ জমেছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় ঘন বৃষ্টি।

রবারের জুতো পায়ে, ছাতার নীচে মাথা ঢুকিয়ে ক্যাথারিন আর আমি চলেছি স্টেশনের দিকে—বর্ষার নরম পিছল তুষারের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে। বৃষ্টির স্রোতে ভেসে চলেছে পথের নরম বরফের কাদা।

পথের ধারে একটা কাফেতে ঢুকলাম দু'জনে, লাঞ্চের আগে একটু ভার্মুথ খেয়ে নেওয়ার জন্য। বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে।

আমি বললাম, "তোমার কি মনে হয় আমাদের এখন শহরে চলে যাওয়া উচিত?"

ও বলল, "তুমি কী বলো?"

"শীত যদি শেষ হয়ে যায় আর এইভাবে বৃষ্টি চলতে থাকে, তাহলে এখানে আর ভাল লাগবে না। তা ছাড়া আমাদের ছোট্ট ক্যাথারিনের আসতে আর কত দেরি?"

"প্রায় মাস খানেক, একটু বেশিও হতে পারে।"

"আমরা এখন মন্ত্রোয় গিয়ে থাকতে পারি।"

"লসানে-তে গেলে কেমন হয়? হাসপাতালটাও ওখানেই।"

"তাই যাওয়া যাক। আমি ভাবছিলাম ওটা অনেক বড় শহর।"

"বড় শহরেও এরকম আলাদা থাকা যেতে পারে, আর জায়গাটাও ভালই হবে মনে হয়।"

"কবে যাব?"

"সে আমি জানি না। তুমি যখন যেতে চাইবে তখনই। তুমি যেতে না চাইলে আমিও যাব না।"

"আকাশের হাল কেমন হয় দেখা যাক।"

তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলল। পাহাড়ের ওপরে জমা সমস্ত বরফ বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল। তুষার-গলা জল আর কাদার স্রোতে পিছল হয়ে গেছে পথ, হাঁটা যায় না। তৃতীয় দিন সকালে শহরে নেমে যাওয়াই ঠিক করলাম।

গাটিনজেন বলল, "ঠিক আছে মিস্টার হেনরি, এর জন্যে আর আপনাকে আগে থেকে জানান্ দিতে হবে না। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে, এর মধ্যে যে আপনি থাকতে চাইবেন না, সে আমি জানি।"

"আমার স্ত্রীর জন্যে আমাদের এখন হাসপাতালের কাছাকাছি থাকতে হবে।"

"তা তো হবেই। এর পরে বাচ্চাকে নিয়ে আবার আসবেন তো?"

"তোমাদের এখানে জায়গা থাকলে নিশ্চয়ই আসব।"

"বসন্তের সময় এ-জায়গাটা খুব চমৎকার থাকে, তখন এলে খুব ভাল লাগবে আপনাদের। আমাদের ওই তালা-দেওয়া বড় ঘরটা খুলে দেব, তাতে বাচ্চা আর নার্স থাকবে, আর আপনারা এখন যে-ঘরটায় আছেন, সেটাতেই থাকবেন।"

"আসার আগে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।"

জিনিসপত্র গোছগাছ করে লাঞ্চের পর ট্রেন ধরলাম। গাটিনজেন দম্পতি স্টেশনে তুলে দিতে এল। একটা স্লেজে করে আমাদের জিনিসপত্র তুষার-পিছল রাস্তা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল গাটিনজেন নিজেই। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিদায় জানাল আমাদের।

"খুব ভাল লোক ওরা।" ক্যাথারিন বলল।

"ব্যবহারটা সত্যিই খুব ভাল।" বললাম আমি।

ট্রেন চলেছে মন্‌ট্রো থেকে লসানে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। পেছনে ফেলে-আসা দেশটার কিছুই চোখে পড়ছে না, মেঘের আড়ালে ঢেকে গেছে পাহাড়। দ্রুত ছুটে চলেছে ট্রেন—একপাশে গভীর বিস্তীর্ণ হ্রদ, অন্য পাশে বৃষ্টি-ভেজা পিঙ্গল প্রান্তর, শূন্য অরণ্য আর ছোট ছোট বাড়ি।

লসানে স্টেশনে নেমে মাঝারি গোছের একটা হোটেলে গেলাম। শহরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। হোটেলের দারোয়ানের কোমরে চকচকে পেতলের চাবি, লিফট, মেঝেতে বিছোনো নরম কার্পেট, ঝকঝকে সাদা মুখ-ধোয়ার বেসিন, চকচকে পেতলের খাটে কোমল বিছানা, বিশাল ঘরের পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জা—গাটিনজেনের হোটেলের পর এ যেন এক রাজকীয় পরিবেশ। জানলার বাইরে বৃষ্টির জলে ভেজা একটা বাগান চোখে পড়ে। তার চারপাশে ঘেরা দেওয়াল। দেওয়ালের ওপর লোহার রেলিং। রাস্তাটা নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তার ওপারেও ঠিক এরকমই একটা হোটেল। সেখানেও একটা দেওয়াল-ঘেরা বাগান। জানলা দিয়ে দেখছি, বাগানের ফোয়ারার জলে বৃষ্টি পড়ছে।

ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে জিনিসপত্র বার করছে ক্যাথারিন। হুইস্কি আর সোডা আনতে বলে, বিছানায় শুয়ে স্টেশনে কেনা খবরের কাগজ পড়ছি—১৯১৮ সালের মার্চ মাস, জার্মানরা এখন ফ্রান্স আক্রমণ করেছে। হুইস্কি-সোডা খাচ্ছি আর খবর পড়ছি। সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে ক্যাথারিন। বলল, "এখন আমাকে কী জোগাড় করতে হবে জানো?"

"কী?"

"বাচ্চার জামাকাপড়। আমার মতো অবস্থায় এত দেরি অবধি বাচ্চার জামাকাপড়ের ব্যবস্থা না করে কেউ থাকে না।"

"কিনে নিলেই তো হয়।"

"তা তো হয়ই। কালই কিনব। একটু খোঁজ নিতে হবে কী কী চাই।"

"তুমি নার্স, সে-সব তো তোমার জানা থাকা উচিত।"

"হাসপাতালে সৈনিকদের ছেলেপুলে কমই হয়।'

"আমার তো হয়েছে।"

ক্যাথারিন আমাকে বালিশ ছুঁড়ে মারল। গেলাসের পানীয় উল্টে গেল। বলল, "এই রে, সব পড়ে গেল, আর এক গেলাস আনতে বলে দিই।"

"বেশি ছিল না। শোবে এসো।"

"না, এখন ঘর গোছাচ্ছি। এটাকে একটু দাঁড় করাতে হবে তো।"

"কেমন দাঁড় করাতে চাও?"

"নিজেদের বাড়ির মতো।"

"মিত্রশক্তির পতাকা উড়িয়ে দাও।"

"অ্যাই, চোপ্।"

"আবার বলো।"

"চোপ্।"

"এত ভয়, যেন চটাতে চাও না কাউকে!"

"চাই না-ই তো।"

"তাহলে এখানে এসো।"

"আসছি।"

বিছানায় এসে বসে বলল, "আমি জানি আমাকে নিয়ে তুমি আর আনন্দ পাও না, একটা ময়দার বস্তার মতো দেখতে হয়ে গেছি।"

"একদম নয়। তুমি আমরা অপরূপা বউ।"

"আমি আবার রোগা হয়ে যাব, দেখো।"

"এখনই তো রোগা আছ।"

"নেশা করেছ নাকি?"

"সামান্য।"

ওই হোটেলে আরও তিন সপ্তাহ থাকলাম। ভালই লাগল থাকতে—খাবার ঘরে লোকের ভিড় নেই। রাত্তির বেলা সাধারণত নিজেদের ঘরেই খাই। শহরে বেড়াতে যাই। মাঝেমধ্যে ট্রেনে চড়ে উচি-তে হ্রদের ধারে বেড়িয়ে আসি। বেশ গরম পড়ে গেল। প্রায় বসন্তের মতো আবহাওয়া—মনে হল এখন পাহাড়ে চলে গেলেই ভাল হত। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই শীতের শেষের স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডাটা আবার ফিরে এল।

বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই জোগাড় করে ফেলেছে ক্যাথারিন। সকালে ক্যাথারিন অনেকটা বেলা অবধি বিছানায় শুয়ে থাকে, আমি একটা আখড়ায় ব্যায়াম করতে যাই। নকল বসন্তের ক'টা দিন বেশ কাটল। ব্যায়ামের পর স্নান করে হেঁটে ফিরি, পথের ধারে কাফেতে বসে ভার্মুথ খাই, কাগজ পড়ি, আর লোকজনের যাতায়াত দেখি।

বসন্তের বাতাসের উষ্ণ আবেশ আর সৌরভ সর্বাঙ্গে নিয়ে ফিরে যাই ক্যাথারিনের কাছে। লাঞ্চ খাই একসঙ্গে।

মাঝেমধ্যে একটা গাড়ি করে চলে যাই গ্রামের দিকে। পরিষ্কার দিনগুলোতে এভাবে বেড়াতে বড় ভাল লাগে। মনের মতো দু'টো জায়গা বেছে নিয়েছি—খাওয়ার আর বেড়াবার। ক্যাথারিন আজকাল আর বেশি হাঁটতে পারে না। ওকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বেড়াতে ভীষণ ভাল লাগে। চমৎকার কাটছে দিনগুলো। এক মুহূর্তও বিরতি নেই এ-আনন্দের। টের পাচ্ছি শিশুটি প্রতিদিন দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে আমাদের, আর তাই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছি আমাদের দু'জনের এই একান্ত জীবনের যাবতীয় আনন্দকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার জন্য।

ভোর তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। টের পেলাম, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে ক্যাথারিন। বললাম,

"কিটি, ভাল আছ?"

"একটু ব্যথা হচ্ছে।"

"সমানে হচ্ছে?"

"না, খুব বেশি নয়।"

"সমানে ব্যথা হলে হাসপাতালে চলে যাব।"

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লাম। খানিক পরে ঘুম ভেঙে গেল আবার। ক্যাথারিন বলল,

"তুমি বোধ হয় এবার ডাক্তার ডাকলে পারো। এই হয়তো শুরু।"

ডাক্তারকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, "কত পরে পরে ব্যথা উঠছে?"

ক্যাথারিনের কাছে জেনে নিয়ে বললাম, "মিনিট পনেরো পরে পরে।"

ডাক্তার বললেন, "তাহলে এখনই হাসপাতালে চলে যান। আমিও এক্ষুনি আসছি।"

এরকম সময়ে ট্যাক্সি জোগাড় করতে রীতিমতো বেগ পেতে হল। অনেক কষ্টে একজনের মারফত একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করলাম। ক্যাথারিন জামাকাপড় পরে, নিজের আর বাচ্চার প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যাগে ভরে নিল। নীচে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি ট্যাক্সির জন্য। প্রশান্ত রাত, মাথার ওপরে মেঘহীন তারা-ভরা আকাশ। ক্যাথারিন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলল,

"খুব ভাল লাগছে, আর কিছুক্ষণ পরেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।"

"তুমি আমার বীরাঙ্গনা।"

"আমার কিন্তু একটুও ভয় করছে না। আচ্ছা, ট্যাক্সিটা আসছে না কেন?"

দূরে ট্যাক্সির শব্দ শুনতে পেলাম। জোরালো বাতি জ্বালিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। হাত ধরে ক্যাথারিনকে তুলে দিলাম গাড়িতে।

হাসপাতালে যে-মহিলাটি টেবিলের ধারে বসে ছিল সে ক্যাথারিনের নামধাম খাতায় লিখে নিল। কী ধর্ম জিজ্ঞেস করায় ক্যাথারিন বলল, ওর কোনও ধর্ম নেই। দেখলাম সেই ঘরে পেন্সিল দিয়ে একটা লম্বা দাগ টেনে দিল মহিলাটি। ক্যাথারিন নিজের নাম বলল—ক্যাথারিন হেনরি। মহিলাটি বলল,

"চলুন আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

লিফটে চেপে ওপরে উঠলাম। দোতলায় লিফট থেকে বেরিয়ে একটা বড় হল দিয়ে চললাম মহিলার পিছু পিছু। শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরেছে ক্যাথারিন।

"এই আপনার ঘর।" মহিলাটি বলল, "জামাকাপড় ছেড়ে এই নাইটগাউনটা পরে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

ক্যাথারিন বলল,

"আমার নিজের একটা নাইটগাউন আছে।"

মহিলাটি বলল,

"এটা পরাই সুবিধের হবে।"

আমি ঘর থেকে বাইরে গিয়ে হলঘরে একটা চেয়ারে বসলাম। একটু পরে মহিলাটি ডাকল,

"আপনি এখন ভেতরে আসতে পারেন।" সরু খাটের ওপর হাসপাতালের মোটা কাপড়ের নাইটগাউন পরে শুয়ে আছে ক্যাথারিন। আমায় দেখে মিষ্টি করে হেসে বলল,

"এখন বেশ ব্যথা হচ্ছে।"

ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছে ওর মুখে। নার্সটি ওর নাড়ি ধরে আছে, আর একটা ঘড়ি দেখে ব্যথার সময়টা লক্ষ্য করছে।

"ডাক্তার কোথায়?"

জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"উনি নীচে ঘুমোচ্ছেন। সময়মতো চলে আসবেন।" তারপর নার্সটি বলল, "আপনি আর-একবার বাইরে যান, আমার একটু কাজ আছে।"

আবার হলঘরে বেরিয়ে গেলাম। ঘরটা খালি, শুধু দু'পাশে দুটো জানলা আর অনেকগুলো বন্ধ দরজা। চারপাশে একটা হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ। চেয়ারে বসে ক্যাথারিনের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম।

একটু পরে নার্সের ডাকে আবার ভেতরে গেলাম। ক্যাথারিনকে বললাম,

"কেমন লাগছে।"

"ব্যথাটা এখন বেশ ঘনঘন আসছে।" যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল ওর মুখটা। তারপর আবার হাসিমুখে তাকাল। বলল,

"তুমি বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে এসো। নার্স বলেছে আমার এখন অনেকক্ষণ এরকম চলবে।"

"প্রথম বাচ্চা তো, সময় বেশি লাগবে।" নার্স বলল।

"তুমি বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে এসো।" ক্যাথারিন বলল, "আমি খুব ভাল আছি।"

আমি বললাম, "আর একটু থাকি।"

ওর সমানে ব্যথা হচ্ছে, আবার কমে যাচ্ছে। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। খুব বেশি কষ্ট হলে বলছে—ব্যথাই ভাল। আবার যখন আস্তে আস্তে কমে আসছে যন্ত্রণাটা, তখন বেশ হতাশ হয়ে পড়ছে, যেন একটা লজ্জার ব্যাপার।

"তুমি যাও, লক্ষ্মীটি। তুমি সামনে থাকলে বড় অস্বস্তি হচ্ছে।"

আবার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল মুখটা, তারপর খানিক পরে সুস্থ হয়ে বলল,

"এবারেরটা ভাল। সত্যি আমি মনেপ্রাণ চেয়েছি আদর্শ স্ত্রী হতে, চেয়েছি কাউকে কোনও অসুবিধেয় না ফেলে নির্ঝঞ্ঝাটে বাচ্চাটার জন্ম দিতে। তুমি লক্ষ্ম ীটি বাইরে গিয়ে একটু কিছু খেয়ে এসো—আমার একটুও খারাপ লাগবে না। নার্স খুব ভাল, ও তো কাছেই থাকবে।"

নার্স বলল, "আপনি ব্রেকফাস্ট খেয়ে আসুন, অনেক সময় আছে।"

"ঠিক আছে, যাচ্ছি। ঘুরে আসি সোনা, কেমন?"

"এসো। ভাল করে খেয়ো—আমার নাম করে একটু বেশি খেয়ো।"

নার্স বলল, "চৌমাথার কাছে একটা কাফে এখন খোলা থাকে।"

আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। নির্জন নিস্তব্ধ পথ ধরে গিয়ে কাফেতে পৌঁছলাম। একজন বৃদ্ধ আমাকে এক গ্লাস মদ এগিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে সেটা শেষ করে কফি আনতে বললাম। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন,

"এমন অসময়ে এখানে কী করছেন?"

"আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, বাচ্চা হবে।"

"তাই নাকি?" আমাকে শুভ কামনা জানালেন তিনি।

"আর এক গ্লাস মদ দিন।"

দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলাম। হাসপাতালে ওর ঘরের সামনে এসে দরজায়

টোকা দিলাম, কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধাক্কা দিলাম, খুলে গেল দরজা। ঘরটা খালি, শুধু ক্যাথারিনের ব্যাগটা রয়েছে একটা চেয়ারের ওপর, আর দেওয়ালে একটা হুকে টাঙানো রয়েছে ওর ড্রেসিং গাউনটা। হলঘর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। একজন নার্সের সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম মাদাম হেনরির কথা। সে বললে তাঁকে প্রসব-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল সে। ঘরের দরজাটা আধ-ভেজানো, টেবিলে শুয়ে আছে ক্যাথারিন, গায়ে একটা চাদর ঢাকা। ওর একপাশে নার্স, অন্য পাশে ডাক্তার দাঁড়িয়ে, কতকগুলো সিলিন্ডারের ধারে। সিলিন্ডার থেকে একটা নল বেরিয়েছে, তার ডগায় একটা রবারের মুখচাপা—সেটা ডাক্তারের হাতে। আমার সঙ্গের নার্সটি আমাকে একটা সাদা অ্যাপ্রন পরিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। ক্যাথারিন বলল,

"এসেছ? এখনও তেমন কিছুই নয়।" ওর কথায় শ্রান্তির ছাপ। ডাক্তার বললেন,

"আপনি কি মিস্টার হেনরি?"

"হ্যাঁ। কেমন অবস্থা, ডাক্তার?"

"খুবই ভাল অবস্থা। এখানে গ্যাস দেওয়ার জন্যে নিয়ে এসেছি, তাহলে ব্যথাটা টের পাবেন না।"

ক্যাথারিন বলল, "গ্যাস দিন আমাকে।"

রবারের মুখচাপা দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে গ্যাসের চাবি ঘুরিয়ে দিলেন ডাক্তার। দেখলাম, খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে ক্যাথারিন। তারপর নিজেই মুখচাপাটা ঠেলে দিল। গ্যাসের চাবিটা বন্ধ করে দিলেন ডাক্তার। ক্যাথারিন বলল,

"এবারেরটা তেমন কিছু নয়। এর আগেরটা খুব জোর ছিল। আপনি আমাকে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন, না ডাক্তার?"

ওর গলায় কেমন যেন অদ্ভুত সুর। মৃদু হাসলেন ডাক্তার। ক্যাথারিন আবার মুখচাপাটা টেনে নিয়ে শক্ত করে ধরল নিজের মুখের ওপর—জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, একটা কাতরানি বেরোচ্ছে ওর গলা থেকে। খানিক পরে মুখচাপাটা সরিয়ে দিয়ে মৃদু হাসল।

"এবারেরটা খুব বেশি হয়েছিল, ভীষণ বেশি। তুমি কিছু ভেবো না, তুমি চলে যাও। আর একবার কিছু খেয়ে এসো।"

বললাম, "আমি এখন থাকব।"

ভোরবেলা প্রায় তিনটের সময় হাসপাতালে গেছি, আর বেলা বারোটা বেজে

গেল—ও এখনও প্রসব-ঘরে। ব্যথাটা আবার কমেছে। ভীষণ পরিশ্রান্ত আর অবসন্ন মনে হচ্ছে ওকে। তবু বেশ প্রফুল্ল রয়েছে। বলল,

"আমি কোনও কম্মের নই। খুব খারাপ লাগছে। ভেবেছিলাম খুব সহজেই এসব পার হয়ে যেতে পারব, কিন্তু—গ্যাসটা, ডাক্তার।" হাত বাড়িয়ে মুখচাপাটা টেনে নিল। ডাক্তার গ্যাসের চাবি ঘুরিয়ে দিলেন। একটু পরে কমে গেল কষ্টটা। মুখটা সরিয়ে নিয়ে একটু হাসল,

"এবারেরটা বেশি নয়। গ্যাসটায় খুব আরাম হচ্ছে।" আবার তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল, "গ্যাসটা দিন।"

ডাক্তারকে বললাম,

"ব্যথাটা কতক্ষণ অন্তর আসছে ?"

"এক মিনিট।"

"আপনি খাওয়াদাওয়া করবেন না?"

"এইবার কিছু খেয়ে নেব।"

ক্যাথারিন বলল, "আপনার কিছু খাওয়া দরকার ডাক্তার। আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি, কত সময় লাগছে। আমার স্বামী আমাকে গ্যাসটা দিতে পারবেন না?"

"আপনি যদি চান, নিশ্চয়ই পারবেন।"

ডাক্তার আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কীভাবে যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়। গ্যাস চাইলে ক্যাথারিন মুখচাপাটা নিজের মুখে ধরল, চাবি ঘুরিয়ে মিটারের কাঁটাটা নিয়ে এলাম দু' নম্বরে। মুখচাপাটা সরিয়ে দিতেই চাবিটা বন্ধ করে দিলাম। আমার হাতে হাত রেখে ক্যাথারিন বলল,

"তুমি দিলে?"

বললাম, "তাই তো দিলাম।"

"তুমি ভীষণ ভাল!"

গ্যাসের প্রভাবে ওর বোধ হয় একটু নেশা হয়েছে।

ডাক্তার বললেন, "আমি পাশের ঘরে বসে একটু খেয়ে নিচ্ছি। প্রয়োজন হলেই ডাকবেন।"

ক্যাথারিনের পাশে বসে আছি, সময় বয়ে চলেছে। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ক্যাথারিন।

"বাচ্চাটা কি আর আসবে না?"

"আর একটু পরেই হয়ে যাবে।"

"কত চেষ্টা করছি, কিছুতেই হচ্ছে না। ওই আবার—গ্যাসটা দাও—"

বেলা দুটোর সময় লাঞ্চ খেতে গেলাম আমি। দেরি হয়ে গেছে, লাঞ্চের সময়

পার হয়ে গেছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। যা-হোক একটু কিছু খেয়ে নিলাম, আর একটু বিয়ার।

খাওয়া শেষ করে ফিরে এলাম হাসপাতালে। মেঘলা আকাশে মাঝে মাঝে সূর্য দেখা দিচ্ছে।

প্রসব-ঘরে ক্যাথারিনের পাশে বসে আছেন ডাক্তার, নার্সটি ঘরের অন্যদিকে কী-যেন করছে। আমাকে দেখে ডাক্তার বললেন, "এই তো আপনার স্বামী এসে গেছেন।"

ক্যাথারিন বলল, "এলে! খুব ভাল ডাক্তার ইনি। আমাকে কত সব গল্প বলছেন। ব্যথাটা যখন খুব বেশি হচ্ছে, আমাকে একেবারে অজ্ঞান করে দিচ্ছেন। ডাক্তার, আপনি সত্যিই অসাধারণ।"

আমি বললাম, "নেশা হয়েছে তোমার।"

"বুঝতে পারছি, কিন্তু ও-কথা বলতে নেই।" ক্যাথারিন বলল, পরক্ষণেই "দাও, দাও" বলে চিৎকার করে গ্যাসের মুখচাপাটা আঁকড়ে ধরল। খানিক পরে একটু সুস্থ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,

"এবারেরটা বড্ড বেশি ছিল।" গলাটা কেমন যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে, "আর মরব না এখন, মরার গণ্ডিটা পেরিয়ে এলাম। তুমি খুশি তো?"

"আবার যেন সেখানে চলে যেয়ো না।"

"যাব না। অবশ্য মরতে আমার ভয় নেই, কিন্তু মরব না, দেখো।"

ডাক্তার বললেন, "অমন বোকামি কক্ষনো করবেন না। স্বামীটিকে কে দেখবে?"

"না, না, আমি মরব না। বোকার মতন কিছুতেই মরব না—ওই আবার! দিন, দিন—"

একটু পরে ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে বললেন। ক্যাথারিনের কাছে আবার আসার কথা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে ক্যাথারিনের আগের ঘরটাতে গেলাম। বাচ্চা হওয়ার পর এই ঘরেই ক্যাথারিনের থাকার কথা। একটা চেয়ারে বসে ঘরের চারপাশটা দেখছি। পকেটে একটা খবরের কাগজ ছিল, সেটা পড়তে শুরু করলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে, আলোটা জ্বালিয়ে নিলাম। পড়তে ভাল লাগছে না। আলো নিভিয়ে জানলা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছি। খুব অবাক লাগছে—ডাক্তার আমাকে এখনও ডেকে পাঠাচ্ছেন না কেন। হয়তো আমার বাইরে থাকাই দরকার। ঘড়ি দেখলাম। আর দশ মিনিট দেখব, তারপর গিয়ে খোঁজ নেব।

বেচারি কিটি আমার! বড় কাছে এসেছিলে আমার, তারই মূল্য দিচ্ছো।

যে-ফাঁদে পড়েছ তুমি, এই তার শেষ মার। এই তো ভালবাসার পরিণতি! কী চমৎকার কেটেছে ক্যাথারিনের এই ক'টা মাস। কোনও কষ্ট পায়নি ও, একদিনও অসুস্থ হয়ে পড়েনি। আর আজ এই শেষটুকুতে এসে এমন করে ঠেকে গেল! এ-দুনিয়ায় মানুষ কখনোই সম্পূর্ণ বেঁচে যেতে পারে না, কোনও-না-কোনও ভাবে তাকে দুনিয়ার হাতে মার খেতেই হয়। হাজারবারও যদি আনুষ্ঠানিক বিয়ে হত আমাদের, তাহলেই বা কী হত? কী হবে আজ যদি ও মারা যায়? না না, মরবে না। আজকাল কেউ বাচ্চা হতে গিয়ে মরে না। সব স্বামীই এমনি ভাবে। সবই ঠিক, তবু যদি মারা যায়? না, মরতে পারে না ও, শুধু সময়টা খারাপ যাচ্ছে। প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে সময়টা বেশি লাগে—বেচারার বড় খারাপ সময় যাচ্ছে! ভবিষ্যতে আজকের এই দুঃসময়ের কথা আলোচনা করব আমরা আর ক্যাথারিন বলবে—"এমন আর বেশি কি খারাপ সময় ছিল!" কিন্তু যদি মারা যায়? না, মরতে পারে না। ঠিক—কিন্তু যদি মারা যায়? অসম্ভব, অসম্ভব! বোকার মতন ভাবনা! একটা সাময়িক দুঃসময়, প্রকৃতির অত্যাচার, নতুন মাতৃত্বের যন্ত্রণা। কিন্তু যদি মরে যায়! না, মরতে পারে না, কেন মরবে? শুধুই তো একটি শিশু পৃথিবীতে আসবে—সে আমাদের মিলনের মধুর রাতগুলির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আজ সে তীব্র আলোড়ন তুলে, বিপুল যন্ত্রণা দিয়ে পৃথিবীতে আসছে—একেই সযত্নে বড় করে তুলব, আর ওরই মায়ায় জড়িয়ে পড়ব হয়তো। কিন্তু ক্যাথারিন যদি মারা যায়? মরবে না, ও ভাল আছে। কিন্তু যদি মরে? মরবে না—যদি মরে? যদি মরে যায়, তাহলে কী হবে?

ডাক্তার ঘরে এলেন।

"কী খবর ডাক্তার?"

"ভাল না।"

"মানে?"

"পরীক্ষা করে দেখলাম, স্বাভাবিক ভাবে হবে না। তারপরেও এতক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম—কোনও সম্ভাবনা নেই।"

"আপনি কী পরামর্শ দেন?"

"দুটো উপায় আছে। হয় ফর্সেপ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া, নয়তো অস্ত্রের অর্থাৎ সিজারিয়ান অপারেশন। যন্ত্রের সাহায্যে করার অনেক রকম ঝুঁকি আছে—সন্তানের আর মায়ের, দু'জনেরই।"

"আর সিজারিয়ানে? যদি মরে যায়, তখন?"

"স্বাভাবিক প্রসবের চেয়ে বেশি ঝুঁকি নয়।"

"আপনি নিজে করবেন?"

"হ্যাঁ। জিনিসপত্র, লোকজন জোগাড় করতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না।"

"আপনার নিজের কী মত?"

"আমি সিজারিয়ান করাতেই বলব। আমার স্ত্রী হলে আমি সিজারিয়ানই করাতাম।"

"এর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না?"

"কিছুই না, শুধু দাগটা থেকে যায়।"

"অন্য কোনও জীবাণু সংক্রমণের ভয় নেই?"

"যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে গেলে যতটা ভয় থাকে তার চেয়ে কম।"

"আর যদি দুটোর একটাও না করে এমনি অপেক্ষা করা যায়, তাহলে কী হবে?"

"যা-হোক কিছু করতেই হবে এখন। মিসেস হেনরি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। যত তাড়াতাড়ি অপারেশন করে ফেলা যায়, ততই ভাল।"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন অপারেশন করুন।" আমি বললাম।

ডাক্তার বললেন,

"আমি গিয়ে ওদের সব নির্দেশ দিয়ে আসছি।"

ক্যাথারিনের কাছে গেলাম। চাদরের তলায় স্ফীত দেহটা পড়ে আছে, ভীষণ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে, রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ। আমাকে দেখে বলল,

"ডাক্তারকে অপারেশনের অনুমতি দিয়েছ তো?"

"দিয়েছি।"

"সেটাই ভাল হবে, না? আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আর পারছি না গো, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে আমার, একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছি যেন। আবার, ওই আবার—ওইটা দাও। আর কাজ হচ্ছে না, এতে আর কিচ্ছু হচ্ছে না।"

"বড় করে নাও।"

"নিচ্ছি তো! নাঃ, এতে আর কাজ হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না।"

নার্সকে বললাম, "আর একটা সিলিন্ডার নিয়ে আসুন।"

নার্স বলল, "এটাই নতুন সিলিন্ডার।"

ক্যাথারিন বলছে,

"আমি বড্ড বোকা! কিন্তু এতে যে আর কাজ হচ্ছে না।" কেঁদে ফেলল

ক্যাথারিন, “কত আশা করেছিলাম, আমার সন্তান হবে নির্ঝঞ্ঝাটে। অথচ এখন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে যেন, একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ—গ্যাসেও তো আর কাজ হচ্ছে না। বাঁচাও আমায়, এই যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাও, যা-হোক কিছু করো। মরে গেলেও আর দুঃখ নেই, শুধু এই যন্ত্রণাটা থামিয়ে দাও। ওই আবার আসছে—ওঃ, ওঃ!” মুখচাপার ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে উঠল ক্যাথারিন, “কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু না। আমার কথায় কিছু মনে কোরো না যেন—কেঁদো না, আমার কথায় অস্থির হয়ো না। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে কিনা, তাই এমন করছি। প্রিয়তম, কত ভালবাসি তোমাকে—আমি আবার ভাল হয়ে যাব। এবার ভাল হব, ভাল হয়ে থাকব। ওরা আমাকে কোনও ওষুধ দিতে পারে না? পারলে তো দিতই।”

“এটা দিয়েই ব্যবস্থা করছি। গ্যাসের চাবিটা বেশি করে খুলে দিচ্ছি।”

“এক্ষুনি দাও।”

চাবিটা পুরো খুলে দিলাম। বড় করে শ্বাস নিতে লাগল ও। আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এল ওর হাতটা। গ্যাসের চাবি বন্ধ করে ওর মুখের ওপর থেকে মুখচাপাটা সরিয়ে দিলাম। কোনও সুদূর লোক থেকে যেন ফিরে এল আবার।

“এবারেরটা খুব ভাল হয়েছে। তুমি ভীষণ ভাল!”

“মনে জোর আনো, কারণ এত বেশি করে বারবার গ্যাস দেওয়া যাবে না, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।”

“আমার আর মনের জোর নেই, সব সাহস চুরমার হয়ে গেছে। এরা সবাই মিলে আমাকে শেষ করে দিল—আমি বুঝতে পারছি।”

“সবারই এরকম হয়।”

“কিন্তু এ যে বড় মারাত্মক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা খাড়া করে রাখবে—এইভাবে ভেঙে ফেলার জন্যে!”

“এক ঘণ্টার মধ্যে সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।”

“তাহলে চমৎকার হবে, না? হ্যাঁগো, আমি মরব না তো?”

“না। আমি বলছি, বিশ্বাস করো—তুমি মরবে না।”

“তোমাকে ফেলে মরতে চাই না আমি। কিন্তু এখন এত ক্লান্ত লাগছে যে মনে হচ্ছে মরেই যাব।”

“উল্টোপাল্টা বোকো না, সবারই এরকম হয়।”

“মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আমি মরতে চলেছি।”

“না, মরবে না, মরতে পারবে না।”

“কিন্তু যদি মরে যাই?”

"মরতে দেব না তোমায়।"

"দাও, গ্যাস দাও এক্ষুনি!"

আবার খানিক বাদে বলতে শুরু করল,

"আমি মরব না। জোর করে বেঁচে থাকব।"

"কিছুতেই মরবে না।"

"অপারেশনের সময় তুমি আমার কাছে থাকবে তো?"

"ও আমি দেখতে পারব না।"

"দেখো না, শুধু থেকো।"

"থাকব, আমি সারাক্ষণ থাকব।"

"তুমি যে আমায় কত ভালবাস! ওই আসছে—দাও, বেশি করে দাও—এতে যে আর কিছুই হচ্ছে না।"

চাবিটা ঘুরিয়েই চলেছি—মিটারের কাঁটা তিন থেকে চারে চলে গেছে। ডাক্তার কখন আসবেন কে জানে! কথা ছিল দু'-এর ওদিকে যাব না।

শেষ পর্যন্ত আর-একজন নতুন ডাক্তার এলেন, সঙ্গে দু'জন নার্স। তারা ক্যাথারিনকে টেবিল থেকে তুলে একটা চাকা-লাগানো স্ট্রেচারে শুইয়ে হল দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল। অপারেশনের ঘরে এসে আগের ডাক্তারটিকে সাদা টুপি আর মুখোশে চিনতে পারছিলাম না। আর একজন ডাক্তার আছেন সেখানে, আরও অনেক নার্স।

ক্যাথারিন বলল, "এমন কিছু দিন ডাক্তার যাতে কাজ হয়। দয়া করে একটু বেশি করে দিন যাতে কিছুটা উপকার হয়।"

একজন ডাক্তার ওর মুখে একটা মুখচাপা ধরলেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছি—ছোট অপারেশন ঘরটায় জোরালো আলো ঝকঝক করছে। এক পাশে বসার গ্যালারি। একজন নার্স বলল,

"আপনি ওপাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বেঞ্চে গিয়ে বসুন।"

ক্যাথারিনের মুখের ওপর মুখচাপাটা রয়েছে। এখন ও শান্ত হয়ে গেছে। ভেতর থেকে চাকা-লাগানো স্ট্রেচারটা হলে বার করে দিল ওরা। পেছন ফিরে হলের দিকে চলতে লাগলাম। দু'জন নার্স ছুটতে ছুটতে গ্যালারির দরজার দিকে আসছে। একজন বলল,

"সিজারিয়ান হবে।"

অন্যজন হেসে বলল,

"ওঃ, খুব সময়মতো আসতে পেরেছি!" গ্যালারিতে যাওয়ার দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ওরা। আরও একজন নার্স এল ছুটতে ছুটতে। সে আমাকে বলল,

"সোজা ভেতরে চলে যান।"

বললাম, "আমি বাইরেই আছি।"

দ্রুত ভেতরে চলে গেল নার্সটি। আমি একা হলঘরে পায়চারি করছি। ভেতরে যাওয়ার সাহস আমার নেই। হলের শেষ প্রান্তে একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকে কাচের আলমারিতে রাখা শিশি-বোতলের ওপরের লেবেলগুলো পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। আবার বেরিয়ে এলাম ফাঁকা হলঘরে, দূর থেকে অপারেশন ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকি। একজন ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে একজন নার্স। ডাক্তারের দু'হাতে কী-যেন একটা ধরা, অনেকটা ছাল-ছাড়ানো খরগোশের মতো। দু'জনে দ্রুত হল পেরিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন। সে-ঘরটার সামনে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম—সদ্যোজাত একটি শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁরা। আমাকে দেখে ডাক্তারটি ওকে তুলে ধরলেন—এক হাতে ওর পা দু'টো ধরে ঝুলিয়ে নিয়েছেন ওকে আর পিঠের ওপর চাপড় মারছেন।

আমি বললাম, "ছেলেটা ভাল আছে?"

"সুন্দর ছেলে। পাঁচ কিলো ওজন হবে।" কিছুই মনে হল না ওকে দেখে, পিতৃত্বের কোনও অনুভূতি আমার মনে নেই। ওর ছোট্ট নীল মুখটা, ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো দেখতে পেলাম—কিন্তু নড়াচাড়া করতে দেখলাম না, কাঁদতেও শুনলাম না। ডাক্তার কী-যেন করছেন ওকে নিয়ে, মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

"ছেলের জন্যে খুব গর্ব হচ্ছে, না?" নার্সটি বলল,

আমি বললাম, "না। নিজের মাকে তো প্রায় মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল ও।"

"সেটা কি এই ছোট্ট সোনার দোষ? আপনি কি ছেলে চাননি?"

"না।"

ডাক্তার বাচ্চাটাকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। পা ধরে ঝুলিয়ে পিঠে চাপড় মারছেন। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। হল পেরিয়ে অপারেশন-ঘরের দিকে চললাম। এখন ভেতরে গিয়ে দেখা যেতে পারে।

ঘরে ঢুকে গ্যালারির দিকে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে-নার্সটি রেলিংয়ের ওপাশে গ্যালারির বেঞ্চে বসে ছিল, সে ইশারা করে ডাকল আমায়—বেঞ্চে বসে দেখার জন্যে। আমি গেলাম না। এখান থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছে।

মনে হল ক্যাথারিন আর নেই। যেন নিষ্প্রাণ শরীর। মুখটা ফ্যাকাশে। আলোর

নীচে ওর কাটা জায়গাটা সেলাই করছেন ডাক্তার। অন্য একজন মুখোশপরা ডাক্তার ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছেন ওকে। ডাক্তারের হাতে যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে দু'জন মুখোশপরা নার্স। সেলাই শেষ হয়ে যেতে আবার হলঘরে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। খানিক পরে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলাম,

"কেমন আছে?"

"ভাল আছে। অপারেশনটা দেখেছেন?" ডাক্তারকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

"সেলাই করার সময় দেখেছি, বিশাল কাটা।"

"খুব বড় মনে হল?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, ওখানটা পরে সমান হয়ে যাবে তো?"

"নিশ্চয়ই।"

একটু পরে আবার চাকা-লাগানো স্ট্রেচারে শুইয়ে ওকে নিয়ে চলল ওরা। বেহুঁশ ক্যাথারিনের গলায় অস্ফুট কাতরানি। ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল ওকে। পায়ের কাছে একটা চেয়ারে বসে আছি আমি। ঘরের মধ্যে একজন নার্স। অন্ধকার হয়ে এসেছে। উঠে গিয়ে ওর বিছানার কাছে দাঁড়ালাম। একটা হাত বাড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ক্যাথারিন বলল,

"আহা, বেচারি।"

"রানি!"

"কী হয়েছে?"

নার্স বলল, "শ্‌শ্‌—কথা বলবেন না।"

বললাম, "ছেলে হয়েছে। খুব লম্বা-চওড়া আর তামাটে রং।"

"ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, চমৎকার আছে।"

নার্সের চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি। ক্যাথারিন বলল,

"ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মারাত্মক কষ্ট পেয়েছি। তুমি ঠিক আছ তো?"

"আমি একদম ঠিক আছি। আর কথা বোলো না।"

"কত যে ভালবাসো তুমি আমায়! কী কষ্ট যে পেয়েছি না! কেমন দেখতে হয়েছে ওকে?"

"ছাল-ছাড়ানো খরগোশের মতো, আর মুখখানা বুড়োদের মতো তোবড়ানো।"

নার্স বলল, "মাদাম হেনরির আর কথা বলা চলবে না। আপনি বাইরে যান।"

"আমি বাইরে যাচ্ছি।"

ক্যাথারিন বলল, "কিছু খেয়ে নাও গিয়ে।"

"না, আমি বাইরেই আছি।" চুমু দিলাম ওকে। একেবারে দুর্বল আর শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। নার্সকে বললাম,

"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

আমার সঙ্গে হলঘরে বেরিয়ে এল সে। জিজ্ঞেস করলাম,

"বাচ্চাটার কী হয়েছে?"

"আপনি জানেন না?"

"না।"

"বাচ্চাটা বাঁচেনি।"

"মারা গেছে?"

"ডাক্তাররা শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু করাতেই পারেননি। ওর গলায় নাড়িটা জড়িয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।"

"তার মানে বাচ্চাটা নেই?"

"সত্যি, খুব লজ্জার কথা—কী মস্ত ছেলে! আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন।"

"না। আপনি বরং এখন মাদামের কাছে যান।"

ঘরের বাইরে চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলাম। জানলার কাচের ওপর বৃষ্টির ধারা আর তার পেছনে ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তা হলে এই হল—শিশুটি মৃত! বাচ্চাটা নেই বলেই ডাক্তারের মুখে ছিল অসীম ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু তাহলে কেন ওকে নিয়ে ওভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করছিল ওরা ঘরের মধ্যে? হয়তো আশা করেছিল ওইভাবে প্রাণটা ফিরিয়ে আনতে পারবে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করবে বাচ্চাটা। আমার তো কোনও ধর্ম নেই, তবু মনে হচ্ছে ওকে দীক্ষিত করা উচিত। কিন্তু যদি একবারও শ্বাসের সঙ্গে এ-পৃথিবীর বাতাস সে না নিয়ে থাকে, তাহলে? ওর তো প্রাণই ছিল না মোটে। শুধু যখন ক্যাথারিনের দেহের সঙ্গে মিশে ছিল, তখনই ওর মধ্যে ছিল প্রাণের স্পন্দন—কত বার ওর ছোট ছোট হাত-পা ছোঁড়া অনুভব করেছি। কিন্তু গত একটা সপ্তাহ কিছু টের পাইনি। হয়তো তখন থেকেই দমবন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেচারা! আমারও ওইভাবে দমবন্ধ হয়ে গেলে ভাল হত। না, তা হবে না। এই মৃত্যুই তো শেষ নয়, এবার যে ক্যাথারিনের পালা। এই আমার নিয়তি! এ-পৃথিবীর এমনই বিচার! কিছু জানার আগে, কিছু বোঝার আগেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি

হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা অর্জন করে সাবধান হওয়ার আর সময় পাওয়া যায় না। আগে পরিবেশের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর জানানো হয় আইনকানুন, আর প্রথম আইনভঙ্গের অপরাধেই হত্যা করা হয়। আইমোর মতো অকারণে নিহত হওয়া অথবা রিনাল্‌দির মতো সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়া—মোদ্দা কথাটা হল, যেভাবেই হোক পৃথিবীর হাতে নিহত হতে হবে। কব্‌জায় পেলে হত্যা ওরা করবেই।

ক্যাথারিনের খবরের অপেক্ষায় হলঘরে বসে আছি। নার্স বাইরে এল না। কাজেই একটু পরে আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে তাকালাম। বাইরের উজ্জ্বল আলোর থেকে গিয়ে প্রথমটা অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ল না। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে দেখলাম নার্স চেয়ারে বসে আছে। আর দেখলাম ক্যাথারিনকে—বালিশের ওপরে এলিয়ে আছে মাথাটা, ক্ষীণ শরীরটা চাদরের নীচে মিশে আছে বিছানার সঙ্গে। আমাকে দেখতে পেয়ে নার্সটি মুখে আঙুল দিয়ে কথা না-বলতে ইশারা করে দরজার কাছে এগিয়ে এল।

বললাম, "কেমন আছে?"

"ভাল আছেন। আপনি বাইরে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে, ইচ্ছে হলে আবার আসতে পারেন।"

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। অন্ধকার রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আগেকার সেই কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। আলোকোজ্জ্বল কাফের ভিড়ের মধ্যে এক কোণে বসে খাবার দিতে আর বিয়ার আনতে বললাম।

ধীরে ধীরে খাচ্ছি, বিয়ারে চুমুক দিচ্ছি। খুব খিদে পেয়েছিল, তাই আরও কিছু খাবার আনতে বললাম। বেশ কয়েক গ্লাস বিয়ার খেলাম। ঠিক করেছি কিছু ভাবব না, তাই কাফের নানান দৃশ্যে মন দিতে চেষ্টা করছি, সামনের ভদ্রলোকের হাতের কাগজটা পড়ার চেষ্টা করছি। এক্ষুনি হাসপাতালে ফেরা চলবে না। তাই আর এক গ্লাস বিয়ার নিলাম। কাফের অনেক খদ্দেরই পরস্পরের পরিচিত। মনে হচ্ছে একটা খবরের কাগজ কিনে আনিয়ে পড়ি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। হঠাৎই মনে হল—আমাকে ফিরে যেতে হবে। দাম মিটিয়ে, খুলে-রাখা ভিজে কোটটা গায়ে চড়িয়ে, রাস্তায় নামলাম। বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হেঁটে হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলাম।

দোতলায় হলের সামনে নার্সের সঙ্গে দেখা হতে সে বলল, "এইমাত্র আপনার হোটেলে ফোন করেছিলাম।"

আমার গলাটা কে-যেন চেপে ধরল।

"কেন? কী হয়েছে?"

"মিসেস হেনরির হঠাৎ রক্তপাত শুরু হয়েছে।"

"ভেতরে যেতে পারি?"

"এখন না। ওখানে ডাক্তার আছেন।"

"ভয়ের কারণ আছে?"

"খুব বেশি আছে।"

ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল নার্সটি। বাইরের হলে বসে আছি আমি। মাথাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। কিচ্ছু ভাবছি না, ভাবতে পারছি না। আমি জানতাম ও বাঁচবে না। তবু ওকে মরতে দিয়ো না—হে ঈশ্বর, ওকে মরতে দিয়ো না! আমি সব করব তোমার জন্যে—হে ঈশ্বর, ওকে তুমি নিয়ে নিয়ো না আমার কাছ থেকে। দয়া করো, করুণা করো ঈশ্বর—তুমি যা চাইবে তা-ই করব, শুধু ওকে বাঁচিয়ে দাও। বাচ্চাটাকে নিয়েছ, কিন্তু ওকে ফিরিয়ে দাও—আমার ক্যাথারিনকে ফিরিয়ে দাও!

দরজা খুলে বাইরে এসে আমাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল নার্স। ওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকলাম। ক্যাথারিন আমার দিকে তাকাল না। ওর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল ক্যাথারিন। বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখের জল সামলাতে পারলাম না আর।

"বেচারি আমার!" আস্তে আস্তে বলল ক্যাথারিন। ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে।

"তুমি ভাল আছ রানি, এবার ভাল হয়ে যাবে।"

"আমি মরে যাব এবার।" বলল ও। একটু থেমে আবার বলল, "বিচ্ছিরি ব্যাপার!"

ওর হাতটা তুলে ধরলাম। ও বলল, "আমাকে ছুঁয়ো না।" ছেড়ে দিলাম হাতটা। সামান্য হেসে ক্যাথারিন বলল,

"বেচারা! যত খুশি ছোঁও আমাকে।"

"ভাল হয়ে যাবে, কিটি। আমি জানি তুমি আবার সেরে উঠবে।"

"ভেবেছিলাম তোমার জন্যে একটা চিঠি লিখে রাখব, যদি আমার কিছু ঘটে যায়! কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠেনি।"

"কোনও পাদ্রিকে ডাকব? কিংবা আর কাউকে কি দেখতে চাও?"

"শুধু তোমাকে।" একটু থেমে বলল, "আমার একটুও ভয় করছে না, কিন্তু ব্যাপারটা ভারী বিচ্ছিরি।"

ডাক্তার বললেন, "আপনার এত কথা বলা ঠিক নয়।"

ক্যাথারিন বলল, "আচ্ছা।"

"কিটি, বলো কী ইচ্ছে করছে—কিছু চাই?"

আবার মিষ্টি করে হাসল ক্যাথারিন, "না।" একটু পরে বলল, "আমাকে যেমন ভাবে ভালবেসেছ, তেমন ভাবে আর কাউকে ভালবাসবে না তো? আমাকে যা-কিছু বলছে, তা আর কাউকে বলবে না তো?"

"কক্ষনো না।"

"কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মিশো তুমি।"

"তার দরকার হবে না।"

"আপনারা বড্ড বেশি কথা বলছেন।" ডাক্তার বললেন, "আপনাদের এত কথা বলা উচিত নয়। মিস্টার হেনরি এখন বাইরে যাবেন। পরে আবার আসবেন উনি। আপনি মোটেই মরবেন না। ও-সব ছেলেমানুষি ভাবনা বাদ দিন তো।"

ক্যাথারিন বলল, "রোজ রাত্তিরে তোমার কাছে আসব আমি।"

ডাক্তার আমাকে বাইরে যেতে বললেন। আমার দিকে চেয়ে সামান্য হাসল ক্যাথারিন। মুখটা ফ্যাকাশে। বললাম,

"আমি বাইরেই আছি।"

ও বলল, "আমার জন্যে ভেবো না, একটুও ভয় করছে না আমার। শুধু দেখছি জীবন আমার সঙ্গে বড় নির্মম খেলা খেলে গেল।"

"রানি আমার, তুমি তো ভীষণ সাহসী!"

বাইরে হলঘরে বসে আছি—অনেকক্ষণ বসে আছি। একসময় নার্স বাইরে এল,

"মিসেস হেনরির অবস্থা খুবই খারাপ। আমার খুব ভয় করছে।"

"মারা গেছে?"

"না, কিন্তু হুঁশ নেই।"

শুনলাম ওর রক্তক্ষরণ পরের পর হয়েই চলেছে, ওরা কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না। ঘরে গিয়ে ওর কাছে বসলাম। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়েই রইল ও। ক্ষীণ প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল এক সময়—এবার আর বেশি সময় লাগল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ রাতে আর কিছু করার আছে আমার?"

"না, আর কিছু করার নেই। চলুন আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, ধন্যবাদ। আমি এখন এখানেই কিছুক্ষণ থাকব।"

"এ-অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু নেই, বলারও কিছু নেই, তবু—"

বাধা দিয়ে বললাম, "না, কিছু বলার দরকার নেই।"

"আচ্ছা, শুভরাত্রি। চলুন না, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই।"

"না, ধন্যবাদ।"

"আর কিছু করার ছিল না। অপারেশনের সময়—"

"এ নিয়ে আর কোনও কথা বলতে চাই না আমি।"

"আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে পারলে ভাল হত।"

"দরকার নেই। ধন্যবাদ।"

হল পেরিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। ঘরের দরজার সামনে গেলাম। একজন নার্স বলল,

"আপনি এখন ভেতরে আসবেন না।"

"হ্যাঁ, আসব।"

"এখন আসতে পারবেন না।"

বললাম, "তুমি বাইরে যাও।" অন্য নার্সটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আর তুমিও।"

ওদের দু'জনকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিলাম। কিন্তু কী লাভ! এ যেন পাথরের মূর্তিকে বিদায় জানানো। খানিক পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চললাম হোটেলের দিকে।

হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট
ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

....

নিয়মাবলী

১। একজন গ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের জন্য পুস্তক ধার দেয়া হবে এবং তা একই সময়ের জন্য একবার নবায়নযোগ্য (শুধুমাত্র রেফারেন্স পুস্তক ও ম্যাগাজিন ব্যতীত)।

২। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট গ্রহীতার নিকট থেকে প্রতিটি পুস্তকের জন্য প্রতিদিন............. টাকা/পয়সা হারে জরিমানা আদায় করা হবে। জরিমানাকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রহীতাকে কোন পুস্তক ধার দেয়া হবে না।

৩। একজন গ্রহীতাকে একই সময়ে সর্বোচ্চ ২ (দুই) খানা পুস্তক ধার দেয়া হবে।

৪। কোন পুস্তক যে কোন প্রকার বিনষ্টের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রহীতার নিকট থেকে জরিমানা বাবদ পুস্তকের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করা হবে।

৫। একজন পুস্তক গ্রহীতা তাঁর গ্রাহক কার্ডের মাধ্যমে ধারকৃত সকল পুস্তকের জন্য দায়ী থাকবেন।

ফেরত দেওয়ার তারিখ পত্রী

সময়সীমার মধ্যে বইটি অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

অন্যথায় নির্ধারিতহারে জরিমানা দিতে হইবে।

ফেরতের তারিখ	ফেরত	ফেরতের তারিখ	ফেরত
১৫/৯/১৭	—		
৮১১/০১৭	—		
১৩/৩/১৮	১৬/৩/১৮		
২১/৫/০১৮			
১/৬/০১৮			

